একুশের সংকলন '৭৭

ডক্‌টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী
সম্পাদিত

সম্পাদকীয়

বাংলা একাডেমীর সংকলন বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবারেও একুশের সংকলন প্রকাশিত হ'ল। এ সংকলনকে প্রতিনিধিত্বমূলক দাবী করা হচ্ছে না—নতুন-পুরাতন সকল লেখকের লেখা, যা সংকলন বিভাগ স্বল্প সময়ে সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তা-ই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাঠক সম্প্রদায়ের ভালো লাগলেই একাডেমী কৃতার্থ বোধ করবে।

—সম্পাদক

সূচী

বাংলা ভাষা শিক্ষা সমস্যা

রফিকুল ইসলাম

আমাদের মাতৃভাষা 'বাংলা ভাষা', কিন্তু কোন্ বাংলা ভাষা ? সাধু না শিষ্ট না আঞ্চলিক বাংলা ? আমরা সচরাচর ঘরে আঞ্চলিক আর বাইরে 'স্ট্যাণ্ডার্ড' বা শিষ্ট বাংলা ব্যবহার করে থাকি। স্কুলে কিন্তু আমরা পড়ে থাকি সাধু ভাষা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষতঃ মফস্বলে যাদের জন্ম এবং সেই পরিবেশে যারা বড় হয়েছেন পারিবারিক এবং পরিবেশগত কারণে তাদের প্রায় সকলেরই মাতৃভাষা কোন না কোন আঞ্চলিক উপভাষা। আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশুই জন্মের পর থেকে একটা না একটা আঞ্চলিক বা উপভাষা শিখছে এবং ব্যবহার করছে, আর এটাই হচ্ছে তার প্রকৃত মাতৃভাষা। একটু বড় হয়ে স্কুলে পড়তে গেলে তাকে শিখতে হচ্ছে সাধু বাংলা। শুধু যে তার বাংলা সাহিত্য বা ব্যাকরণের বই সাধু ভাষায় লেখা তা নয়, তার ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, পৌরনীতি সমস্ত বিষয় সাধু ভাষায় লেখা। স্কুলের শিক্ষক কিন্তু তাকে ক্লাশে ঐ সব সাধু ভাষায় লেখা বই চলিত বা চলতি বা শিষ্ট কথ্য বাংলা ভাষায় পড়াচ্ছেন। স্কুলের বাইরে অর্থাৎ পাঠ্য পুস্তকের বাইরে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রধানতঃ আধুনিক কথ্য ভাষা। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান বাংলা সংবাদপত্র, সিনেমা, থিয়েটার, বেতার, টেলিভিশন, সভা-সমিতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত ভাষা 'আধুনিক কথ্য বাংলা'। আমাদের তরুণ-তরুণীর চিঠির ভাষা, প্রেমের ভাষা, আমাদের আধুনিক সাহিত্যের ভাষা কথ্য রীতির। তা'হলে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে এই, একটি শিশু ঘরে মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজনের কাছে শিখছে আঞ্চলিক উপভাষা, স্কুলে শিখছে সাধু ভাষা আর সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভাষা শুনছে বা শিখছে আধুনিক কথ্য বাংলা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধু ভাষার প্রাধান্য কিন্তু আধুনিক জীবনধারায় কথ্য ভাষার। সুতরাং আমাদের ভাষা শিক্ষা ও ভাষা প্রয়োগের

মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য থেকে যাচ্ছে। আমরা ব্যাকরণ পড়ছি লিখিত ভাষার অথচ ব্যবহার করছি কথ্য ভাষা।

কেবল পাঠ্য-পুস্তক থেকে কেউ কোনদিন ভাষা শেখেনি বা শেখে না। আড্ডা, সংবাদপত্র, সাহিত্য, সিনেমা, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি থেকে একজন নিয়ত ভাষা শিখে থাকে। ঐ সব মাধ্যম থেকে আমাদের শিশু, কিশোর ও তরুণেরা অহরহ আধুনিক কথ্য বাংলা শিখছে। ফল দাঁড়াচ্ছে এই, ঘরে আঞ্চলিক, পাঠ্য-পুস্তকে সাধু আর বাইরে কথ্য, মাতৃভাষার এই ত্রিবিধ রূপ বাংলাদেশের একজন বাংলাভাষীকে নিয়ত স্পর্শ করছে। বাংলাদেশের যেসব নাগরিকের মাতৃভাষা বাংলা নয়, সেই সাঁওতাল, চাকমা, ত্রিপুরী, মণিপুরী প্রভৃতি ভাষা-ভাষীর ক্ষেত্রে ঐ সমস্যা আরো প্রকট। কারণ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদেরকেও বাংলা ভাষা শিখতে হচ্ছে বা দ্বিভাষী হতে হচ্ছে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা 'আঞ্চলিক বা উপভাষা' বনাম 'সাধু' বনাম 'আধুনিক কথ্য' ভাষার এক ত্রিমাত্রিক গোলকধাঁধায় অহরহ ঘূর্ণায়মান। অ-বাংলাভাষী বাংলাদেশীদের জন্যে সমস্যাটি আরো জটিল, ফলে স্বাভাবিকভাবেই মিশ্রণ ঘটছে অহরহ। পরীক্ষার খাতায়, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়, চিঠিপত্রে, ফাইলের নোটে, বক্তৃতার ভাষায়, অভিনয়ের সংলাপে সর্বত্র ভাষার অবাধ মিশ্রণ। মনে হচ্ছে যেহেতু মাতৃভাষা মায়ের ভাষা সেহেতু মামার বাড়ীর আবদারের মতো আমরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেচ্ছ মিশ্রণ ঘটাতে পারি। মিশ্রণ লেখার ভাষায়, মিশ্রণ কথার ভাষায়, সর্বত্র ঐ ত্রিমাত্রিক 'আঞ্চলিক-সাধু-কথ্যের' খিচুড়ি। কারো লেখায় খিচুড়ি, কারো কথায় খিচুড়ি। এই খিচুড়ি বিদেশী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। লেখার কারচুপি ধরা পড়ে পাঠকের কাছে। পরীক্ষার খাতায়, সাহিত্যে, সংবাদপত্রের ভাষায় নিয়ত গুরুচণ্ডালী প্রতিভাত হয়। তবে আমাদের কথার ভাষার খিচুড়ি সর্বাপেক্ষা বেশী এবং কৌতূহলোদ্দীপক। উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ ডিগ্রীধারী, উচ্চপদস্থ, মুখে অহরহ বিদেশী বুলি অথচ মুখ খুললেই সমস্যা, একটা অশিক্ষিত অপরিশীলিত, অমার্জিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং তা কেবল মাতৃভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সীমিত থাকে না সাধের বিদেশী বুলির ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। ঐ সব বিত্তশালী ভাগ্যবানদের কন্ঠ ও মুখ নিঃসৃত দেশী-বিদেশী আঞ্চলিক উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গীর বিচিত্র মিশাল আমাদের মাতৃভাষার যে রূপটিকে বিকশিত করে

তোলে তা মোটেও গৌরবের নয়। এমনকি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বা ভাষাতত্ত্বের উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষক বা পণ্ডিতরাও ঐ পরিস্থিতি থেকে অনেক সময় মুক্ত নন। বাংলা ভাষা বা ভাষাতত্ত্বের যে শিক্ষক নিজের উচ্চারণ ঠিক করতে পারেননি তিনি কি করে ভাষা বা উচ্চারণ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে বা শেখাতে সক্ষম হবেন? বস্তুতঃ আমাদের ভাষাশিক্ষা ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্য চলছে।

আমাদের মাতৃভাষাকে এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তিদানের উপায় কি? সমস্যাটির দু'টি দিক রয়েছে, একটি লেখার আর একটি কথার ভাষার। লেখার ভাষায় সাধু আর চলতি রীতি মিশ্রণের এবং কথার ভাষায় আঞ্চলিক ও আধুনিক উচ্চারণ মিশ্রণের সমস্যা। এই মিশ্রণের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে প্রথমেই ভাষার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে ধারণা ও সচেতনতার প্রয়োজন। এই জ্ঞান ভাষার বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা-সঞ্জাত হওয়া প্রয়োজন। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আঞ্চলিক বা সাধু বা কথ্য কোন ভাষাই তুলনামূলকভাবে ভালো বা খারাপ নয়, অবজ্ঞা বা উপেক্ষার বিষয় নয়। স্থান, কাল, পাত্রভেদে ভাষার বিভিন্ন রূপ প্রাসঙ্গিক, মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক পরিবেশে উপভাষা ব্যবহারই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। গ্রামীণ বা লোকজীবন প্রতিফলনের জন্যে সাহিত্যে, নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য। আধুনিক কথ্য ভাষার ব্যবহার সেখানে কৃত্রিম ও অসঙ্গতিপূর্ণ। আমাদের গল্প, উপন্যাস, নাটক, বেতার, টেলিভিশন, সিনেমায় যখন গ্রামের মানুষ আধুনিক ভাষায় কথা বলে তখন তা যেমন কৃত্রিম ও অবাস্তব বোধ হয় তেমনি আবার যখন কোন পরিশীলিত, পরিমার্জিত নগরবাসীর বাচনভঙ্গীতে আঞ্চলিক উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গীর প্রাধান্য লক্ষিত হয় তখন তা কেবল গ্রাম্যতার পরিচায়কই হয়ে ওঠে না অত্যন্ত পীড়াদায়কও হয়। লেখার ভাষায় সাধু ও কথ্য রীতির পার্থক্য বজায় রাখতে (প্রধানতঃ ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে) পারলে যেমন গুরুচণ্ডালীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব, কথার ভাষায় আঞ্চলিক ও আধুনিক উচ্চারণ রীতির পার্থক্য স্পষ্ট রাখতে সক্ষম হলে তেমনি কথ্য ভাষায় মিশ্রণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মূল কথা হল, যখন যেখানে যে ভাষা বা রীতির ব্যবহার সঙ্গত সেখানে সে ভাষা ব্যবহার করতে হবে। আঞ্চলিক, সাধু ও কথ্য ভাষায় মিশ্রণ সর্বক্ষেত্রে পরিহার করতে হবে।

. কথ্য ভাষায় মিশ্রণ পরিহার করা কষ্টসাধ্য। তুলনামূলকভাবে লেখার ভাষায় সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ কয়েকটি সূত্র মেনে চললে দূর করা সহজ। যেমন বানানের সূত্র মেনে চললে শুদ্ধ বানান লেখা কঠিন নয়। কিন্তু সমস্যাটি প্রকট কথার ভাষায়। আধুনিক কথ্য বাংলায় আঞ্চলিক প্রভাব দূর করবার জন্যে প্রয়োজন একজন ভাষাভাষীর নিজের দুর্বলতা বা অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা। কেউ যদি এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, তার কথা, উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গী নিখুঁত ও সুন্দর তাহলে তাকে প্রথমেই সেই ধারণা ত্যাগ করতে হবে এবং তার উচ্চারণ ও ভঙ্গীতে কোথায় কোথায় দুর্বলতা আছে তা খুঁজে বের করতে হবে। সাধারণতঃ দেখা যায় বাংলাদেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে আধুনিক কথ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণে 'এ' এবং 'এ্যা' ধ্বনির, 'অ' এবং 'ও' ধ্বনির, 'ও' এবং 'উ' ধ্বনির মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ব্যঞ্জন ধ্বনি ক্ষেত্রে আধুনিক কথ্য বাংলার স্পৃষ্ট তালব্য 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' ধ্বনিগুলো আঞ্চলিক প্রভাবে ঘৃষ্ট দন্ত্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর ঘোষ-মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট 'ঘ' 'ঝ' 'ঢ' 'ধ' 'ভ' ধ্বনিগুলো ঘোষ স্বল্পপ্রাণ 'গ' 'জ' 'ড' 'দ' 'ব' ধ্বনিতে পরিণত হয়। এ ছাড়াও 'র' এবং 'ড়' এবং চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারের বিভ্রান্তি তো রয়েছেই। সুতরাং আধুনিক কথ্য বাংলা ব্যবহারে উপরোক্ত ধ্বনিগুলোর যথাযথ উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-রীতির সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং যথার্থ উচ্চারণ সতর্কভাবে অনুশীলন, আয়ত্ত ও ব্যবহার করা প্রয়োজন। সর্বোপরি আধুনিক কথ্য বাংলা ব্যবহারে আঞ্চলিক স্বরভঙ্গী পরিহার করাও জরুরী। বিভিন্ন শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য শব্দ গঠনকারী ধ্বনিসমূহের যথার্থ উচ্চারণ একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। শব্দে ধ্বনিসমূহ পারস্পরিক প্রভাবে যে পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় এবং বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হলে অন্য শব্দের প্রভাবে শব্দের উচ্চারণেও যে পরিবর্তন ঘটতে পারে তাও জানা দরকার। বিভিন্ন ধ্বনি বা শব্দ বা বাক্যের উচ্চারণ সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে হবে এবং অসঙ্গতিসমূহ দূর করতে হবে। এজন্যে অত্যন্ত সজাগ কানের প্রয়োজন, অন্যের ভাল উচ্চারণ অনুসরণ করে অনেক ভুল উচ্চারণ শুধরে নেওয়া যায়।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকা বেতার-টেলিভিশন-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘোষক বা কথক, মঞ্চ, বেতার, পর্দায় অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা, সভা-অনুষ্ঠানে বক্তা আলোচকদের উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গী সম্পর্কে অত্যন্ত

সতর্ক ও সচেতন থাকা প্রয়োজন, কারণ তারাই সচরাচর অন্যদের কথাকে প্রভাবিত করে থাকেন। সংবাদপত্রের এবং সিনেমা বা টেলিভিশন স্লাইডের বানানের ক্ষেত্রেও সতর্কতার প্রয়োজন, ঐ সব মাধ্যম সহজেই ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সে কারণে ঐ সব মাধ্যমে অভিধান ব্যবহারকে নিয়মিত এবং আবশ্যিক করা দরকার। উচ্চারণ-অভিধানের প্রয়োজনও খুব বেশী হয়ে পড়েছে, অন্ততঃ প্রচলিত অভিধানে বিভিন্ন শব্দের যথাযথ উচ্চারণ-নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক ভাষার মত প্রত্যেক উপভাষারও একটা নিজস্ব স্বরভঙ্গী রয়েছে, আঞ্চলিক বা উপভাষার স্বরভঙ্গীর ছাপ অনেকের কথায় এমন প্রখর ও প্রকট যে তারা যখন আধুনিক বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় কথা বলেন তখন তারা আঞ্চলিক বা উপভাষার উচ্চারণের মতো আঞ্চলিক স্বরভঙ্গীর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন না। তারা যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন এবং তারা নিজের আধুনিকতা সম্পর্কে যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন যে কোন ভাষাতে কথা বললেই বোঝা যায় যে তারা কোন্ জেলার লোক। সুতরাং আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার ছাড়া অন্য সময় তাদের বাচনভঙ্গী সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকা প্রয়োজন যাতে তাদের আঞ্চলিক স্বরভঙ্গী আধুনিক বাংলা বা ইংরেজী বা অন্য ভাষাকে প্রভাবিত করতে না পারে। উচ্চারণ, স্বরভঙ্গী, বাচনভঙ্গী সুন্দর হলে কথাও সুন্দর হয় আর সুন্দর মুখের মত সুন্দর কথার জয় সর্বত্র। সুন্দর করে কথা বলতে পারা, শুদ্ধ করে ভাষা ব্যবহার করতে পারা একটা মস্ত বড় আর্ট। সুন্দর কথা, শুদ্ধ ভাষা সুরুচির পরিচায়ক। পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও আধুনিক মানুষ তিনি যিনি তাঁর ভাষাকে সুন্দর করতে পেরেছেন।

ভাষা আন্দোলন ঃ পূর্বকাল, উত্তরকথা

বদিউজজামান

পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য কেবলমাত্র এই বিশেষ দিন বা বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিঃশেষিত নয়। পূর্ব ভারতের সমগ্র রাজনৈতিক প্রবাহ, আন্দোলন ও সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি রূপায়িত এই ভাষা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীদের মনোরাজ্যে যে বিস্ফোরণ এসেছিল, জাতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জাগরণের সূচনা হয়েছিল তারও চিহ্ন এসে মিলেছে ভাষা-দিবসের মিছিলের উচ্চারণে। বাঙালীদের কয়েক শতাব্দীর জাতিগত অবমাননা, পুঞ্জীভূত বেদনার, হতাশার সকল প্রতিবাদ হল একুশে ফেব্রুয়ারী, সকল কালের বিজাতীয় শোষণ এবং শৃঙ্খল মুক্তির ইতিহাসে নতুন আলোকরেখার পূর্বাভাষ।

রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের প্রক্রিয়া এক দিনে শুরু হয় না এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তার সুস্পষ্ট ফলোদয় ঘটে না। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে পুনর্জাগরণের সূচনা হয়েছিল বাংলায়, যেখান থেকে স্বাধীনতার সূর্য একদা অস্তমিত হয়েছিল। নবযুগের সংঘাতে যথার্থ সমীকরণ না হলেও সমাজে বিপ্লব ও বিস্ফোরণ ঘটেছিল, ইয়ং বেঙ্গলদের সৃষ্টি হল। পুনর্জাগরণের নায়ক ছিলেন রামমোহন। রামমোহন নবযুগের পথ প্রদর্শন করলেও ঠিক পথ আগলে দাঁড়াতে পারেননি। তিনি অতীতকে জাগাতে চেয়েছিলেন যুক্তি দিয়ে। অতীত জেগেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্ধ ধর্মানুভূতির দৈত্য জেগে উঠে নব-জাগরণের ফলবান বৃক্ষে কীটের বাসভূমি রচনা করল। রামমোহনের যুক্তিবাদী প্রয়াস স্থান গ্রহণ করেছে এসে বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ প্রমুখের প্রচেষ্টার মধ্যে; যখন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি এসেছে সেখানে দয়ানন্দ স্বরস্বতী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ধর্মভিত্তিক আন্দোলনের যে বীজ রোপিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাই নব পত্র পল্লব পুষ্পে শোভিত হয়ে

উঠেছে। উপমহাদেশে বিভেদের রাজনীতি বা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনৈতিক লক্ষ্যের সূচনা হয়েছে তখন থেকেই।

গোড়াতে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের প্রভাব পুষ্ট নেতৃত্ব তাদের সামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্যের বাইরে আর কিছু মেনে নেবার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিল না। সে রকম মানসিকতার সৃষ্টিও হয়নি। ফলে পূর্ব ভারতে ঐক্যের সুস্পষ্ট রেখাকে তারা পরিত্যাগ করে অনৈক্যের শিশুবৃক্ষের মূলেই পানিসিঞ্চন করেছেন অনেক বেশী। সযত্নে লালন পালনের জন্য এর ফল ফলতে মোটেই বিলম্ব হয়নি। বরং ফল আশাতীতভাবেই ফলেছে এবং এর নিশ্চিত সামাজিক কারণ বিদ্যমান।

ইংরেজ ছিল এদেশে বাণিজ্যিক শক্তি, ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের পরে নতুন করে ভাগ্যোন্বেষণ শুরু হয়েছিল। বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লিপ্সার সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক আকাংক্ষা তার জাগ্রত হয়। পলাশী ও শেষে বক্সারের যুদ্ধের অনিবার্য পরিণামে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে তার নিশ্চিত অভ্যুদয় ঘটে। বাণিজ্য লিপ্সার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার সংযোগের ফলে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমগ্র পটভূমিই রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের পরিপূরক হয়ে ওঠে ধর্মপ্রচার ও ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের আকাংক্ষা। স্থানীয় ও কালগত বহুতর বিষয়ের সংঘাত এখানকার সামাজিক মূল্যবোধ ও রাজনীতির বিস্তার ঘটিয়েছে। ফলতঃ ইউরোপে খ্রীস্টধর্মের প্রসার যে ফলাফলের জন্ম দিয়েছে, বাংলায়, ভারতে তা সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে এসেছে। বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের আকাংক্ষা বাংলার সমাজদেহে নতুন একটি শ্রেণীর আগমনপর্ব নিশ্চিত করেছে।

ইতিহাসের যে পটভূমিতে এবং যেভাবে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের উদ্ভব হয়েছে তা সর্বদা যুক্তিকে মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়নি। এর কারণ চৈতন্যের গভীরে প্রোথিতমূল। আর এজন্য সমগ্র পুনর্জাগরণের চরিত্র অসংলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, উনবিংশ শতাব্দীর পুনর্জাগরণের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা বোধ হয় এখানেই। জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হবার আগেই জাতীয় নেতৃত্ব সুযোগ সন্ধানী হয়ে উঠেছে, মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পুনর্জাগরণের নেতৃত্ব দান করেছে যে মধ্যবিত্ত, অন্য কথায় সামাজিক সংঘাত, পুনর্জাগরণের ফলে যে মধ্যবিত্তের আগমন ঘটেছে মঞ্চে তার উদ্ভব হয়েছে বৃটিশের প্রসাদপুষ্ট হয়ে, বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক

শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার ফলে এবং তার দ্বারাই সৃষ্ট। ফলতঃ বাংলায়, ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে যাদের অনবরত আগমন ও নির্গমন ঘটেছে তারা সহযোগিতা বা সুযোগ সন্ধানীর ভূমিকা পরিত্যাগ করতে পারেননি কখনো। সামাজিক গুরুত্বের মাপকাঠি যখন ভূমি থেকে মুদ্রায় রূপান্তরিত হল সেই লগ্নে যাদের দেখা গেছে বৃটিশের বেনিয়া, গোমস্তা, দালাল ফড়িয়া, ঠিকাদার, দেওয়ান, তারা ও তাদের বংশধরেরাই পরবর্তীকালে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামনে ছিল। ফলতঃ বৃটিশের নিকট থেকে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন কখনো সহযোগিতার ঊর্ধ্বে উঠে আসতে পারেনি, বৈপ্লবিক আন্দোলনে রূপ গ্রহণ করেনি কৃপা-দৃষ্টি প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই পটভূমিতেই ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম এবং উল্লেখযোগ্য হল, রাজনৈতিক অধিকার যাচ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কংগ্রেসের জন্মপর্বের সঙ্গে কতিপয় ইংরেজ সিভিলিয়ানের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে শাসন-ক্ষমতা প্রত্যার্পণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ শ্রদ্ধা উচ্চারণের শেষ হয়নি। কংগ্রেসের পর মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছে ১৯০৬ সালে, তাদেরও লক্ষ্য ভিন্নতর ছিল না।

লক্ষণীয় হল, নবাবী আমলে রাজধানী ছিল একদা ঢাকায় এবং পরে মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরণের পরও ঢাকার গুরুত্ব কোন অংশেই কম ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের পর সকল ঐশ্বর্য নিয়ে গড়ে উঠল কলকাতা; মুর্শিদাবাদ, ঢাকা শ্রীহীন হয়ে পড়ল। বাণিজ্যের প্রয়োজনে কলকাতা নগরীর সম্ভাবনা যত বহুগুণিত হল, কলকাতাকেন্দ্রিক নতুন জীবন, সমাজ ও মূল্যবোধ গঠনের সম্ভাবনাও তত সম্প্রসারিত হয়ে উঠল। ফলতঃ কলকাতাকেন্দ্রিক ঐতিহ্যহীন জনগোষ্ঠী নবলব্ধ মুদ্রার শক্তিতে নতুন জীবন ও সমাজের জন্মদান করল, তাদের স্বার্থচৈতন্য রাজশক্তির বলয়ে নতুন জীবন ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হল। নতুন পরিস্থিতিতে সমৃদ্ধ পূর্ববাংলা হয়ে উঠল কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্প-বাণিজ্যের কাঁচামাল যোগান দেবার কেন্দ্র আর এখানকার কষ্টার্জিত সম্পদ পুঞ্জিভূত হল কলকাতায়, গঠন করল তিলোত্তমা।

বৃটিশ বাণিজ্যের উপজাত এ সম্প্রদায় কলকাতাকেই আপন বলে মনে করল অনেক বেশী। এমনকি কলকাতায় বসবাসকারী পূর্ব বাংলার কিছু

নতুন বিত্তবান সম্প্রদায়ও কলকাতাকেই অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য বলে মনে করল, কলকাতার সম্ভাবনা তার সমগ্র জীবন-দৃষ্টিকেই আচ্ছন্ন করে দিল। ফলতঃ পূর্ব বাংলার মাটির সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল, সম্পর্ক যা থাকল তা পালা পার্বণে পোশাকী আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। লক্ষণীয় হল, কলকাতাকেন্দ্রিক এসব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই বাংলার ও ভারতের নতুন সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছে। এরা পুরাতন ঐতিহ্যকে ধ্বংস করেছে কিন্তু কোন মর্যাদা-বোধের জন্ম দিতে পারেনি। সুতরাং যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাদের চরিত্রগত, তাকে পরিহার করা সম্ভব হয়নি, এখানকার রাজনীতি, সমাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই তা দীর্ঘমূল প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলতঃ তারা বৃটিশের অনুগ্রহের বাইরে আসতে পারেনি, বাইরে এসে বাঁচতে পারেনি। ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা তাদের বিপুল বিরোধের কারণ ঘটিয়েছে, ভবিষ্যৎ লক্ষ্যকে বহুধাবিভক্ত করেছে, রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্রকে যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছে। বাংলার জাতীয় আন্দোলন, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা এই নিরিখেই বিচার্য। বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু সমগ্র ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন কখনোই পুষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে সাতচল্লিশে ভারতের স্বাধীনতা কেবলমাত্র পতাকা বদলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর সেজন্য এ আন্দোলনের ফললাভও হয়েছে সীমিত, অগণিত জনমানসের বেদনার ইতিহাস এর সঙ্গে জড়িত। এসব নেতার মধ্যে কেউ অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কামনা করেছেন, কিন্তু ধানের শীষের উজ্জ্বল শিশির বিন্দুকে এড়িয়ে গেছেন, জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠনযোগ্য রাষ্ট্রীয় রূপরেখাকে ঠিক চিহ্নিত করতে পারেননি। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা বা মুক্তি আন্দোলনের মূল দুর্বলতা এখানেই। ইংরেজ ছিল সম্পূর্ণ বিদেশী শক্তি, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের এ দুর্বলতা ইংরেজের শাসন ক্ষমতা বিস্তার ও তা পরিচালনা করার ব্যাপারে অনুকূল হয়েছে অনেক বেশী। ইংরেজকে বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী বা অঞ্চলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেশ শাসন করতে হয়নি বরং বিভেদ ছিল বলেই দেশ শাসন করা তার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তা না হলে, স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে বহুগুণে বেশী এ দেশেরই মার্সেনারী সৈন্য দিয়ে এ দেশকে দুশো বছর শাসন করা এবং সে শাসনক্ষেত্র থেকে চূড়ান্ত বাণিজ্যিক স্বার্থ অর্জন করা বৃটিশের জন্য কি করে সম্ভব হল। ভাবতে অবাক লাগে, কয়েক হাজার মাইল

দূরে, সমুদ্রপার থেকে একটি বিদেশী বিজাতি এসে এদেশীয় লোকদের দ্বারা এবং এদেশীয়দের অর্থ দ্বারাই একটি রাজত্ব গঠন করল ও তা দু'শো বছর ধরে শাসন এবং শোষণ করে গেল। আবার যখন স্বাধীনতা আন্দোলন হল তাও ইংরেজদের নিকট আবেদন নিবেদনের বাইরে এসে হল না।

বৃটিশ ভারতের আয়তন, জনসংখ্যা এবং সেনাবাহিনীর তুলনামূলক একটি বিবরণ নিম্নরূপ:

বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এলাকা : ৫৫৩,০০০ বৃঃ স্কোঃ মাঃ
জনসংখ্যা : ৮৩,০০০,০০০

বৃটিশ এবং তাদের মিত্ররাজ্যের এলাকা ১,১০৩,০০০ বৃঃ স্কোঃ মাঃ
জনসংখ্যা ১২৩,০০০,০০০

হিসাবটি ১৮২০ সালের, ওয়াল্টার হ্যামিল্টনের বিখ্যাত ডেসক্রিপশন অব হিন্দুস্থান গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

১৮১৯ সালের ২২শে মার্চ বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতে সেনাবাহিনীর একটি চিত্র প্রদান করা হয়।

নিয়মিত : রাজকীয় বাহিনী : অশ্বারোহী : ৪,৬৯২
পদাতিক : ১৭,৮৫৮

সর্বমোট রাজকীয় : ২২,৫৫০

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইউরোপীয় সাঁজোয়া : ৪,৫৮৩
ইউরোপীয় পদাতিক : ৩,১২০
সর্বমোট কোম্পানীর ইউরোপীয় সৈন্য : ৭,৭০৩
দেশীয় অশ্বারোহী : ১১,০১১
দেশীয় পদাতিক : ১৩২,৮১৫
দেশীয় সাঁজোয়া, ইউরোপীয় সাঁজোয়া
বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয় : ৮,৭৫৯

সর্বমোট : ১৫২,৫৮৫
সর্বমোট নিয়মিত বাহিনী : ১৮২,৮৩৮

অনিয়মিত : দেশীয় অশ্বারোহী : ৭,৬৫৯
দেশীয় পদাতিক : ১৭,০৮২

সর্বমোট অনিয়মিত : ২৪,৭৪১
অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত : ৫,৮৭৫

সর্বমোট : ২১৩,৪৫৪

(উদ্ধৃত : হ্যামিল্টন, ঐ)

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। "এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে এক ভারতীয় সৈন্য বাহিনী দ্বারাই।"

[উদ্ধৃত : কার্লমার্কস—প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। (১৮৫৭—১৮৫৯) পৃঃ ৩২.৪১]

অথচ ভারতে অবস্থানের শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রতিটি শ্বেতকায় বৃটিশ বিদেশীই থেকে গেছে, ভারতীয় হয়ে যায়নি। বৃটিশ শাসকের নিকট এ তথ্যটি সুস্পষ্ট ছিল বলে সকল পর্যায়েই তারা ভারতীয়দের স্বাধীনতার স্পৃহাকে সযত্নে লালন করেছে, দাক্ষিণ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে অনুকূল ও ঈপ্সিত পথে বেড়ে উঠতে দিয়েছে। সেদিক দিয়ে বর্তমান ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জনক আসলে বৃটিশরাই।

কথাটি একটু ব্যাখ্যা করে বলা আবশ্যক। ১৭৫৭ সালের পর ভারতে বৃটিশ শাসন বিস্তৃত না হলে ১৯৪৭ সালে বহুজাতি বিভক্ত ভারত ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে রূপ গ্রহণ করতে পারত না। বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের এ বর্তমান ঐক্য আসলে কেবলমাত্র বহির্বঙ্গেই সীমাবদ্ধ, বহুজাতি বিভক্ত ভারতের অন্তর্নিহিত এবং অন্তর্গত ব্যবধানকে তা বিলুপ্ত করে দিতে পারেনি। বৃটিশরা সামরিক শক্তিতে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল ও সমগ্র ভারতে অর্থনৈতিক শোষণ কায়েম করেছিল. ঐক্যবদ্ধ ভারতের জাতীয়তার সেটাই হল ভিত্তি। এটা মূলগতভাবে দুর্বল, এক ধরনের আবেগ এর পশ্চাতে সক্রিয়, তা সুচিরস্থায়ী হতে পারে না। আসলে আবেগ দিয়ে কখনো স্থায়িভাবে অনৈক্যকে দূর করা যায় না, আদর্শ রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যেও পৌছানো বোধ হয় সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক সমতা ও সমাজতন্ত্রের দ্বারা সকল প্রকার অনৈক্যকে দূর করা যায়। ভারতে তা কি বর্তমান?

বাংলাদেশের জাতীয়তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাও এ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে বলে চোখে পড়েনি। দু'য়েকজন আভাসে ইঙ্গিতে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন মাত্র।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম দিকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জনৈক সাংবাদিকের একটি প্রশ্নের জবাবে দেয়ালে টাঙ্গানো মানচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন মাত্র। বলা বাহুল্য প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব এটা নয়, এবং এর অনেক পরে বেরুবাড়ী ভারতের নিকট সমর্পণ করে দেয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টে বেরুবাড়ী সম্পর্কিত মামলায় সরকারের পরাজয় হলেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সে সময় পদত্যাগ করেনি। সকল প্রকার মঞ্চ থেকে সরকারী বেসরকারী নেতাদের মুখে অনবরত জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা নয়, দার্শনিক উচ্চারণ শোনা গেছে। যতদূর মনে পড়ছে, এক সময় ইত্তেফাক পত্রিকায় আবুল মনসুর আহমদ বলেন, শেখ মুজিবর রহমানকে যদি জাতির পিতা মানতে হয় তাহলে মুহম্মদ আলী জিন্নাকে জাতির দাদা মানতে হবে। কেননা পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশের জন্ম হত না। আবুল মনসুর আহমদ অভিজ্ঞ রাজনীতিক, সাংবাদিক। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যাহ্নকালে দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে সে নেতৃত্বের বিশ্লেষণ করেছেন, জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার কথা বলতে পেরেছেন। আবুল মনসুর আহমদের এ বক্তব্যের কোন বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা সমালোচনা হয়েছিল কিনা মনে পড়ছে না। কিন্তু 'সত্য যে বড় কঠিন, সে কখনো করে না বঞ্চনা'। বাংলাদেশ পাকিস্তানের নিকট থেকে ঐতিহাসিক জন্মের ঋণ পরিশোধ করেছে একাত্তর সালে উত্তপ্ত রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে, অগণিত মানুষের স্বজন হারানোর, সম্মান হারানোর বিপুল বেদনায়।

ভারতীয় ঐক্যের কোন ব্যাখ্যা হয়নি এবং ভারত কেবলমাত্র তার জন্মসীমার মধ্যেই থেমে নেই। হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, মানভাদার, কাশ্মীর, সিকিম গ্রাস করেছে এবং আশপাশের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলোর জন্য তার সম্প্রসারণ নীতি রীতিমত হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের এ আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গী ও শোষণের প্রতিক্রিয়াজাত, সুস্থ জীবনবোধের ফল নয়। সেদিক দিয়ে বর্তমানের ঐক্যবদ্ধ ভারত ক্ষুধার্ত সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত। জোড়াতালি দিয়ে বানানো শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বয়ংজীবী, স্ববিরোধী, সুযোগ পেলে একে অন্যকে ধ্বংস করবে। তার ঘুমিয়ে থাকাটাই ঐক্যবদ্ধ শরীর

গঠনের কারণ এবং ঐক্যবদ্ধ শরীরই পাশাপাশি আর সকলের ভয় কিংবা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। একই দেহে পূর্ণতাপ্রাপ্ত অস্তিত্বগুলোর স্বতন্ত্র দাবী গ্রন্থি বন্ধনের সূত্রকে নাড়া দিলেই আগ্রাসী ক্ষুধার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকর স্বতন্ত্র ও স্ববিরোধী দাবী দেহের কাঠামো বিযুক্ত হয়ে যখন বিদ্রোহ করবে তখন তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়বে, তাব সকল ফাঁকি বেব হযে আসবে। এই চূড়ান্ত ফাঁকির কারণেই ভারতকে কৃত্রিম ঐক্য টিকিয়ে রাখতে হয়, আর এ ঐক্যের প্রয়োজনে বাহ্যিক সূত্রগুলোকে কখনো কখনো কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরতে হয়। এ ঐক্যকে গঠন ও লালন করতে পারে সমাজতন্ত্র, ভারতে তা নেই। কংগ্রেসী নেতাদের বাহ্যিক উচ্চারনের মধ্যেই তা সীমা-বদ্ধ। আসলে জাতীযতাবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্ভবতঃ সহগামী হতে পারে না কখনো, একটি অন্যটির সম্প্রসারিত রূপও নয়।

ইংরেজ আমলে নবগঠিত মধ্যবিত্তের স্বার্থবন্ধনও এ জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। ফল দাঁড়িয়েছে এই, স্বার্থের প্রয়োজন যখন যেখানে যেভাবে এবং যেদিকে হয়েছে এ মধ্যবিত্ত তার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলিত হয়েছে, আলোড়িত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় পুনর্জাগরণের সমগ্র বিষয়টিই তারা নিজেদের অনুকূল প্রয়োজনের কথা মনে রেখে সেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছে, এবং নিজেদের লোলুপ, মোহগ্রস্ত চরিত্রকেও সেভাবেই পরিচালিত করেছে। বৃটিশ আমলে বাংলাদেশের যে বিপুল সম্ভাবনা একদা উন্মোচিত হয়েছিল তা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি, মহীরূহে পরিণত হয়নি। নবগঠিত মধ্য-বিত্তের দোদুল্যমান চিত্ততা এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

পূর্ব ভারতের তরঙ্গহীন জীবনে যখনই যে যুগে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছে তাতে বঙ্গালী সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। বৃটিশ আমলে এর সমগ্র স্তরে যেমন-ভাবে নাড়া পড়েছে এর আগে তেমন ঠিক হয়নি। মার্কস সঙ্গতভাবেই বলেছেন, ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজরাই প্রথম বিজয়ী। ফলে, স্থানীয় সমাজদেহে যে শ্রেণীর উদ্ভব তাদের সংস্পর্শে ও তাদের প্রয়োজনে হয়েছে, সে শ্রেণীর জীবনপরিসরও বিজয়ীদের কেন্দ্র করে আবর্তিত। বাণিজ্য শিল্প সংস্কৃতি সবই কলকাতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মকেন্দ্রিক হিন্দু রেনেসাঁর বিস্তারের ফলে উত্তরকালীন জীবনের সমস্ত আবেগই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। পূর্ববাংলায় হিন্দুত্বের পাশাপাশি মুসলমান মধ্যবিত্তের জাগরণ ঘটেছে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুসরণ করেই তার সৃষ্টি।

মুসলমান মধ্যবিত্তের উদ্ভবের ফলে স্ব-সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার মসলমানদের জাগরণ হয়েছে, এবং চাকুরী, বাণিজ্য ও সরকারী সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলতঃ এ সবের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব বাংলা ও আসামে মুসলমান জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ছিল। হিন্দু জাগরণের পশ্চাতে যেমন হিন্দুত্বের অনুভূতি সক্রিয় ছিল তেমনি মুসলমান মধ্যবিত্তও তাদের জাগরণের জন্য ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে। কলকাতায় ছিল হিন্দু প্রাধান্য, ওয়াল্টার হ্যামিল্টন তার 'ডেসক্রিপশন অফ হিন্দুস্থান' গ্রন্থে (পৃঃ ৫৫) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মালিকানাধীন ঘরবাড়ী দোকানপাট ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। বৃটিশ নাগরিকদের—৪৩০০, আর্মেনিয়ান—৬৪০; পর্তুগীজ ও অন্যান্য—২৬৫০; হিন্দু—৫৬,৪৬০; মুসলমান—১৪,৭০০; চীনা—১০; সর্বমোট ৭৮,৭৬০টি। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানের তুলনীয় ভূমি এবং গৃহসম্পদের পরিমাণ শতকরা হিসাবে ১০০ঃ২৬·০৩। অবশ্য এর দ্বারা সমৃদ্ধির তুলনীয় পরিমাণও ঠিক বোঝায় না, কলকাতা কেন্দ্রিক নতুন মুদ্রা ও বিত্ত মুসলমানদের হাতে জমতে পারেনি সমাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক কারণেই। ফলে বাংলায় মুসলিম পুনর্জাগরণ হয়েছে প্রধানত পূর্ববঙ্গে তাও অনেক পরবর্তীকালে এবং কলকাতার তুলনায় প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পরে, আর সে অগ্রগতিও সমমানের নয়। সরকারী সুযোগ সুবিধার জন্য হিন্দু-মুসলমানের প্রতিযোগিতা সম্প্রদায়িকতাকে প্রোথিতমূল করেছে এবং অসম প্রতিযোগিতা তার বিপুল বিস্তার ঘটিয়েছে। এতে পূর্ব বাংলার উন্নতির প্রশ্নে হিন্দুমানসিকতা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, এমনকি কলকাতা প্রবাসী পূর্ববাংলার হিন্দু নেতৃত্ব ও তাকে সুনজরে দেখতে পারেনি। এসব বহুবিধ দুর্বলতার কারণেই স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রয়াস ঠিক জাতীয় চরিত্র লাভ করেনি।

এদেশে বৃটিশের ভূমিকা হল ঔপনিবেশিক, নিজেদের প্রয়োজনের বাইরে তারা হাত বাড়ায়নি কখনো! সুতরাং এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং কৃশতনু জাতীয় আন্দোলনকেও তারা নিজেদের প্রয়োজনেই ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের পার্থক্য, নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতার কারণে এখানে বৃটিশের আগমন, রাজত্ব বিস্তার, অবস্থান, বাণিজ্য সবই অনুকূল হয়েছে। তারাও এটাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে

চেষ্টা করেছে। কেবলমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের ভবিষ্যত উন্নতি ও কল্যাণের কথা ভেবে কোন সিদ্ধান্ত নেযনি। অবস্থার অসমতার কারণে এ সম্পর্কিত সকল সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ইংরেজদের স্বার্থকেই সমুন্নত করেছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, একদিকে কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চল এবং সেই সঙ্গে পূর্ব বাংলা ও আসামের উন্নয়ন সমপরিমাণে হয়নি। এটা যে হয়নি তা যেমন বৃটিশের প্রয়োজনে তেমনি যখন এ উন্নয়নের সূচনা হল তাও বৃটিশের প্রয়োজনেই। বৃটিশ বাণিজ্য যখন পুরোপুরি আমদানী ও রপ্তানীনির্ভর ছিল, কেবলমাত্র কলকাতার উন্নয়নই বহুলাংশে সে প্রয়োজন মিটিয়েছে। কোন বাণিজ্যিক স্বার্থই তার সীমাবদ্ধ পরিসরে তৃপ্ত থাকতে পারে না। বৃটিশের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, বৃটিশ তৃপ্ত থাকেনি। তার বাণিজ্যের যত বিস্তার লাভ ঘটেছে তেমনি উৎপাদনের সূত্রও তাকে খুঁজতে হয়েছে। এশিয়া ও ইউরোপের নতুন নতুন বাজার তার নিকট যেমন প্রসারিত হয়েছে তেমনি ভারতবর্ষেও কাঁচামালের পাশাপাশি প্রাথমিক ধরনের উৎপাদন লক্ষ্যের দিকে এগোতে হযেছে। বাজার রক্ষা এবং উৎপাদন নিশ্চিত ও নিরাপদ করার প্রক্রিয়াও চলেছে সেই সঙ্গে। ফলতঃ ছোটবড় শিল্প স্থাপিত হয়েছে, স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দেশীয় ব্যবসায়ীরাও বৃটিশের অনুগ্রহে এবং তাদের পরিপূরক ভূমিকা হিসাবে ছোটখাট শিল্প-স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। শিল্পের প্রয়োজনেই কাঁচামাল সরবরাহের এলাকাকে সহজগম্য ও নিরাপদ করে তোলার প্রযোজন দেখা দিয়েছে। মোটামুটিভাবে পূর্ব বাংলা ছিল বৃটিশ বাণিজ্য এবং কলকাতা ও তার সন্নি-বেশিত অঞ্চলকেন্দ্রিক দেশীয় শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের এলাকা। ফলতঃ পূর্ব বাংলার রাস্তাঘাট, রেলপথ, নদীপথ, নদীবন্দর ইত্যাদি উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই। সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি বিকাশের প্রয়োজনকেও গৌণ করা চলেনি। বাণিজ্যিক নিরাপত্তার স্বার্থে আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন করতে হয়েছে। এগুলোর সমন্বিত ফলশ্রুতি হল ১৯০৫ সালের বিখ্যাত বঙ্গভঙ্গ, পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি প্রদেশ গঠনের উদ্যোগ। বঙ্গভঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের প্রশ্নে রাজনীতির তুলনায় বাণিজ্যিক বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছিল। আর বঙ্গভঙ্গ যখন রদ হল সেখানে বাণিজ্যিক স্বার্থ উদ্ধারের সঙ্গে রাজনৈতিক বিবেচনাই বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। বলা বাহুল্য উভয় ক্ষেত্রেই

অর্থাৎ যখন বঙ্গভঙ্গ হল, এবং যখন তা রদ হল, লাভ হয়েছে বৃটিশের এবং এবং ক্ষতি যা কিছু হল তা সমগ্র বাঙালী জাতির। আর উত্তর ভারতীয় নেতৃত্ব তখনো বাঙালীকে স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়েছে, "What Bengal Thinks today, India thinks tomorrow." গোপালকৃষ্ণ গোখলের এ বিখ্যাত উক্তির মধ্যে বাঙালী মনীষার অগ্রগামিতা, দূরদৃষ্টির চিহ্ন এবং এজন্য প্রশংসা যতটুকু আছে তার চেয়ে বেশী আছে সমগ্র বাঙালী জাতির পরাজয়ের বিপুল গ্লানি। বঙ্গভঙ্গের সময়কার ভুলের মাশুল কেবলমাত্র তৎকালীন নেতাদের স্ব-কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সমগ্র ইতিহাসের ধারাকেও বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার তাৎপর্য অনুসন্ধান করে এবং গোখলের উক্তিটি ঈষৎ পরিবর্তিত করে বলা যায়, "What Bangladesh thinks today, West Bengal thinks tomorrow and the whole of India will think it day-after tomorrow"। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন ও কোলাহলের মধ্যে বাঙালী যে নেতৃত্ব হারিয়েছে, নিঃসন্দেহে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই সে নেতৃত্ব আবার পুনর্গঠিত হয়েছে এবং এর বিস্ময়কর উত্তরণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যে। অন্তরের দীপ জ্বেলে সমগ্র ভারতকেই তা পথ দেখাবে।

সাধারণ বাণিজ্যিক লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে রাজনৈতিক বিবেচনা আকস্মিকভাবেই জড়িয়ে গেছে। আকস্মিক এ অর্থে যে, এর কোন কারণ ছিল না। আবার অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে যে রাজনীতি জড়িত হয়েছে তা ঠিক আকস্মিক নয়, এর কারণ এখানকার মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের গঠনের মধ্যেই বিশেষভাবে অনুভবযোগ্য।

বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় এ নিয়ে আন্দোলন হয়েছে বঙ্গভঙ্গের প্রয়াসকে নিন্দা করে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয় প্রকারেই আন্দোলন হয়েছে। বলা বাহুল্য, যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ আগেই অঙ্কুরিত হয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তার জন্মলগ্ন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সম্ভাবনার রূপায়ন ঘটেছে, বিভিন্ন স্থানে নেতাদের চোখের সামনেই বিস্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রথম যুগে যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল, শতাব্দীর ব্যবধানে তা আদর ও সহানুভূতির দ্বারা ফলবান হয়ে উঠেছে।

বঙ্গভঙ্গের পর রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ অংশ নেন, পথের পাশে মুসলমান গাড়োয়ানের হাতে রাখী পরিয়ে দেন। পরে এর অন্তঃসারশূন্যতা ও বিপুল ফাঁকি তিনি বুঝতে পারেন। তার উপলব্ধি হয়, ঐক্যের চেয়ে সমকক্ষতা বেশী জরুরী, কেননা বাইরের ঐক্য দিয়ে ভিতরের ব্যবধান কখনো ঘোচে না। রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> 'এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে এক দেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনই স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলন ক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।
>
> [রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃঃ ৬২৮—২৯।
> উদ্ধৃত : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান—আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ; পৃঃ ২৯১]

আগে সমকক্ষতা অর্জন ও প্রসাদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছানো আবশ্যক, এ ছাড়া আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব নয়।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর উপবাস যাপনের পর পাপবিনাশী পূণ্য-স্রোতা গঙ্গায় স্নান করে আপার সার্কুলার রোডে যে মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয় ওটা আসলে পূর্ব-বাংলার ভালোবাসার প্রতীক নয় বরং এগুলোর মাধ্যমে অন্তরের অভ্যন্তরেই বিভেদের যে দেয়াল তুলে দেয়া হয় তা আর কখনো বিলুপ্ত হয়নি। এর প্রমাণ বঙ্গভঙ্গ রদের অনেক পর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় কলকাতায় আন্দোলন হয়েছে, পূর্ব বাংলায় অধিকাংশ কৃষকদের সন্তান, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষার দরকার নেই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় নৈরাজ্য আনবে, জাতীয় সমস্যাকে দীর্ঘায়িত করবে। এমনকি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নেতাও এ সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে আসতে পারেননি। সুরেন্দ্রনাথ তখনো মডারেট দলের স্বীকৃত নেতা, কংগ্রেস নেতৃত্বের সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তার রূপরেখা ও দ্বন্দ্ব তাঁর বক্তব্যে পরিস্ফুট।

বঙ্গভঙ্গের সমগ্র ব্যাপারটি কংগ্রেস অনাবশ্যক গুরুত্ব প্রদান করে, অথচ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর ঠিক প্রয়োজন বা সঙ্গত কারণ ছিল না। এখানে লক্ষণীয় হল, কংগ্রেসের জন্মলগ্নে বাঙালী নেতৃত্বের যে প্রাধান্য ছিল, বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে তা খর্ব হওয়া শুরু হয়েছে এবং উত্তর ভারতীয় নেতৃত্বের প্রাধান্য ক্রমবিস্তৃত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের সূচনা এ পর্যায়েই হয় এবং বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতীয় নেতৃত্ব বাংলায় আসে। বঙ্গভঙ্গের নতুনত্বের আকস্মিকতা এবং তার প্রতি অজ্ঞতাজনিত ভীতির সঙ্গে কলকাতা নগরবাসী কিছু পেশাদার মানুষের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা জড়িত হল। ফলতঃ বঙ্গভঙ্গের জন্য বিপন্ন ক্ষুদ্র সংখ্যক বাঙালী নেতৃত্ব গুঞ্জন করতেই উত্তর ভারতীয় কলরব এসে তাতে মিশ্রিত হল। অথচ বঙ্গভঙ্গের সমস্যা কিংবা আশঙ্কা তাদের স্পর্শ করেনি কখনো, আগেও নয়, পরেও নয়। সুতরাং বঙ্গভঙ্গের মুহূর্তে এবং তার পরবর্তীকালেও বিভিন্নমুখী আন্দোলন কিংবা সঙ্কটের আবর্তে নিমজ্জমান বাঙালী মানস নিজের হৃদয়কেও খুঁটিয়ে দেখবার অবকাশ পায়নি কখনো। ১৭৫৭ সালে ক্ষুদ্র স্বার্থদ্বন্দ্বের কোন অসতর্ক মুহূর্তে ইংরেজ যেমন করে এস স্বাধীনতা হরণ করেছিল তেমনি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতীয় নেতৃত্বের নিকট বাঙালী জাতি আরো শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করল। ইংরেজ এবং উত্তর ভারতীয় নেতৃত্ব বাঙালীদের জন্য সমান বিদেশী, বরং পার্থক্য এখানে যে, বৃটিশ প্রভু চলে যাবে, কিন্তু এরা ঠিক যাবার জন্য আসেনি। এটা নব্য উপনিবেশবাদের সমতুল্য বা এরই রূপান্তরণ। এর আগে থেকেই বাঙালী নেতৃত্বের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, কেননা অনেক ধর্মবিশ্বাসী বাঙালী জাতির নগরবাসী নেতৃত্ব কেবলমাত্র হিন্দুত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আসছিল, বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের আঘাতে তা একেবারে নির্বাপিতপ্রায় হয়ে এল। হিন্দু জাতীয়তাবাদ আরো শক্ত হয়ে শিকড় গাড়ল, পাশাপাশি মুসলিম জাতীয়তাবাদ অঙ্কুরিত ও প্রোথিতমূল হল। এসব কিছুর বাস্তবায়িত রূপ প্রতিফলিত হয়েছে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের মধ্যে। অবশ্য কেবলমাত্র ধর্মীয় চৈতন্য পূর্ব-বাংলার বাঙালী মুসলমান নির্বিশেষে জনগণকে ধরে রাখতে পারেনি, সে কথায় পরে আসছি।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই অবাঙালী নেতৃত্ব বাংলাদেশে এসে স্থায়ী আসন নিয়েছে। এর পরবর্তীকালে কংগ্রেস বা লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

আন্দোলনের যে পথই অবলম্বন করুক না কেন তা সামগ্রিকভাবে বাঙালী জাতীয়তাবোধের অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়নি। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের বন্যায় বাংলায় এসেছে তিলক, গোখলে, নেহেরু, নৌরজী প্রমুখ নেতৃত্ব, বাংলার উর্বর পলিমাটিতে বেদনাবৃক্ষের জন্মদান করেছে; আর বঙ্গভঙ্গ রদের হতাশা থেকে এসেছে জিন্নাহ্ লিয়াকত ইকবালের মত নেতৃবৃন্দ। অসহায় বাঙালীর জন্য কোনটিই ঠিক সহায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

বঙ্গভঙ্গের সুফল পূর্ব-বাংলার মানুষ স্বল্পকালের জন্য হলেও ভোগ করে অভ্যস্ত হয়েছিল। পূর্ব-বাংলার জনসংখ্যার অধিকাংশ হল মুসলমান, বঙ্গভঙ্গের ফলে তারা লাভবান হয়েছে এবং কিছু কিছু রাজনৈতিক চৈতন্যের বিকাশও এর ফলে হয়েছে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের হতাশা তাদের সে লক্ষ্যে বেশীদূর এগিয়ে দিতে পারেনি। বঙ্গভঙ্গের সমকালেই মুসলিম লীগের জন্ম হলেও পূর্ব-বাংলার বৃহত্তর মুসলমান জনসমাজ এর উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি। তার সামনে তখনো ছিল বৃহত্তর মুসলিম বিশ্ব। বঙ্গভঙ্গ রদের হতাশা তার দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছে এবং মুসলিম লীগের সংগঠন যেভাবে যারই পোষকতা করুক না কেন, তার কাছে সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার একমাত্র অবলম্বন বলে মনে হয়েছে। এটাই ক্রমে এক ধরনের জাতিগত রূপ গ্রহণ করেছে।

বঙ্গভঙ্গের প্রায় সমকালেই মহারাষ্ট্রে তিলক শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসব প্রবর্তন করেন। হিন্দুত্বের চৈতন্যে দীক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী হিন্দু নেতৃত্ব এটা হঠাৎ করে আঁকড়ে ধরে এবং বাংলায়ও সে উৎসব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর বাইরে থাকতে পারেননি। পূর্ব-বাংলার মুসলিম জাগরণকে তা আরো দূরে নিক্ষিপ্ত করে দেয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবধানের দেয়ালকে আরো বৃহৎ ও অনতিক্রম্য করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা এবং এজন্য আন্দোলন বাঙালীদের ঐক্য, জাতীয়তাবাদের সম্ভাবনা তিরোহিত করেছে, আর কোন একক ঘটনা এখানে নেই যাকে সামগ্রিক বিভেদ ও বিচ্ছেদের মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। সাতচল্লিশ পর্যন্ত মানুষ এই নেশায় আচ্ছন্ন হয়েই পরিচালিত হয়েছে। অবশ্য পূর্ব-বাংলার ক্ষেত্রে তা একটু ব্যাতিক্রমী হয়েছিল, যার ফলে সাতচল্লিশ পরবর্তীকালে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ তাকে স্থায়িভাবে আটকে রাখতে পারেনি, ১৯৫২ সালে, ১৯৭১ সালে তার প্রমাণ

পাওয়া গেছে। ১৯০৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যে ভুল করেন ১৯৭১ সালের পরে শেখ মুজিবর রহমান সেই ভুলই করেন এবং তার মাশুল দেন, সে কথায় পরে আসছি।

মহারাষ্ট্রে যখন শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসব হয় বাংলায় তখন একই সঙ্গে সিরাজুদ্দৌলা ও মীর কাশিমের প্রেত শরীরে জীবন দান করবার প্রচেষ্টা হয়। এ দুটোর মধ্যে একটা স্পষ্ট স্ববিরোধিতা আছে এবং বাঙালীদের রাজনৈতিক চৈতন্যের একটি স্বরূপ এখানে ধরা পড়ে।

সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম মোগলদেরই একটা অংশ। বাংলায় তাদের পতন মোগল রাজশক্তির পতন এবং ইংরেজ রাজশক্তির অভ্যুদয়কে চিহ্নিত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে তা ঠিক তেমন স্পষ্ট যদিও ছিল না, কেননা এ সময়ে ইংরেজরা মোগলদের নিকট থেকে দিওয়ানী নিয়ে এসে মোগল রাজশক্তিরই একটি অংশ হয়ে গেছিল। বাঙালীদের জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে এই সিরাজদ্দৌলা-মীরকাশিমকে ইতিহাসের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে এনে বাঙালীদের জীবনে, আচরণে, অভ্যাসে তাদের বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়। আবার একই সঙ্গে গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের জন্যও সাড়া পড়ে যায়। শিবাজী উৎসব হল হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলেই শিবাজীর আবির্ভাব, সুতরাং কেবলমাত্র হিন্দু মানসিকতাই এহেন বৈপরীত্যকে আহ্বান জানিয়েছে। যদি বলা যায় মোগলরা বিদেশী ছিল, শিবাজী দেশের মাটিতেই উদ্ভূত। কিন্তু সেখানেও সমাধান মেলে না, কেননা মহারাষ্ট্রে শিবাজীর অবস্থান বা ভূমিকা যাই হোক না কেন, বাংলার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, বাংলায় শিবাজীর আগমন ও পরিচয় লুঠেরা হিসেবেই। লুঠেরার বেশে শিবাজীর আগমন বাংলার স্বাধীন রাজশক্তিকেই এক সময় দুর্বল করে দিয়েছিল যার পটভূমিতে বৃটিশ কর্তৃক সমগ্র ভারতে রাজশক্তির বিস্তার করা সম্ভব হয়েছে। বাংলায় শিবাজীকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা নিশ্চিতভাবেই স্বার্থপ্রণোদিত, বাঙালী জাতীয়তার মধ্যে বিভেদ ঘটানো। অথচ আশ্চর্য, এই সূত্র ধরেই তিলক-গোখলেদের নেতৃত্ব বাংলায় এসেছে এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের সম্ভাবনার বিনাশ ঘটিয়েছে। আরো পরবর্তীকালে দেখি, জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের পর বিক্ষুব্ধ বাঙালী জনতা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সিরাজুদ্দৌলার অন্ধকূপ হত্যার প্রতীক ভেঙ্গে দেয়। অথচ আশ্চর্য, প্রথম সর্বভারতীয়

স্বাধীনতা সংগ্রাম, সিপাহী বিদ্রোহের প্রাথমিক সাফল্যে বাঙালী মনীষা চিন্তিত হয়েছিল, সিপাহীদের গৌরবের স্মৃতি পরবর্তীকালেও ভুলে যাবার চেষ্টা করেছে। একদিকে বাঙালী নেতৃত্ব যে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেছে আবার তাকে অস্বীকারও করেছে কখনো কখনো। অব্যবহিত লাভ, ক্ষুদ্র স্বার্থ, লোলুপ মূর্খতা তাকে চালিত করেছে। এর ফলে হিন্দু জাতীয়তার অন্ধ-আবেগ ও নানাবিধ ক্ষুদ্র স্বার্থের বৈপরীত্য তার বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করেছে। এ ক্ষেত্রে নবগঠিত মধ্যবিত্তের মানস-বৈশিষ্ট্য ও বৈপরীত্যের কথা বিশেষ-ভাবে মনে রাখতে হবে। আর এ কারণেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে আবেগ ও আন্দোলন তার যেমন কোন কারণ ছিল না, তেমনি বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পর কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলে এবং পুনর্বার সাতচল্লিশে সুদূর-প্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত বঙ্গ বিভাগ হলে সেজন্য কোন আন্দোলনই হল না। এখানে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সেই বিখ্যাত উক্তির কথাই মনে পড়ে, কী বিচিত্র এই দেশ!

বঙ্গভঙ্গ রদ এবং কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরণের ফলে বাঙালী-দের রাজনৈতিক আন্দোলনে যে বিপুল ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় পরবর্তী-কালের রাজনীতিকেও তা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। রাজধানী স্থানান্তর-ণের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাকে রোধ করা হয়েছে অথচ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় যে সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের সূচনা হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, তা সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ এবং এমনকি তার পরবর্তীকালেও একেবারে মুছে যায়নি। এটাকে বিলোপ করবার জন্য পূর্ব-বাংলার মানুষকে আরো অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হয়েছে, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রাম সেই একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। লক্ষণীয় হল, কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তরিত হবার পর তখনো কতিপয় বাঙালী বিপ্লবী নিজেদের দিকে না তাকিয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আত্মসম্মোহিত, দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের হাতির পিঠে বোমা মারতে ব্যস্ত। সমগ্র আন্দোলন এবং তার ফলশ্রুতি যে বাঙালীদের হাত থেকে চিরতরে চলে গেল সেদিকে বাঙালী নেতৃত্ব কখনো ফিরে তাকায়নি। আসলে উপলব্ধিগত অপূর্ণতা থাকলে মহৎ কোন লক্ষ্য অর্জিত হয় না। বাঙালী নেতৃত্বের গলদই তার প্রমাণ দিয়েছে। সেই মুহূর্তে বাঙালী চিনতে ভুল করেছে বৃটিশ শাসন এবং উত্তর ভারতীয় নেতৃত্ব দুটোই

তার কাছে সমান বিদেশী। কোন অবস্থাতেই এ দুটো ঠিক পারস্পরিক বিকল্প নয়, এ দুটোরই প্রতিরোধ সমানভাবে কাম্য। বাঙালী নেতৃত্বের চরিত্র ভুল বোঝাবার উপযুক্ত ছিল, ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধন ও হিন্দুত্বের অন্ধ-আবেগ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ফিরবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছিল। পূর্ব বাংলার মানুষ এর উত্তর দিয়েছে ১৯৫২-তে, ১৯৭১-এ, ১৯৭৫-এ। বঙ্গ-ভঙ্গের পরবর্তীকালে ফলতঃ জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের পরিবর্তে ১৯৪৭-এ ধর্ম-ভিত্তিক দেশ বিভাগ হল। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগও যে পূর্ব-বাংলার জনমানসের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারেনি তার প্রমাণ পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের পঁচিশ বছরের ইতিহাস।

সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ এবং প্রকৃতপক্ষে পূর্ব-বাংলাকে নিয়ে পাকিস্তা-নের পূর্বাঞ্চল গঠন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ভিন্নতর পটভূমিতে ও পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গেরই সম্প্রসারিত রূপমাত্র। অর্থাৎ এই পূর্বাঞ্চলের বিভাগ এবং যখন এটা ঘটল ততদিনে তার প্রয়োজনীয়তা ঠিক আগের মত নেই। প্রধানতঃ এজন্যই সাতচল্লিশের পাকিস্তান অর্জনের আবেগ ১৯৫২-তে এসে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, আশাভঙ্গের ব্যর্থতা সর্বত্র সঞ্চারিত হয়েছে।

অত্যধিক নদনদী পরিবেষ্টিত, যোগাযোগের সুবিধাবিহীন পূর্ব-বাংলা ভৌগোলিক দিক থেকে বরাবরই প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল, এর বহু এলাকা সহজগম্য ছিল না। এটা পূর্ব বাংলার চরিত্রকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে দিয়েছে এবং এ স্বাতন্ত্র্যও ঠিক একদিনের সৃষ্টি নয়। এখানকার মানুষের জীবন ও মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে। বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের বিপর্যয়গুলো পূর্ব-বাংলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আরো পরস্পরের কাছাকাছি এনে দিয়েছে, গভীর সম্পর্কও নির্মাণ করে দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য সর্বত্র যে হতাশা সঞ্চারিত হয় তার ফলে নিঃসঙ্গ আত্মসাক্ষাৎকারের সুযোগও তার এসেছে। সুতরাং ঠিক জাগরণের মুহূর্তে নেতৃত্ব চলে গেলেও একটি আন্দোলনের চরিত্র তারা লাভ করেছে প্রায় জাতি-গতভাবেই। এটা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় যেমন মনের সমগ্র উত্তাপ সঞ্চারিত করেছে তেমনি বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলায় নবলব্ধ হতাশা থেকে নতুন আন্দো-লনেরও সূচনা করেছে। সাতচল্লিশ থেকে একান্ন সাল পর্যন্ত এই স্বল্প সময়কে ট্রানজিসন পিরিয়ড বলে আখ্যা দেয়া যায়। ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদের আহত চৈতন্য যে স্বার্থবুদ্ধির জন্ম দিয়েছে, আন্দোলনের মোড়ে মোড়ে তা বাঙালী

জীবনে নতুন শক্তির সঞ্চার করেছে। বঙ্গবিভাগ রদ হবার ফলে যে পশ্চিমা নেতৃত্ব পূর্ব-বাংলায় এসে স্থান গ্রহণ করে তার সঠিক চরিত্র বোঝা গেছে সাতচল্লিশ থেকে একান্নর মধ্যেই, অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থ কখনো বিদেশী বা অস্থানীয় নেতৃত্ব দ্বারা সম্ভব নয় এ সত্য তারা উপলব্ধি করেছে। সুতরাং প্রয়োজন হয়েছে আন্দোলনের, নতুন সংগ্রামে শপথ নেবার। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের সুযোগসন্ধানী হিন্দু নেতৃত্ব নিজেদের বিলুপ্ত করে দিয়েছে ভারতীয় নব ঐক্যের যুপকাষ্ঠে আর বিচ্ছিন্ন পূর্ব বাংলা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্ভাবনাতেই ঠিক জেগে উঠেছে, পথ চিনে নিতে কষ্ট হয়নি। এর কারণ পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অভ্যুদয় সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্ভাবনাকে প্রশস্ত করে দিয়েছে তার সুস্পষ্ট পূর্বাভাষ ভাষা আন্দোলনের মধ্যে নিহিত। ভাষা আন্দোলনের চরিত্রগত অসংখ্য দুর্বলতা থাকলেও ইতিহাসের প্রকৃত প্রবাহকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং পূর্ব-বাংলায় বঙ্গভঙ্গ রদের ব্যর্থতাজনিত শূন্যতার মধ্যে যে সব আগন্তুক নেতৃত্ব বাংলায় এসেছিল তাদের বিজাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম সফল জবাব হল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে জনগণ প্রথম নির্ভুল ও সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এরপর থেকে পূর্ব-বাংলার রাজনীতিতে জনতার আগমন নিশ্চিত হয়েছে এবং এই সচেতন জনগোষ্ঠীই একাত্তর সালে জন্ম দিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এদিক দিয়ে সাত-চল্লিশের দেশ বিভাগের সঙ্গে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পার্থক্য হল মৌলিক, এটা বিশেষভাবে বোঝা দরকার।

সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ একাত্তর সালে অর্জিত স্বাধীনতার সম্পূরক নয়, ভিন্ন পরিস্থিতিতে বঙ্গভঙ্গেরই সম্প্রসারিত রূপ আগেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং পাকিস্তানের সৃষ্টি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ঐতিহাসিক সূত্রেই সম্পর্কিত, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে যে বাসনা বিলীন হয়ে যায় সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব-বাংলার মানুষ আবার তাকে সাজিয়ে তুলতে পেরেছিল, আত্মসাক্ষাৎকারের একটি সুযোগ পেয়েছিল।

অনেকে বলেছেন, এখনো বলছেন, বর্তমানের বাংলাদেশ লাহোর প্রস্তাব-ভিত্তিক পূর্ব-বাংলারই বাস্তবায়িত রূপ। কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়, এর মধ্যে চোরাবালি আছে। আবুল মনসুর আহমদ এ ভুলটা করেছেন; এক সময়ে

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আগে সম্ভবতঃ মওলানা ভাসানীও করেছেন। সমগ্র ব্যাপারটি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ, বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে তা সম্ভব নয়, ইচ্ছাও নেই। এখানে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। বহু ক্ষেত্রেই অনেক মন্তব্য আকস্মিকও মনে হতে পারে, কেননা সেগুলো ব্যাখ্যা করার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

একাত্তর সালে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যে ঠিক লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। এ বক্তব্যের অন্যতম প্রধান একটি কারণ হল, স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক। ভারতের জনৈক বিরোধী দলীয় নেতা সম্প্রতি প্রশ্ন তোলেন, জওহরলাল নেহেরু এক পাকিস্তান সৃষ্টি করেন, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সৃষ্টি করেছেন দুটো পাকিস্তান।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সাহায্য করেছে কেবলমাত্র পরোপকারের জন্য মহৎ অনুপ্রেরণাবশতঃ নয়, তার জাতীয় স্বার্থেই। যারা সহায়তা করেনি তারাও তেমনি জাতীয় স্বার্থেই করেনি। ভারত চেয়েছিল পাকিস্তান ভাঙতে আর বাংলাদেশ চেয়েছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে। এ দুটো ইচ্ছা মিলেছিল যে বিন্দুতে এসে সেখানেই বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারত সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিল। এখানে দুটো দৃষ্টিভঙ্গীর সূক্ষ্ম এবং মৌলিক পার্থক্যটুকু লক্ষ্য করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল বলে তার পক্ষে সম্ভব হয়নি একটি শোষককে তাড়িয়ে অন্য একটি শোষককে স্থান করে দেয়া। আর ভারত চেয়েছিল পাকিস্তান ভাঙতে এবং সেজন্য একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের ওপর অধিকার দাবী করেছিল কখনো রক্ষকের, বন্ধুত্বের, মৈত্রী চুক্তির। ভারতের প্রসাদপুষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ভারতের এ অভিপ্রায়কে বহন করে চলেছিল বলে ইতিহাস সে পথের দুঃখ সরিয়ে দিয়েছে। এটাই স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অবনমিত সম্পর্কের অন্যতম প্রধান একটি কারণ। সুতরাং বাংলাদেশ যখনই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে চেয়েছে তখনই ভারতীয় নেতাদের মনে হয়েছে, বাংলা-দেশের কৃতজ্ঞতার ঋণ মুছে গেছে; অধিকতর ভাববাদীরা বলেছেন, ইন্দিরা

গান্ধী দ্বিতীয় পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রতি ভারতের জন্মলগ্নের শত্রুতা বাংলাদেশের ওপরও এসে পড়েছে, আর এখানেই পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক উন্মোচিত হল। বাংলাদেশের জন্য বন্ধু নির্বাচিত হবে জাতীয় স্বার্থের কথা মনে রেখে, কৃতজ্ঞতার ঋণ বা তৃতীয় পক্ষের শত্রুতা থেকে নয়। এই পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশের বিভ্রান্ত নেতৃত্বগুলো ভুল করছেন, পূর্ব ভারতের দিগন্ত থেকে জাতীয় স্বাধীনতার, মুক্তির প্রথম রক্তিম সূর্যোদয়কে বলছেন লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল, কিন্তু এ দর্শন নিঃশেষিত হয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যেই। দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল কথা ছিল, ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবী কিন্তু সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাগ্যের কথা চিন্তা করার আবশ্যক হয়নি। এবং এর সূত্র ধরেই ভারতের গোড়া জনসংঘ দল এখনো ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে রেখেছে যে তারা যদি পাকিস্তানে বিশ্বাস করে তাদের জন্য ভালো পাকিস্তানে চলে যাওয়া। আর পাকিস্তানে বিশ্বাস না করলে তাদের উচিত পাকিস্তানকে ভাঙার জন্য সমবেত হওয়া। ব্যাপারটি যত সহজে বলা হল, ঘটনা অত সহজে ঘটে না। বাংলাদেশের অভ্যুদয় কিন্তু পাকিস্তান ভাঙার ফল নয়, অনেকে এটা ভুল করেন। এতে বাঙালীদের মুক্তির প্রয়াসকে, সকল আন্দোলনকেই অত্যন্ত ছোট করে দেখা হয়, ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়। প্রকৃত জাতীয়তাবাদের রূপায়ণ ঘটেছে বাংলাদেশের সৃষ্টিতে, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে এই প্রথম বৃক্ষ, এখনো একক ও অনন্য। সর্বভারতীয় ঐক্যের কাঠামোতে মুসলমান সামন্তবাদী (প্রধানতঃ পশ্চিমা) ও সুযোগসন্ধানী মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ সঙ্কুচিত ছিল বলেই কংগ্রেসের বাইরে মুসলিম লীগ জীবনীশক্তি লাভ করে, পাকিস্তান সৃষ্টির এটা অন্যতম একটি কারণ। এবং এই দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তারাই সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের নবজাতককে ফেলে আসলেন।

আসলে পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটেছে তার জন্মলগ্নেই, জিন্নাহ সাহেব ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট পাকিস্তান কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীর সভাপতিরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষণা করলেন:

......You may belong to any religion or caste or creed—

that has nothing to do with the business of the state...
Now, I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in course of time, Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state...

[Jamil-ud-Din-Ahmed : Speeches and writings of Mr. Jinnah, Vol. II, pp, 403-4]

পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের মৃত্যুটি একটু বড় রকমের বলেই মৃতদেহকেও এত দীর্ঘদিন ধরে বহন করে নিয়ে বেড়াতে হয়েছে। এটা অপ্রিয় একটি সত্য এবং এ সত্যটুকু যারা না বোঝেন, না বুঝাতে চান তারা জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের মত শক্তিশালী দূরবীন নিয়ে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানী ভূখণ্ডের দিকে এখনো তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। শেখ মুজিবের বিদায় গ্রহণ তাদের দৃষ্টি খুলে দেয়নি। সাতচল্লিশের পাকিস্তান সম্পর্কে বাঙালীরা প্রথম সচেতন হয়েছে বায়ান্ন সালে, ষাটের দশকের শেষে এসে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেছে। পাকিস্তানের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছে উনিশ-শো একাত্তর সালে, হৃদয়ে, নগরে, জনপদে, যুদ্ধক্ষেত্রে। উনসত্তর সালে গণ-আন্দোলনের শেষে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের শ্বাসরুদ্ধ হয়েছে, তা চূড়ান্ত হয়েছে পঁচাত্তর সালে। বাংলাদেশও তার জন্মের মুহূর্তে, একাত্তর সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পাকিস্তানের দিনগুলোর কথা মনে রেখে এখনো যারা বসন্তযাপন করেন তাদের রাজনৈতিক দর্শন সামন্তবাদী হাওয়ার দ্বারা চালিত। এদের সৃষ্টি পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোতে, সুতরাং পাকিস্তানকে আদর্শ মনে করার ইচ্ছা দূর করতে পারেন না। প্রকৃত অর্থে এরাই হল বাংলার মাটিতে পাকিস্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

১৯০৫, ১৯১১, ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭৫-৭৬ সালের মুক্তিকামী জনতার দৃষ্টিভঙ্গীজনিত পার্থক্যটুকু বোঝা দরকার। উল্লিখিত সনগুলোর পার্থক্য কেবলমাত্র সময়ের নয়, সম্পূর্ণ জীবনবোধের, মূল্যবোধের। এখানে জনতার এবং আন্দোলনের চরিত্র কিন্তু এক থাকেনি কখনো, এটাই বাংলার মানুষের ক্রম-উত্তরণের ইতিহাস। অনেক সময় একই মানুষের জীবনেও এ পরিবর্তনগুলো বারংবার এসেছে এবং প্রতিবারই তাকে নবজীবন এবং

'মহাজীবন' দান করেছে। প্রত্যক্ষ এ পরিবর্তনের একক উদাহরণ যদি কেউ দিতে চান তা হল মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর জীবন দর্শনে যত অস্পষ্টতা এবং এ ব্যাপারে যত মতপার্থক্য হোক না কেন, সম্ভবত এটা সবাই স্বীকার করবেন যে প্রতিটি আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি ছিলেন। পঁচাত্তর সালের পরও এবং মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্তও সময়ের প্রবাহের প্রতি তিনি সচেতন ছিলেন।

১৯১১-তে মানুষ আশ্রয়-সন্ধানী ছিল, বঙ্গভঙ্গ রদের শূন্যতা থেকে এসেছিল অচেনা মানুষগুলো ভালো কথা বলে সুভ্রাতৃত্বের চেনা কথা বলে। সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন সালের মধ্যে তাদের সহযোগী সৃষ্টি হয়েছে পূর্ব-বাংলায় —ভূস্বামী থেকে, ফটকার কালো টাকা থেকে। সাতচল্লিশ পরবর্তী আন্দোলন-প্রসূত জনতার জীবনদৃষ্টি এদেরকেও চিহ্নিত করেছে পশ্চিমাদের সঙ্গে। এর প্রতিক্রিয়া ও পটভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন শেখ মুজিবর রহমান ও তার অনুসারিবৃন্দ। তাদের এক সময়কার বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ এখানেই। নিঃসন্দেহে তারা বাঙালী স্বার্থের প্রতি আর একটু অগ্রসরমান ছিলেন, কিন্তু উদ্ভবকালীন মধ্যবিত্তের শ্রেণী চরিত্রকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি, পারেননি প্রসাদ গ্রহণের রাজনীতি থেকে বিরত থাকতে, শ্রেণীগত শোষণের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করতে। ছিয়াত্তর সালের রাজনৈতিক অঙ্গনেও কিছু মুখের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যারা বাংলাদেশের সৃষ্টির ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে নির্বাচনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন, সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। কিন্তু তারা বোধ হয় জানেন না যে, তারা এদেশে এক সময় পাকিস্তান সৃষ্টির দায় দায়িত্ব হিসাবেই গৃহীত। পাকিস্তানের সোনার তরী ফসলে ভরে গেল, কৃষককে নেয়নি বলেই তারা পড়ে আছে।

ভারতের বিভিন্ন সুপ্ত জাতীয়তাবাদী অঞ্চল যখন যেভাবে হিন্দীর সঙ্গে বিলীন হয়ে গেল পূর্ব-বাংলায় তখন এসেছিল উর্দু। যার ফলে দেশ বিভাগের প্রথম দিকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শেষ হয়নি। বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদরা বিতর্কের উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। এর সমাধানের জন্য তারা চেয়ে দেখেননি মায়ের মুখের দিকে, বাবার মুখের দিকে, কৃষকের লাঙ্গলে, শ্রমিকের পেশীতে। এদিকে দিয়ে পূর্ব-বাংলায় ভাষা আন্দোলন হল প্রকৃতপক্ষে বিজাতীয় এবং দেশীয় শোষক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার প্রয়াস, ইতিহাসের ধারাকে মুক্তি দেবার ও বাধামুক্ত করার সাধনা। এবং এটা

সফল বলেই ভাষা আন্দোলনের আবেদন এত সুদূরপ্রসারী। একাত্তর পরবর্তী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে যদি পৃথিবীর মানচিত্রে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তার নিজের যা কিছু সম্বল আছে, ঐতিহ্য আছে, তা অনুসন্ধান করে পুনর্গঠিত করে নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালীদের সামনে সেই সুযোগই সম্প্রসারিত করে দিয়েছে, একাত্তরে বাংলা দেশের অভ্যুদয়ও সেই একই উৎস থেকেই।

লক্ষণীয় হল, শোষককে তাড়াবার প্রয়াস কেবলমাত্র পঞ্চাশের দশকে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলন, আটায়োর সামরিক শাসন থেকে মুক্তির প্রয়াস, পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধপরবর্তী হিস্যা কামনা, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম এরই ফলশ্রুতি। পঁচাত্তরের আগস্টে শেখ মুজিবের অন্তর্ধান এবং ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার সম্মিলিত ক্ষমতা গ্রহণ কোনটিই ইতিহাসের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাংলাদেশের বায়ান্ন পরবর্তী ঘটনাপঞ্জীতে শেখ মুজিব ভিক্টোরিয় ট্রাজেডীর মহানায়ক, অবরুদ্ধ নদীর স্রোতকে পাথরের বন্ধন থেকে মুক্তির কাজে সহায়তা করলেও নদীর বিপুল প্রবাহের গতিপথ তিনি নিরূপিত করতে পারেননি। ফলতঃ উৎসের সেই স্রোতধারাতেই তাকে ভেসে যেতে হল। উনসত্তরের গণবিস্ফোরণের সাথে সাথেই আসলে শেখ মুজিবের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে, তিনি আন্দোলনের সাথে ছিলেন একদিন অনামী ঝরে পড়বার জন্যই। এরপর চলমান হতভাগ্য ছায়ার মত মঞ্চে উঠে কিছু সময় কোলাহল করলেন, তারপর আর নেই। এ জীবনও কি সেই মূর্খের কথিত গল্পের মত নয়, যা কেবলমাত্র শব্দ করে, কিন্তু কোন অর্থ বহন করে না? তার জীবনের ট্রাজেডী এখানেই যে, আন্দোলনের চরিত্র না জেনে আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। উনসত্তরের পর শেখ মুজিব হয়ে উঠেছিলেন শোষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধনের একটি নিশ্চিত এবং অদৃশ্য সূত্র, কিন্তু তাঁর জানা ছিল না, জনমানসের রাজনৈতিক চৈতন্য তাঁকে অতিক্রম করে বহুদূর চলে এসেছে। তাঁর নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এখানেই যে, তিনি জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, জনতাই তাঁকে পরিচালিত করেছে। জীবিত অবস্থায় জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের কাছে তিনি একথা প্রকারান্তরে স্বীকারও করে গেছেন। ফলতঃ দেশের মধ্যেকার অসাধু মানুষদের হাতের পুতুল যেমন সেজেছিলেন, তেমনি বিদেশী স্বার্থদ্বন্দ্বের অসহায় ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। ট্রাজিক

পরিসমাপ্তি এবং এ বিড়ম্বিত ভাগ্য বোধ হয় তাঁর জন্মের প্রথম দিনেই নির্ধারিত হয়েছিল। সুতরাং জনগণ থেকে তিনি অবশ্যম্ভাবীরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, যে জনগণই একদা তাঁকে সৃষ্টি করেছিল, যে জনচিত্ত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে শোষকের চরিত্রকে আঘাত করেছে তাদের স্বেদযুক্ত অভিজ্ঞতার নিকট সম্ভব ছিল না শেখ মুজিবকে এবং শোষণের সূত্রকে একত্রে বজায় রাখা। কেননা শেখ মুজিবের সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয় জীবনের বিশেষ একটি প্রয়োজনে, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজন ততদিন শেষ হয়েছে এবং এরপর টিকে থাকার চেষ্টাই রক্তপাতের কারণ ঘটিয়েছে।

অনেককে বলতে শোনা যায় শেখ মুজিব বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন, বাঙালী জাতি কৃতজ্ঞ নয়। কিন্তু তারা এ সত্যটি বোধ হয় ভুলে যান যে, যে জাতি দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে তারা কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে বন্ধনরজ্জু কিনতে পারে না, ইতিহাসের এই অমোঘ বিধান তাদের দৃশ্যপটে নেই। বাংলার ইতিহাসে শেখ মুজিবের অনুপস্থিত নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন পর্যন্ত। তার চরিত্রে ছিল না সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার, অথচ ঊনসত্তর সালের পর দেশ নিশ্চিতভাবেই অগ্রসর হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে। এই সংকটজনক মুহূর্তে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সামনে থাকাটাও অগণিত নিরীহ নাগরিকদের জীবননাশের কারণ ঘটিয়েছে। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে মধ্যবিত্তের সুযোগ সন্ধান ও দোদুল্যমান চিন্তা থেকে। তারা বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে, সত্তরের প্রারম্ভে বসে তখনো ঊনবিংশ শতাব্দীর আশী-নব্বইয়ের দশকের রাজনীতি করছেন. ইতিমধ্যে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রের শাখায় শাখায় অনেক পানি গড়িয়ে গেছে সমুদ্রে, দেশ এগিয়ে এসেছে আর একটি বক্সারের যুদ্ধের জন্য। নিশ্চিতভাবেই এ সংগ্রামে বাঙালীরা বিজয়ী হয়েছে, হারোনো স্বাধীনতা উদ্ধার করেছে, এটা বাঙালীদের গৌরবের আসনে সমাসীন করেছে।

আগেও উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের জন্ম হয়েছে শাসক শ্রেণীর প্রসাদপুষ্ট হয়ে, সহযোগিতা থেকে। শেখ মুজিবর রহমানও এ থেকে ব্যতিক্রম নন। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে সহযোগিতার আওতায় নির্মিত নেতৃত্ব বা আন্দোলন থেকে নয়। ' সে ধরনের নেতৃত্ব এবং আন্দোলনের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের লগ্নে এবং তার ঐতি-

হাসিক পরিসমাপ্তিও হয়েছিল সাতচল্লিশ সালেই। উনসত্তর-সত্তর-একাত্তরে এসে সেই মৃত অশ্বের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য, ইতিহাসের সেই আমোঘ বিধান নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। উনসত্তরের পর বাংলাদেশে আন্দোলনের নেতৃত্ব দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে, আন্দোলন চলে গেছে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে, স্পষ্ট স্বাধীনতার লক্ষ্যে; এবং আওয়ামী লীগের আপোষকামী নেতৃত্ব তখনো ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেবার জন্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ভবনে আলোচনায় ব্যস্ত। ফলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের জন্য 'সম্মোহিত' ঢাকাবাসীরা বিস্মিত হয়ে পঁচিশে মার্চের কাল রাত্রিতে অবলোকন করেছে কিভাবে খাঁচায় ভরা জীবন অগ্নিদগ্ধ হয়, বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয় টেস্টটিউবে ভরা ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ, জীবনবোধ, মূল্যবোধ। এরপর আরো বিস্মিত হয়ে দেখেছে মানুষ, পলায়নপর আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দেশকে, দেশের মানুষকে ছেড়ে বিদেশী রাষ্ট্রের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে আদর্শের কথা বলছেন। তাদের জীবনযাত্রার কথা দেশের মানুষের কাছে আর অজানা নেই।

সৌভাগ্য আমাদের, বীরপ্রসূ বাংলা বীর সন্তানকেও জন্ম দিয়েছে। দেশের নির্ভীক সৈনিক, বাংলাদেশ রাইফেলস, মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এ পরাজয়ের জবাব দিয়েছে, জীবনকে বাজী রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ২৬শে মার্চ ১৯৭১ ইয়াহিয়া খানের ঘোষণাই প্রকৃত-পক্ষে আওয়ামী লীগ নেতাদের গৌরবের আসনে বসিয়েছে যে, আওয়ামী লীগ নেতারা পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিল, ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল।

এসবের প্রতিবাদ হয়েছে, পাকিস্তানের প্রচারের প্রতিবাদ তৎকালীন সরকারের প্রায় সকল নেতাই করেছেন। বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ,এইচ, এম, কামরুজ্জামান বলেন :

.....It was not the Awami League which broke off the talks, the Awami League had not concieved of a war, not to talk of preparing for it.

[Patriot, New Delhi, May 31, 1971. Quoted in Bangladesh Documents, pp. 321]

স্বাধীনতার কথা আওয়ামী লীগ বলেনি, তাদের সুবিধাবাদী চরিত্রে তা ছিলও না। কেননা এর গঠনই আপোষমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে স্বার্থ

অর্জন করা। পাকিস্তান হওয়ার ফলে তাদের স্বার্থ অর্জিত হয়নি তা নয়। আশু লক্ষ্য অর্জন দূরতর লক্ষ্যের জন্য দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রস্তুত ছিল না। নেতৃত্বের এ দুর্বল স্বার্থলোলুপ চরিত্রের জন্য যুদ্ধপরবর্তী-কালে বিদেশী নতুন প্রভুর হাত ধরে এসে ক্ষমতায় বসতে দ্বিধা হয়নি, ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে তা উঠতে পারেনি। কেবল তাই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা তাদের সামনে যে বিপুল সুযোগ এনে দিয়েছে তার সদ্ব্যবহার করতে তাদের আটকায়নি। মুক্তিযোদ্ধারা অসম্মানের শিকার হয়েছে, প্রসাদ পেয়েছে ভাই, ভাগিনা, ভাতিজা, আত্মীয় পরিজন, চাটার দল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশ্য নেতৃত্বের এসব দুর্বলতার কারণেই যুদ্ধপর-বর্তীকালে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়েছে, কোন্ নেতা কার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা মনে মনে ভেবেছিলেন, কে কার আগে কৌশলে উচ্চারণ করেছিলেন অথবা স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পেরেছিলেন। মুক্তি-যুদ্ধের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এসব আস্ফালনের বিপুল ফাঁকি ধরা পড়বে। আসলে এ ধরনের বাক্-প্রতিযোগিতার উৎস কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী-কালের ফল কুড়ানোর প্রতিযোগিতা থেকেই। 'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি/মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।'

সত্তর সালের জীবননাশী ঝড় এবং ঝড়ের পরে নির্বাচন বাঙালীদের জীবনকেও আন্দোলিত করে দিয়ে গেছে। ঝড়ের পর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীই সম্ভবতঃ প্রথম বলেছিলেন, নির্বাচন নয় আন্দোলন চাই, ওদের সঙ্গে আর থাকা চলবে না। ভাসানীর এ ঘোষণাও অবশ্য কেবল-মাত্র উচ্চারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লক্ষণীয় হল, সত্তরের নির্বাচনের আগে পাকিস্তান সরকার নির্বাচনবিধি এল. এফ. ও জারি করেন। আওয়ামী লীগ এজন্য ঈষৎ গুঞ্জন করলেও এটা মেনে নির্বাচন করে। কেননা ক্ষমতা বিভাজনের ইচ্ছা তাদের নিকট মোহের সৃষ্টি করেছিল। ভাসানী এ পর্যায়ে নির্বাচন বর্জনের ডাক দেন এবং ভাসানীর এ আহ্বানের মধ্যে আওয়ামী লীগ চক্রান্ত ও বিচ্ছিন্নতার বীজ লক্ষ্য করে। ঊনসত্তরের গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান না করার ব্যাপারে মাওলানা ভাসানীর বক্তব্যকে নিয়েও উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল। সত্তরের নির্বাচন বর্জন করলে কি পাওয়া যেত তা বিতর্কিত ব্যাপার, কি পাওয়া গেছে তাই এখানে লক্ষ্য। বাংলাদেশের সমাজদেহে একটি ভুঁইফোঁড় শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, মুক্তি-সৈনিকদের আত্মত্যাগের দ্বারা

অর্জিত স্বাধীনতাবৃক্ষে ফল জন্মেছে, পরিণত হয়ে পেকেছে, এদের প্রয়োজনে ভূমিতে পড়বার জন্যেই। মুক্তিযুদ্ধের পর ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরী ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বিভেদের বীজ রোপণ করেছে নিজেদের ইহলৌকিক ইচ্ছা পূরণের প্রয়োজনে। অন্যদিকে হত্যাকারীকে, অগ্নিসংযোগকারীকে, মানবতা বিরোধী অপরাধীকেও পালাবার জন্য আড়াল সৃষ্টি করেছে। আসলে এদের কোন জাতি নেই। মুক্তিসংগ্রামের ঘ্রাণ পেলে এরা মুখোশ পরে নেমেছে ভিয়েতনামে, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে। মুক্তি-যুদ্ধের বিজয় এদের ছিন্নমূল করে দেয় বাংলাদেশেও এর অন্যথা হয়নি। তাদের দুষ্কর্মের দায় বহুকালই বাংলাদেশকে বহন করতে হবে।

উনিশশো উনসত্তর–সত্তরের মধ্যেই শেখ মুজিবর রহমান এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব নিঃশেষিত হয়েছে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাদের শেষ হওয়াকে তারা মেনে নেয়নি নিতে চায়নি, স্বার্থের কোলাহলে নতুন দিনের নেতৃত্বকে বেড়ে উঠতে দেয়নি। স্বচ্ছন্দ জীবন প্রবাহের যে স্রোত অবরুদ্ধ হয়ে গেছিল সে অচলায়তনের দ্বার খুলে গেছে পঁচাত্তরে এসে। শেখ মুজিবের অবসান একটি ধারার পরিসমাপ্তি, বাংলাদেশের জন্য নতুন যাত্রারম্ভ। অনাগত দিনের রাজনীতিতে তা জীবনবোধের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্ভবতঃ তুলনীয়। বাংলার নবজাগরণের একজন অবিসংবাদী নেতা এবং সর্বোত্তম অপ্রদত্ত সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব তুলে দিয়ে আসলেন উগ্র ভারতীয়দের, পশ্চিমাদের হাতে। [illegible] উত্তেজনা তাকে নিঃশেষিত করে দিয়েছে জীবনের শেষ মধ্যাহ্নে এসেই। কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলে তার আর কিছুই ততদিনে করার ছিল না।

আর পূর্ব-বাংলার জনমানসের বিক্ষোভকে শেখ মুজিব রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করলেন, আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ তারই মাধ্যমে শোষক নতুন প্রভুর সঙ্গে অদৃশ্য বন্ধনরজ্জু সৃষ্টি হল। ডেনমার্কের রাজকুমারের মত তিনি পথ পাননি খুঁজে। সুরেন্দ্রনাথের তুলনায় শেখ মুজিবের ভূমিকা আরো অভিনব, বেদনাদায়ক। সুরেন্দ্রনাথ নিন্দিত হয়ে বেঁচেছিলেন, পরিবেশের প্রতি অসহায় নিয়ন্ত্রণহীনতা শেখ মুজিবের জীবনের করুণ পরি-সমাপ্তি ডেকে এনেছে। সুরেন্দ্রনাথকে রক্ষা করেছিল বৃটিশ, মানুষ তাকে ভোলবার চেষ্টা করেছিল। শেখ মুজিব নিজেই ভাগ্যকে নির্মাণ করেছিলেন,

জনগণকে ভুলতে দেননি। ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিলেন, যখন তার প্রয়োজন শেষ হয়েছে অনেক আগেই। শেখ মুজিবের দেশপ্রেমে, স্বজাতি-প্রেমে বোধ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সময়ের সঙ্কেতকে তিনি মানতে চাননি, বুঝতে চাননি, পারেননি। সুরেন্দ্রনাথকে মানুষ ভুলে গেছিল, তিনি বেঁচে ছিলেন বৃটিশের কৃপা নিয়ে। শেখ মুজিব কাউকে ভুলতে দেননি, তিনি জোর করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেষ্টা করেছিলেন বলেই মাটিতে ঝরে পড়তে হল। মানুষ তাকে ভুলতে চেষ্টা করেছে তাঁর মৃত্যুর পর।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে মুক্তির চৈতন্য অর্জিত হয়েছে শেখ মুজিবের পতনের মধ্যে তার অগ্রযাত্রার চিহ্ন বিদ্যমান। এ অগ্রযাত্রাকে প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচানো, অব্যাহত রাখার দায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্দোলনের প্রত্যয় নতুন ঔপনিবেশিক চক্র থেকে আত্মরক্ষার পিপাসা জাগ্রত করেছে। পঁচাত্তরের ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার বিজয়ও সেই একই লক্ষ্যে পরিচালিত।

ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, ভারতীয় ঐক্যের সামনে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় করে তুলে ধরেছে তা হল সমাজতন্ত্র, না জাতীয়তাবাদ? ঐক্যবদ্ধ ভারত না জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র? সম্ভব কিনা তা পার হয়ে এসেছে অনেক আগেই, এখন প্রশ্ন হল—কবে, কখন এবং কিভাবে?

বাংলা ভাষার তিনজন লেখক

আলমগীর জলীল

শিশু-সাহিত্যিক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮—১৯৪০)

মোহাম্মদ এয়াকুব আলীর সাহিত্য জীবন যেমন স্বল্পকালীন তেমনি তাঁর রচনার সংখ্যাও মাত্র চারখানা প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কিছু রচনা মাত্র। মাত্র ষোল বৎসর সংকীর্ণ সাহিত্য জীবনের পরিধিতে তিনি সাহিত্য বিষয়ক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও কিছু কিছু গল্প ও কবিতা লিখেছেন; তা'ছাড়া অনুবাদ ও সাহিত্য সমালোচনাও করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পীরূপে।

মাত্র একখানা শিশু পাঠোপযোগী সাহিত্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সেটা হ'ল রূপকথার ঢঙে সহজ সবল চিত্তাকর্ষক ক'রে ছেলেদের জন্যে তিনি লিখেন 'নূরনবী' (১৯১৮)। মাত্র একখানা গ্রন্থ নিয়ে এয়াকুব আলী শিশু-সাহিত্য রচনায় অবতীর্ণ হলেও তিনি মুসলিম শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। হজরতের জীবনী ছেলেদের জন্যে সমসাময়িক কালে আর একজন শিশু সাহিত্যিকও উপাদেয় ক'রে লিখেন। তিন হ'লেন খুলনার সাহিত্যিক সফিউদ্দীন আহমদ। তাঁর শিশু সাহিত্য হিসেবে রসোত্তীর্ণ গ্রন্থটি হলো "ছেলেদের হজরত মোহাম্মদ" (১৯১৮)। সফিউদ্দীন ছেলেদের জন্যে আরো ক'টি বই লিখে যশস্বী হয়েছিলেন কিন্তু এয়াকুব আলী মাত্র তাঁর 'নূর-নবী' রচনা ক'রেই অমর শিশু মনোরঞ্জক লেখকরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। 'শিশুসওগাত' নামক ছোটদের মাসিক পত্রিকায়ও এয়াকুব আলী তাঁর দু' একটি রচনা প্রকাশ করেন। কিন্তু বাংলা শিশু সাহিত্যে তাঁকে অমর ক'রে রেখেছে তাঁর 'নূরনবী'।

হজরত মোহাম্মদের সরল ও সুমিষ্ট জীবনচরিত এবং তাঁর সত্য প্রেম সেবা ও মহত্ত্বের মধুময় সত্য পরিচয় 'নূরনবী'তে বিদ্যমান। গল্পের মত সরস, রূপকথার মত মনোরম,—আনন্দ দানের ভিতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের পুস্তকস্বরূপ এটি লিখিত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তক সম্পর্কে বলেন, "'নূরনবী' পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার ভাষা সরল ও সুন্দর এবং ইহার বিষয় ও রচনা প্রণালী শিশু পাঠকদের পক্ষে মনোরম। এইরূপ সহজ বাংলা ভাষায় লেখা কঠিন কাজ, আপনি তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।" 'ঠাকুর মার ঝুলি' খ্যাত রূপকথাসম্রাট দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার লিখেছেন, "মহাপুরুষের জীবনী এইরূপ করিয়া লিখিতে পারিলে যে কাজ করিতে পারা যায় অন্যরূপে সেই প্রকার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা বড় অল্প। ইহাতে শিশুচিত্তের অভিজ্ঞতারই শুধু যে আপনি যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন বা মাতৃভাষার জন্য সুধাপানে আপনার সুন্দর সকল আকুলতা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়া—পরিবেশন করিয়া দিয়াছেন তাহাই নয়, পরমামৃত কথায় আপনার মন যে কতখানি মগ্ন তাহাও আপনার এই কাহিনীতে গোপন থাকে নাই। এইরূপ অধিকারী না হইলে এমন করিয়া এ কাজ করিবার সরসতা আর কাহার হইতে পারে? যেমন ছেলেদের তেমন সকল দেশবাসীরই মনে সংগীতের সুর কথায় মাখিয়া দিয়া আপনি বাংগালী অন্তরের অশেষ প্রীতির এবং ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। আপনার ভাষার ঝরনার সজীব ধারায় আপনার এই স্বপ্নের সত্যের গান—এই আনন্দ ও আলোর গান সত্যই মধুময় হইয়া সার্থক হইয়াছে।"

মোহাম্মদী বলেন, ". . . এই পুস্তক পাঠ করিলে, একদিকে বালকগণ সৎ সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ, কর্মপটু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কর্তব্য পালনে অটল হইবে অন্যদিকে ধর্মভীরু, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, নিয়ম পালনকারী হইয়া গুরুজনে ভক্তিশীল হইবে। এবং কালে তাহারা যথার্থ মানুষরূপে দেশের, ধর্মের, আত্মীয় স্বজনের কাজে লাগিতে পারিবে। পক্ষান্তরে আদর্শহীন অবস্থায় কেবল তোতা পাখীর ন্যায় স্কুলের বই মুখস্থ করিয়া সমাজে যে অকর্মণ্য উদ্দেশ্যহীন, অলস অক্ষম দলের সৃষ্টি হইতেছে, সে পথ প্রতিরুদ্ধ হইয়া আসিবে। বালকগণ ব্যতীত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।"

এতদ্ব্যতীত সুবিখ্যাত সমালোচক বংগবাসী কলেজের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, 'নবনূর' সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলী, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সুসাহিত্যিক ডাঃ লুৎফর রহমান, স্কুল ইনস্পেক্টর মৌঃ আবদুল করিম প্রমুখ মনীষীগণ এবং মাসিক 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'প্রবাসী', 'সওগাত', 'মোসলেম জগৎ', 'বংগীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', প্রভৃতি পত্র পত্রিকা 'নূরনবী'র ভূয়সী প্রশংসা করেন।

'নূরনবী' একাধারে ইতিহাস ও রূপকথা, নূতন ভঙ্গীতে লিখিত সহজ সরল সজীব ও উপাদেয় একখানা শিশুমনোরঞ্জনী জীবনী গ্রন্থ। তবু মনে হয় এটি গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধের একখানা সরস আলেখ্য। আনন্দ, আদর্শ, সৎজীবনের চিন্তার অপার ঐশ্বর্য-মণ্ডিত এ গ্রন্থ। ভাবে ও ভাষায় কোন কৃত্রিমতা নেই এতে- কষ্টকল্পনাও নেই এতটুকু। মধ্যে মধ্যে স্থানবিশেষে ব্যবহৃত অনুপ্রাসগুলি বেশ সংগত ও মাধুর্য্যবিশিষ্ট—পাঠে সুখকর বোধ হয়। রূপকথার ছলে মহাপুরুষের জীবন গাথা রচনা করে এয়াকুব আলী যেন "বেহেশ্‌তের মেওয়া" বিলিয়েছেন দুনিয়ায়। ছেলে বুড়ো সকলেই তাতে ধন্য মানবে।

রূপকথাধর্মী স্বপ্নময় আংগিক ব্যবহার করলেও লেখক মহানবী হজরতকে অতিমানুষরূপে আঁকেন নাই। আদর্শ মানুষ রূপেই তিনি তাঁকে আমাদের নয়ন সম্মুখে তুলে ধরেছেন। সেকালে মুসলমান জাতীয়তার ভিত্তি গঠনে সহায়ক হয়েছিল 'নূরনবী'। এদিক দিয়েও এই গ্রন্থ বাংলা শিশু-সাহিত্যে নূতন এক দিগোন্মোচন করেছিল।

শিশুশিক্ষক এয়াকুব আলী চৌধুরী ছোটদের মনের সূক্ষ্ম দিকগুলো সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। চিরশিশুর ভাল লাগা মন্দ লাগা, তাদের খেলা, হাসি খুশি, মজা-কৌতুকের সংগে সংগে যুগপৎ সৎ জীবন গঠন, সৎপথে পরিচালনা, সদাদর্শে দীক্ষা দানই তাঁর মনোবাঞ্ছা ছিল। এবং এসব ব্যাপারে এয়াকুব আলী সফলকাম দরদী শিশুসাথী। কাব্যের উচ্ছ্বাস ছন্দ লালিত্য যেমন গদ্যের গতিময় বেগের সঞ্চার ক'রে একে শিশুদের আকর্ষণীয় বস্তুরূপে তিনি তৈরী করেন। শব্দ চয়ন, বাক্যগ্রন্থনা, রচনাশৈলী প্রভৃতি দিকগুলিতে সুদক্ষ কারুশিল্পির মত লেখক 'নূরনবী' গঠন করেন। একটি মহাপুরুষের

নীরস দার্শনিক জীবন ব্যাখ্যায় এমন প্রাণময়তা সরসতা ও ভক্তিময়তার রূপ কুশলী লেখক ব্যতীত আর কেউ দিতে পারেন না। গল্প যেন ছন্দে দোলায়িত, ছন্দ যেন গল্পে রূপায়িত।

'নূরনবী'র নামপৃষ্ঠার পরের পাতায় লিখিত আছে,

মানুষের চেয়ে মানুষ বড়—
সবার বড় মানুষ সে।
মানুষ হইবে কেমন মানুষ—
সকল মানুষে শিখাল সে।

'বিষয়সূচী'তে আছে:

আঁধারপুরী, নূতন তারা, সোনার চাঁদ, মাথার দাম, গুণের নিধি, হারান মানিক, আলোর খেলা, মায়ার ফাঁদ, চাঁদ সূর্যের কথা, অত্যাচারের আগুন, পাহাড়ে বন্দী, পাথরবৃষ্টি, আঁধারে আলো, সত্যের বল, প্রেমের জয়, ব্যথার ব্যথী, কাজের গরব, পরশপাথর।

উপরোক্ত আঠারোটি পরিচ্ছেদের নামগুলি পড়েই বালক বালিকারা এই গ্রন্থ পাঠে আগ্রহশীল না হয়েই পারে না। সুতরাং শব্দ চয়ন এবং গল্পরস সিঞ্চনে এই লেখক ছিলেন পাকা জহুরী। 'বিষয়সূচী'র আমুদে ডুগডুগিটা বাজিয়ে প্রথম আসর জমিয়ে নিয়েছেন, তারপর ধীরে ধীরে সুদক্ষ বাজিকরের মত বিচিত্র খেলার অপার আনন্দময় জগৎ এবে একে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন শিশু পাঠকের নিকট।

রচনার কিছু নিদর্শন

(ক) "সে অনেক দিনের কথা, তেরশ' বছর, কি তারও আগে,—সেই সাত সমুদ্র পার, তের নদীর ধার, সেই সোনা হীরার গাছ, আর মুক্তা মনির ফুল, সবই তখন ভুল।

তখন না ছিল ফুলে ফুলে পরীর মেলা, আর না ছিল সব দেশে দেশে রাজপুত্রের খেলা।

সে ছিল এক আঁধারের যুগ।

আঁধারে জগৎ জোড়া। আঁধারে আঁধার,—

পাপের আঁধার। আঁধারে মানুষ।

হাজার যুগের আঁধার বুকে, আঁধারেই দিন কাটে। মানুষ গিয়াছিল ভুলে। ভুল না ভুল, না ভুলের নাই মূল। আল্লাতালার কথা, তাই মানুষের ভুল। না কেউ আল্লাহ মানিত, না তাঁর নামাজ পড়িত। লোকের না ছিল ধর্ম্ম, না ছিল জ্ঞান। মানুষ পূজে, কি পুতুল পূজে, গাছেরই সেজদা করে না পাথ-রেই মাথা রাখে, তার কিছুই ঠিক ছিল না। এর উপর ছিল পাপ,—কত রকম পাপ,—দারুণ পাপের তাপ।"

খ) "ফুলের গন্ধে বাতাস মাতে; গুণের গন্ধে মানুষ ছুটে; নবীর গুণে সকল মানুষ পাগল হইল।

নূরনবী গরীব, সে কথাত কেউ ভাবিত না। সবাই দেখিত তাঁর গুণ। কি মধুর তাঁর চালচলন, আর কি মিষ্টি তাঁর কথা। মুখে যেন মধু লাগিয়াই আছে আর তাঁর গড়নই বা কি!—যেন আকাশের চাঁদ। চব্বিশ বছরের যুবক, সোনার কান্তি সকল অংগে ভরা। যখন রাস্তা দিয়া যান, যেন স্বর্গের আলো উথলিয়া যায়।

নবী ভাল কথা বলেন, আর কাজ করিয়া যান।

এখন সেই যে খোদেজা রানী—তাঁর তখন চল্লিশ বছর বয়স। তিনি ছিলেন ভারি ধাম্মিকা মেয়ে। নবীর সংগে তাঁর বিয়ে হইল।.."

(গ) "তখন পুণ্যের নদী বহিল—
প্রেমের বান ডাকিল—
জ্ঞানের আলো জ্বলিল

আলো জ্বলিল,—জ্বলিল ত জ্বলিল,—ধর্ম্মের জ্যোতি দেশ হইতে দেশে জ্বলিল। তখন সেই মরুর মাটি মণির মালা হইল। আরব দেশে হাজার মণির মালা দুলিল,—হাজার সোনার মানুষ জাগিল।

মানুষের মংগল

তখন নবীর কাজ ফুরাইল। তেষট্টি বছর বয়স,—তখন তিনি পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন।

কোথায় গেলেন নূরের নবী—
কোন্ সে স্বরগ পুর?
হাজার ফুলের হাসি ঝরে,
চমকে সেথা নূর।
ঝলে রবি — সোনার ছবি —
দ্বিগুণ কিরণ দান,
মুক্তা-মণি-হীরার গাছে
অযুত পাখীর গান।
আলোর নবী চলে গেছেন —
আলোকমালার দেশে।
সেই দেশেতে যাবে যদি
নেচে হেসে হেসে
গুণের খনি, পরশমণি—
নবীর কথা ধর
সোনা হ'বে, রাজা হ'বে,
রাজার চেয়ে বড়।"

এই বলে লেখক গ্রন্থ শেষ করেছেন। সমস্ত বইখানিই উদ্ধৃত করবার প্রলোভন জাগে।. . . .

'নূরনবী'র মাঝে মাঝে অনেক কবিতা ও কবিত্বময় বাক্যরাশি সুষমা বিস্তার করেছে। ফেনিলোচ্ছল মাদকতাময়ী ভাষা কবিপ্রাণের অধিকারী এয়াকুব আলীর শিশুপাঠকও 'নূরনবী'র সান্নিধ্যে গিয়ে কবি-আত্মা পায়। বাংলার প্রচলিত লোক-গল্পের রূপকথাগুলি পর্যন্ত এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নূরনবী'র কাছে হার মানা হার গলায় পরতে বাধ্য। যদিও প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ বাবুর (১৮৭১—১৯৫১) এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)-এর প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই।

শিশু-সাহিত্যিক শামসুননাহার মাহমুদ
(১৯০৮-১৯৬৪)

নানা প্রতিকূল অবস্থার সংগে সংগ্রাম ক'রে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ লেখাপড়া শিখেন এবং উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। যে কালে অভিজাত মুসলমান পরিবারে বাংলা লেখাপড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল সেকালে বেগম রোকেয়া, নিজ ভ্রাতা হবীবুল্লাহ বাহার ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের উৎসাহে এই মহীয়সী মহিলা শিক্ষার উচ্চাসনে আরোহণ করেন এবং মুসলমান সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার দূরীকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

শামসুন নাহার ছিলেন একজন সমাজকর্মী। মুসলমান সমাজের নানা প্রকার অবিচার ও অসংগতি দেখে তিনি দেশহিতৈষণা ও সমাজকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হন। পারিবারিক জীবনের সংগে সংগে সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন আমরণ। এর মধ্যে তিনি সাহিত্য সাধনাও করেন। দীর্ঘকাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ফলশ্রুতি বাংলা সাহিত্যের চর্চা। নারীজীবনের নানা সমস্যা, মুসলমান মেয়েদের প্রতি অবিচার, দেশ ও জাতির নানাবিধ জটিল প্রশ্ন সমাধানকল্পে তিনি মন ও শরীর দিয়ে যেমন তেমনি লেখনী সহযোগে সংগ্রাম করে গেছেন আজীবন।

বড়দের জন্য ভ্রমণ কাহিনী, সমস্যামূলক নানা প্রবন্ধ, মহীয়সী নারী জীবনী, সমাজসেবামূলক বিদগ্ধ নিবন্ধ রচনা ছাড়াও তিনি শিশু-কিশোরদের উপযোগী পাঠ্যগ্রন্থ, গল্পের বই রচনা করেছেন। নিজে শিক্ষক ছিলেন, তাই পাঠ্যপুস্তক রচনার কৌশল তাঁর জানা ছিল; ইসলামের ইতিহাস, নীতিমূলক গল্প কাহিনী, আদর্শ জীবনচরিত এবং আনন্দমূলক অন্যান্য বিষয় নিয়ে তিনি শিশুতোষ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেছেন। শিশুদের শিক্ষা যা'তে মনোবিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে চলতে পারে, সে জন্যে তিনি শিশুর অভিভাবকদের পঠনোপযোগী 'শিশুর শিক্ষা' লিখেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান শিশুকল্যাণ পরিষদের সভানেত্রী ছিলেন অনেকদিন। 'সাধনা', 'আন্নেসা' পত্রিকায় শৈশব থেকেই কিছু কিছু লিখতে থাকেন। 'ছেলেবেলার ব্যর্থ সাধন', গ্রন্থখানি তিনি ছোটকালের জীবনস্মৃতিস্বরূপ লিখেন। যতদূর জানা যায় (১৯২০খৃঃ) বার তের বৎসর বয়সে ডঃ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'আঙুর' শিশু-মাসিকে তাঁর 'প্রণতি' নামক কবিতাটিই ছাপার অক্ষরে প্রথম রচনা।

'প্রণতি'র ক'টি লাইন :

প্রভাত বেলা
মৃদুল বায়
যাঁর করুণা ঘোষে,
সবে মিলে
লুটাব শির
আজি তাঁর উদ্দেশে।...

বেগম শামসুন নাহার রচিত শিশু-সাহিত্য রচনাগুলির মধ্যে আমরা পাই :

মক্তব বর্ণ পরিচয় (স্কুল পাঠ্য)
আদর্শ বর্ণ পরিচয় (ঐ)
সহজ পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ)। (ঐ)
বিচিত্র পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ) (ঐ)
তাজমহল পাঠ (১-৪ ভাগ) (ঐ)
তাজমহল ভারত ইতিহাস (ঐ)
কিশোর সাথী (১৯৩৫, মুহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার-এর সহযোগে লিখিত ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য)
ফুল বাগিচা (গল্প, ১৯৩৫, ২য় সং ১৯৩৭)

নানা পত্র পত্রিকায়, এ ছাড়া তাঁর কিছু শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি ছড়িয়ে আছে। কবি গোলাম মোস্তফা প্রণীত 'ইসলামী নীতিকথা' নামক স্কুলের উপপাঠ্য গল্প-পুস্তকে তাঁর কিছু লেখা দেখতে পাওয়া যায়। 'ফুল বাগিচা' বাংলা-দেশের মক্তব ও প্রাইমারী স্কুলের মুসলমান ছাত্রগণের অতিরিক্ত পাঠ্য গল্পের বইরূপে অনুমোদিত। 'সূচীপত্র' থেকে জানা যায় এতে আছে : খলিফার ফরমান, টাকার হিসাব, তরমুজের মূল্য, সত্যরক্ষা, উচিত বিচার, আন্দালুসের শেখ, দুষমন, বীর নারী, ইসলামের সন্তান, কে বাদশা, রাখাল রাজা, সাবাস! সাবাস! প্রতীক্ষায়, যথার্থ আতিথেয়তা, অদ্ভুত ঘুম, সত্যকার ত্যাগ, কাজীর বুদ্ধি, নূতন কথা।

'ফুল বাগিচা' গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাস থেকে নীতিমূলক কাহিনী, চিত্তাকর্ষক গল্পের মাধ্যমে ছেলেদের উপযোগী ক'রে পরিবেশিত হয়েছে। ভাষা সাধু,

মার্জিত, সহজ, স্বচ্ছন্দ ও আকর্ষণীয়। তবে পাঠ্য বই-এর গন্ধ পাওয়া যায়।

ভাষার নমুনা

"মুসলমানদের তখন দুনিয়া জোড়া রাজ্য। বনি উম্মিয়া বংশেব খলিফারা করেন রাজত্ব। ইহাদের আমলে মুসলমানেরা লড়াই করিয়া অনেক নূতন দেশ জয় করিয়াছিলেন।

এই সময়কার একজন সিপাহী—তাঁহার নাম আব্দুর রহমান ফারুক। মুসলমান সৈন্যরা যখন খোরাসান প্রদেশ দখল কবিতে গেল, আবদুর রহমান ফারুকও গেলেন তাঁদের সংগে সংগে। বাড়ী হইতে যুদ্ধে যাইবার সময় তিনি স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া বলিলেন—তুমি কাঁদিও না, খোদার মরজি হইলে আমি সত্বরই ফিরিয়া আসিব।"

('টাকার হিসাব'—"ফুল বাগিচা")

"বাদশা হারুন-অর-রশীদ শিকারে চলিয়াছেন। কত সিপাহী সৈন্য, কত লোকজন তাঁহার সংগে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তাঁহারা আসিয়া পড়িয়াছেন এক বনের ধারে। এমন সময় হইল কি, আকাশের এক কোণে ছোট টুকরা মেঘ জমিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সেই মেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেল। ঝমঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। আর সংগে সংগে শুরু হইল পাগল হাওয়ার মাতামাতি।

সেই ভীষণ দুর্যোগে বাদশার লোকজন যে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল কে বলিবে। নিবিড় বন। চারিদিকে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। একটা গাছের তলায় বাদশাহ দাঁড়াইয়া একা। সর্বাঙ্গ হইতে জল ঝরিতেছে, পোশাক পরিচ্ছদ সব ছিন্নভিন্ন।"

('কে বাদশা'—"ফুল বাগিচা")

"ধনীর দুহিতা হইয়াও রহিমা পতিসেবার্থে বনবাসিনী হইয়াছিলেন, পথের কাংগালিনী সাজিয়াছিলেন; পতির জন্য স্বর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন ধৈর্য্য, এমন একাগ্রতা, এমন কষ্টসহিষ্ণুতা ও পতিপ্রাণতা আমরা আর কোনও নারীজীবনে দেখতে পাই না। তাঁহার সতীত্বও অতুলনীয়। তিনি অপরিচিত

প্রদেশে সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষকাল পূতচরিত্রে পথে পথে বিচরণ করিয়াছিলেন, ইহা সামান্য চরিত্রবলের কাজ নহে। বাস্তবিকই রহিমা আদর্শ সতী।"

('বিবি রহিমা'—"ইসলামী নীতিকথা")

"রাবিয়া সকল কার্যে আল্লাহতালার উপরই নির্ভর করিতেন। যে কোনও দুঃখকে তিনি প্রসন্নচিত্তে আল্লাহতালার স্নেহের দান বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তিনি অতিশয় দীনভাবে জীবন যাপন করিতেন। ইচ্ছা করিলেই তিনি সুখ-সম্ভোগে দিন কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কথিত আছে খর্জ্জুর খোর্মা-আভরণা আরব ভূমিতে বাস করিয়াও তিনি কখনও খোর্মা খান নাই। কারণ, তিনি মনে করিতেন, "আমি নগণ্যা দাসী মাত্র। দয়াময়ের অপার দয়ায় আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সীমা নাই। আমি আবার ভুরি-ভোজন করিয়া রসনা তৃপ্তি করিব কোন্ সাহসে?"

('তাপসী রাবিয়া'—"ইসলামী নীতিকথা")

বেগম শামসুন নাহার বিভিন্ন সময় প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সাম্যবাদী, সওগাত, নওরোজ, মাসিক মোহাম্মদী, আজাদ, বেগম, মাহেনও প্রভৃতি পত্রিকায় শিশু-সাহিত্য ও শিশুমনের নানা প্রসংগ নিয়ে প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখেছেন। 'বংগীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র বিভিন্ন অধিবেশনে 'শিশু-সাহিত্য শাখা'র তিনি সভানেত্রীত্ব করেন। শিশুদের সাহিত্য কী রূপ হওয়া উচিত, এর বিষয়, বৈচিত্র্য ভাষা, বাণীভংগী, রচনাশৈলী ইত্যাদি জটিল তত্ত্বের তিনি বিভিন্ন রচনায় ব্যাখ্যা করেছেন। শিশু-সাহিত্যের আলোকে শিশু-চরিত্র শিশুমনের সহযোগে শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে স্বাগতম জানিয়েছেন। বেগম শামসুন নাহারের ছিল রাজনৈতিক বা সামাজিক মনের অন্তরালে একটি মমতাময়ী শিশু-মন।

শিশু-সাহিত্যিক গোলাম রহমান (১৯৩১-১৯৭২)

বাংলা একাডেমী কর্তৃক শিশু-সাহিত্যের পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক গোলাম রহমান ছোটদের জন্য হাস্য-কৌতুকময় রংগ ব্যাংগসর্বস্ব শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি করেন। বাংলা সাহিত্যে শিবরাম চক্রবর্তীর পথানুসরণ করে হাস্য রসিক

গোলাম রহমান হাসিঠাট্টার মাধ্যমে অনাবিল আনন্দরসের যোগান দিয়েছেন শিশু ও কিশোর জগতে। ব্যক্তিগত বা জাতিগত ও সমাজগত চরিত্রের নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি, অসংগতি নিয়ে বড়দের জন্যে যেমন, তেমনি ছোটদের হাস্যরস সৃষ্টি করেছিলেন গোলাম রহমান। গল্প, উপন্যাস, নাটিকার মাধ্যমে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাত হেনে তিনি ছেলেদের প্রচুর হাসিয়েছেন। কৌতুক-পূর্ণ কথার মালা সাজিয়ে, চলতি ভাষায় ঝরঝরে আটপৌরে ভংগিতে রস-রচনা লিখেছেন তিনি অনেক। সাংবাদিকতার কারণে বোধ করি তাঁর ভাষায় আড়ষ্টতা বা জড়তা নেই। ইংরেজী বা অন্য বিদেশী ভাষার শব্দা-বলীর যথার্থ প্রয়োগ গোলাম রহমানের সৃষ্ট শিশুসাহিত্যকে অধিকতর গতি-ময় ও বাস্তবানুগ হ'তে সাহায্য করেছে। মন ও মেজাজচঞ্চল এই লেখক অত্যন্ত দ্রুত বর্ণনভংগি সহযোগে ছোটদের অনেক চল-চঞ্চল গতিমুখী করেছেন।

কিন্তু সমাজ জাতি বা ব্যক্তির দুর্বলতা নিয়ে মূলতঃ লেখনী ধারণ করলেও পরিশেষে বিদ্রূপের রং মুছে গিয়ে নিরেট আনন্দ, হাসি-ঠাট্টার মৃদু গুঞ্জনের হালকা হাওয়ায় তাঁর শিশুতোষ রচনাবলী সম্পাদিত হয়েছে প্রায়শঃ। ·

নিজে একজন পুস্তক প্রকাশকরূপে ব্যবসায়ী সাফল্যের কথা চিন্তা ক'রে হয়তো বা বিশ্বসাহিত্যের নানা মূল্যবান সম্ভার বাংলা ভাষায় ছেলেদের উপ-যোগী ক'রে পরিবেশন করেছেন এই লেখক। আবার বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ক'টি গ্রন্থের কিশোর সংস্করণ রচনাকারী রূপেও তাঁকে দেখি। পৃথিবীর নানা দেশের রূপকথাগুলি তিনি সহজ সরল মধুর ক'রে বাংলা ভাষা-ভাষী ছেলেমেয়েদের কাছে পরিবেশনের ব্রত নিয়েছিলেন।

সামান্য একটি ঘটনা কী ছোট একটি শব্দ কিংবা কোন ব্যঞ্জনাধীন কাহিনী গোলাম রহমান ফেনিয়ে ফাপিয়ে সুন্দর মুখরোচক হাসির গল্পের রূপ দিতে পারেন অনায়াসে। কোন বড় দর্শন নেই, কোন বিশাল ভাবের ব্যাদন নেই— তাঁর সৃষ্ট শিশুতোষ রচনাবলী নির্জলা আমোদ কৌতুক মেশানো টক-মিষ্টি-ঝালের চাটনি সদৃশ। সচ্ছ স্পষ্ট জটিলতাহীন ভাষা ও প্রত্যক্ষ বর্ণনার গুণে এই সৃষ্টি অধিকতর ফলপ্রসূ হয়েছে। বাগ্বিধির অজস্র যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার তাঁর এই জাতীয় রচনাকে শিশু-মনোজগতের সিংহদ্বারে অতি সহজেই আঘাত হানতে সহায়তা করেছে। গোলাম রহমানের রচিত অনেক শিশু সাহিত্য-সম্ভার

প্রকাশের আলোয় প্রদীপ্ত না হতে পারায় তাঁর শিশুপাঠ্য রচনা সম্পর্কে এর অধিক বেশী কিছু বলা সমীচীন হবে না।

গোলাম রহমান রচিত ও প্রকাশিত শিশু-সাহিত্যের গ্রন্থ

রকমফের (১৯৫৩)	রুশ দেশের রূপকথা (১৯৬১)
বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি (১৯৫৬)	আলালের ঘরের দুলাল (১৯৬১)
আজব দেশে এলিস (১৯৫৭)	ঈশপের গল্প (১৯৬৬)
বুদ্ধির ঢেঁকি (১৯৫৮)	মুসলিম জাহানের রূপকাহিনী (১৯৭১?)
পানুর পাঠাগার (১৯৫৯)	আগাম টিকেট কাটতে চাই (হাসির নাটিকা)
জ্যান্ত ছবির ভোজবাজী (১৯৬০)	রঙিন সকাল (শিশু উপন্যাস)
চকমকি (১৯৬১)	ভয়াল রাতের অন্ধকারে (ঐ)

বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, গোলাম রহমান নিম্নলিখিত গ্রন্থ ক'টিও রচনা করেছিলেন :

মহাচীনের রূপকথা	আমেরিকার রূপকথা
কোরিয়ার রূপকথা	পাকিস্তানের রূপকথা
জাপানের রূপকথা	আয়নার দেশে (শিশু উপন্যাস)
মিশরের রূপকথা	

এতদ্ব্যতীত তাঁর অজস্র প্রবন্ধ, গল্প, জীবনী ছড়িয়ে আছে শিশু সওগাত, গুল-বাগিচা, মৌচাক, আজাদ (মুকুলের মহফিল), ইত্তেহাদ (মিতালি মজলিস), নবযুগ (আগুনের ফুল্‌কি), বাংগালী (কচি সংসদ), গুলিস্তা, ইনসাফ (ছোটদের বিভাগ), সংবাদ (খেলাঘর), ইত্তেফাক (কচি-কাঁচার আসর), পূর্বদেশ (চাঁদের হাট), পাক জমহুরিয়াত (ছোটদের বিভাগ), পাকিস্তানী খবর (ছোটদের বিভাগ), এলান, হুল্লোড়, সবুজ পাতা, রঙধনু, আলাপনী, মধুমেলা (স্বীয় সম্পাদিত ও পরিচালিত), কলকণ্ঠ, নবারুণ, পুবালী ফসল (সংকলন), সপ্ত-ডিঙা (ঐ), ময়ূরপংখী (ঐ), ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। সুতরাং পুস্তকাকারে তাঁর রচনা প্রকাশিত হ'লে গোলাম রহমানের শিশু সাহিত্য সংখ্যায় দাঁড়াবে অনেক। এখানে বলা প্রয়োজন, বড়দের চেয়ে তিনি অনেক বেশী লিখেছেন ছোটদের সাহিত্য। বস্তুতঃ গোলাম রহমান ছিলেন মূলতঃ খাঁটি

রস রচয়িতা একজন শিশু সাহিত্যিক। তাঁর সৃষ্টির প্রাচুর্য্য ও উৎকর্ষ উভয় দিয়েই এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হ'তে পারে।

শিশু সাহিত্যিক গোলাম রহমান ছিলেন আলোর অভিসারী, রঙিন সকাল প্রত্যাশী মানবতাবাদী লেখক। সত্যসন্ধ এই শিশু-সাহিত্যিক অন্যায়, দুর্নীতি ও অনাচার অধর্ম দেখলেই আঁৎকে উঠতেন। তাঁর জীবনদর্শনও ছিল এই। জীবনের সুষমাহীন অকল্যাণ দেখলেই কটাক্ষ করতে ছাড়তেন না। মানবতা বিপদগ্রস্ত হ'লে ক্ষমাহীন বিদ্রূপের শানিত চাবুক হেনে প্রতিশোধ নিতেন। আনন্দোজ্জ্বল সুন্দর পরমায়ুই ছিল গোলাম রহমানের কাম্য।

শিশু সাহিত্যিক গোলাম রহমানের রচনাদির পরিচয়

রকমফের (প্রথম রচনা—হাসির গল্প) কবি নজরুলের নামে উৎসর্গিত। এতে আছে ম্যাগাজিনের দফারফা, চেংগিজ খাঁর পলায়ন, কাহিনী নয়, আক্কেল গুড়ুম, মালেকের ফন্দী, বরাত আলীর ভাঙ্গা বরাত, বুলুর বিজ্ঞান শিক্ষা, চোট হওয়ার বিপদ।

বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি (হাসির গল্প, সংকলন, পুনঃ মুদ্রণ, ১৯৫৭)

সূচী—বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি, কবিতা লেখার ঝক্কি সামলাও, কোলকাতা এবং পিন্টু, গুণের আদর, উদোর পিণ্ডি, বন্ধ করো গানের গুঁতো, ডাকনাম নাম নয়, আঁক জিনিসটা সোজা নয়।

'বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি' সম্পর্কে আজাদ, ইত্তেহাদ, মিল্লাত, ইত্তেফাক, রেডিও পাকিস্তান, খেলাঘর প্রভৃতি পত্র পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠান প্রশংসায় মুখর। লেখকের ভাষা, বর্ণনভংগি, হাস্যরস সৃষ্টির কৌশল, সৃষ্টিবৈশিষ্ট্য, কৌতুক বোধ, ছেলেদের নিকট আকর্ষণীয়তা সম্বন্ধে প্রশংসা করেছেন সবাই।

আজব দেশে এলিস (শিশু উপন্যাস)

দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এর "ভাই বোনের আসরে" এটি প্রথমে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বই পড়ার আগে' লেখক জানিয়েছেন, " 'আজব দেশে এলিস' হচ্ছে লুইস ক্যারলের লেখা 'এলিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড'-এরই কাহিনী হুবহু বাংলা অনুবাদ নয়। হুবুহু অনুবাদ নাকি ছেলেদের কাছে

ধাঁধা হেয়ালীর মতো মনে হবে। অনেক জায়গায় "খটমট লাগা" এবং হোঁচট খাওয়া বিচিত্র নয়। মূল বইটির সংগে সম্পূর্ণরূপে মিল এবং ছেলে-দের উপযোগী করে সহজ ভাষায় লেখা এটি।

বুদ্ধির ঢেঁকি (হাসির গল্প সংকলন, ২য় মুদ্রণ, ১৯৬২)

সূচী—বুদ্ধির ঢেঁকি, দৈনিক সন্দেশ, কাব্যরোগের ক্লাশ, পথের সন্ধান, পরিবর্তন আবুলের কাণ্ড, দুই আর দুই, প্রতিবেশী, হট্টগোল (নাটিকা)

পানুর পাঠাগার (হাসির গল্প, সংকলন)

সূচী—পানুর পাঠাগার, প্রীতি ভাজনেষু, গল্প লেখার ইতিকথা, নামজাদা দুই বন্ধু, জীবনমৃত্যু, পায়ের ভৃত্য, আচ্ছাই ফ্যাসাদ। গল্প লেখার গল্প, রেডিও প্রোগ্রাম।

জ্যান্ত ছবির ভোজবাজি (রূপকথা)
চকমকি (হাসির গল্প সংকলন)
রুশদেশের রূপকথা (রূপকথা)

সূচী—বাজি ধরে হারজিৎ, বড়বোন ছোট ভাই, দুনিয়াতে আহম্মকের কমতি নেই, ঘোড়ার বাচচা নয় গাড়ীর বাচচা, মহাবীর নিকিতার লড়াই, সোনালী কেশর ঘোড়সওয়ার, দু'রকমের দুটো গল্প, আতশ পাখীর সন্ধানে। 'রুশদেশের রূপকথা'র প্রথমে 'যে কথা হয়নি বলা' নামক অংশে লেখক বলেছেন:

"'রুশদেশের রূপকথা'র কাহিনী বলতে গিয়ে এই কথা আমার বারবার মনে হয়েছে। 'রুশদেশের রূপকথায় মানুষের সংগে মানুষের ও পশুপাখিদের খুব অন্তরংগতা দেখা যায়--কিন্তু তাদের দেশের দৈত্য দানবদের বুদ্ধি সুদ্ধি বেশ কিছু মোটা এবং তারা একটু ভীতু প্রকৃতির। বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের চেনা দৈত্য দানবদের চেয়ে তাদের হাঁকডাক বেশ কিছু কম।.."

আলালের ঘরের দুলাল। প্যারী চাঁদ মিত্র (টেক চাঁদ ঠাকুর) রচিত উপন্যাস কিশোর সংস্করণ।

ঈসপের গল্প। ইংরেজী Aesop's Fables এর অনুবাদ ও ছায়াবলম্বনে লিখিত 'মুসলিম জাহানের রূপকাহিনী।' লেখকের মৃত্যুর আগে প্রকাশিত সর্বশেষ

গ্রন্থ। পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, আরব— এই ক'টি দেশের রূপকথা অবলম্বনে লিখিত।

সূচী—অগিরং নামা, আবু নওয়াসের গল্প, দরবেশ ও খলিফা, হাতেম তায়ীর মহত্ত্ব, গাধার ছায়া, খলিফার প্রত্যাবর্তন, বিনা বেতনের চাকুরী, যে গল্পের শেষ নেই, ধনী ও দরিদ্রের গল্প, এক পয়সার বিয়ে।

শিশু-সাহিত্যিক গোলাম রহমানের রচনার নিদর্শন

"পণ্ডিত মশাই নস্যির ডিবে থেকে এক টিপ নস্যি নাকের দুই কোটরে পুরে সোঁ সোঁ করে মগজে টানলেন। তারপর বার দুই গলা খাঁকারি দিয়ে হেঁকে উঠলেন: ও চৈচু, ওটা লিখছেন কি?

পণ্ডিত মশাই নিজের সুবিধার জন্যে ছেলেদের আসল নাম পালটে ছোট ছোট নাম রেখেছেন। যেমন খোন্দকার আবদুল হাকিমকে বিটকেল, হাওলাদার আলী মোল্লাকে পটলা, গাজী নাসির উদ্দীনকে ফচকে ইত্যাদি পণ্ডিত মশাইয়ের কথায় আমাদের হুঁস হলো। সে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে: জি, পণ্ডিত মশাই?

: বলি করছো কি?

: জি পণ্ডিত মশাই—হেড মাস্টার সাহেবকে এ বছর থেকে আমাদের স্কুলের একটা ম্যাগাজিন বের করতে বলা হয়েছিলো। তা উনি রাজীই হলেন না। বলেছেন খরচ বেশী—আপাততঃ স্থগিত থাকুক।

ওই যে স্যার রচনা বইয়ে আছে 'নান'মন তৈল হবে, না রাধা নাচবে'—সেই কথাই দাঁড়িয়েছে আমাদের। কবে জিনিসপত্তরের দাম সস্তা হবে আর কবে ম্যাগাজিন বেরুবে। তাই—

: তাই কি?—পণ্ডিত মশাই একটু রাগান্বিত স্বরে বলে ওঠেন: অত ভূমিকা করবার দরকার কি? সোজাই বলো না।—"

(বকমফের)

বুড়ীর কথা মতো আইভান গরম পানীতে গোসল করে এলো। বুড়ী তাকে ভালো ভালো খাবার খেতে দিলে, তার জন্য চমৎকার বিছানা পেতে

দিলে। আইভান খুব তৃপ্তির সাথে খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়লো।

বুড়ী তার কাছে এসে জিজ্ঞেসা করলেঃ নাতী, এখন বলো দেখি—কোন্ দিকে তুমি বেরিয়েছো, তুমি কি নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসেছো? না কারু কু-মতলব তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে?

আইভান বললেঃ মহামান্য জার আমাকে পাঠিয়েছেন তার জন্যে স্বয়ংচালিত বাদ্য, নৃত্যরতা হাঁস আর কৌতুক হাসি বিড়াল এনে দিতে। ওগুলো কোথায় পাবো নানী, একবার যদি বলে দাও তাহ'লে খুবই উপকার হয়।"

(রুশ দেশের রূপকথা)

"পানু আপনি আজ সকালে আসতে বলেছিলেন তাই আপনার কাছেই যাচ্ছি-লাম আমরা।

মিন্টু। টাকা দশটা দিয়ে দিন চাচা। আপনার ডোনেশনের রসিদ তো কবেই লিখে রেখেছি। (রসিদ বই ছিঁড়ে রসিদ প্রদান)

মোক্তার। ওরে বাপরে! করছো কি—দশ টাকা ডোনেশন আমার নামে লিখেছো? তা কি কখনো হয়? গরীব ছাপোষা লেখক আমি। মোক্তারী করে আর কয় পয়সা পাই? তোমরা বরং আনা চারেক পয়সা নিয়ে আমার নামে একটা রসিদ কেটে দাও। (ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করলেন)

মিন্টু। (স্বগত) এই মোক্তারটা কত বড়ো বদমাইস দেখো! আজ তিনদিন থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চার আনা পয়সা ডোনেশন দিচ্ছে! (জোর গলায়) এটা কি বলছেন আপনি চাচাজান। শহরে আপনার চার-পাঁচখানা বাড়ী রয়েছে। তা'ছাড়া পাড়ার গণ্যমান্য লেখক আপনি। চার আনা পয়সা ডোনেশন দিয়েছেন শুনলে লোকে হাসবে।"

("হট্টগোল"—বুদ্ধির ঢেঁকি)

"সে তখন বললেঃ জাহাপনা, আমি এক্ষুণি যন্তরী দেখে আসছি। তাতে দেখলাম যে, আজকের এই মুহূর্তে যে ফাঁসীতে যাবে সে সংগে সংগে বেহেশ্তে গিয়ে হাজির হবে। তাকে আর কোনো কষ্ট করতে হবে না।

কাজেই আর দেরী করবেন না জাঁহাপনা আমাকে অবিলম্বে ফাঁসী দিন। বেশী দেরী হয়ে গেলে আর বেহেশ্‌তে যেতে পারবো না।

রোগা বন্ধুর মুখ থেকে এই কথা শুনে উপস্থিত বাদশার আমীর ওমরাহোরা ফাঁসী যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সকলেই বলতে লাগলো : আমাকে ফাঁসী দিন জাঁহাপনা, আমাকে ফাঁসী দিন।

ব্যাপার দেখে বাদশার তো চক্ষু চড়কগাছ। তিনি বলে উঠলেন : কি এত বড়ো কথা। আমি উপস্থিত থাকতে তোমরা ফাঁসীতে যাবে। তা হ'তেই পারে না। আমি এই মুল্লুকের বাদশা। যদি বেহেশ্‌তে যেতে হয়--তা'হলে আমিই আগে যাবো।"

("নামজাদা দুই বন্ধু"–পানুর পাঠাগার)

"পিন্টু ভয়ানক রেগে বলে উঠলে : গেঁয়ো-ছেলেদের দেখি কোনো কাণ্ড-কাণ্ড জ্ঞান নেই। আর আধ ঘন্টা মাত্র বাকী আছে ড্রপ্‌সীন ওঠাবার, অথচ মেন-অ্যাক্টারের কোনো খোঁজ-খবর নেই। আশ্চর্য !

বাবুল আয়নার কাছ থেকে গোঁফ লাগাতে লাগাতে বললে : আমি তখনই বলেছিলুম সাদেকের কোন বিশ্বাস নেই।

পিন্টু বললে : পয়লা দিন তো তোমরাই ওর খুব তারিফ করেছিলে ; তুমিই তো বলেছিলে খুব কাজের ছেলে।—নাও এবার ঠ্যালা সামলাও। লোক নেই – এখন আকবরের পার্ট কাকে দিয়ে করাই ?

আলিম এগিয়ে এসে বললে : কেন বেশি ভাবনার কি আছে ? আপনি তো কোনো পার্ট করছেন না। আপনিই নেমে পড়ুন পিন্টু ভাই।

: তাই হোক, তুমিই না হয় আকবরের পার্টে নেমে পড়ো ভাইয়া।—বললে মুরাদ : তা না হলে গাঁয়ের লোকদের সামনে আমরা মুখ দেখাতে পারবো না।

বাবুল বললে : তাছাড়া এতগুলো লোক সামনে বসে রয়েছে, তারাই বা বলবে কি ? এক হপ্তা ধরে তো সারা গাঁয়ে খুব ক'রে ঢেঁড়া পেটা হ'লো।"

("কোলকাতা ফেরৎ পিন্টু"--বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি)

"সাগর কচ্ছপ অনেকক্ষণ ধরে এলিসের দিকে তাকিয়ে রইলো। গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ঠ্যালায় তার বুকটা বেলুনের মতো ফুলে উঠলো। দু'চোখ বেয়ে দর দর পানি গড়িয়ে পড়ল। হাজার চেষ্টা করেও দু-এক মিনিটের মধ্যে সে কথা বলতে পারলে না। তার গলায় কিছু একটা আটকে গেছে ভেবে সমুদ্র ঈগল তাকে ধরে আচ্ছা করে কয়েকটা ঝাঁকি দিলে—পিঠে লাগালে আচ্ছা করে কয়েকটা গাঁট্টা। এইবার তার গলার স্বর খুললো। সে এলিসের দিকে তাকিয়ে কয়েকবার ফুঁপিয়ে দু'হাতে চোখ দুটো মুছে বলতে লাগলো: তুমি বোধ হয় সাগরের তলায় বেশিদিন বাস করোনি আর গলদা-চিংড়ীর সংগে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য তোমার ঘটেনি। কাজেই তার নাচ সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই।

এলিস বললে: না, ও রকম নাচের কথা আমি জীবনে কখনো শুনিনি।

সমুদ্র ঈগল তখন তাকে নাচটা বুঝিয়ে দিতে দিতে বললে: সে এক আহা-মরি নাচ। এক লাইনে একই তালে এমনি করে পা ফেলে ফেলে নাচতে হ'বে।"

("আজব দেশে এলিস")

আমাদের জটিলতম উপন্যাস ঃ "কাঁদো নদী কাঁদো"

আবদুল মান্নান সৈয়দ

১ ঃ কাহিনীসূত্র

আশ্চর্য উপন্যাস "কাঁদো নদী কাঁদো", সব অর্থেই আশ্চর্য ঃ আমাদের সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সবচেয়ে দূর—তথা ভিতরগামী উপন্যাস। এই শতাব্দীর সূচনা থেকেই প্রায় বলা যেতে পারে, যে এ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শন্‌-এর সূত্রপাত হয়েছিলো—"কাঁদো নদী কাঁদো" উপন্যাসের কাহিনীবুননে আছে তার স্বাক্ষর। কাহিনীর প্রধান আশ্রয় আসলে কুমুরডাঙার ছোটো হাকিম মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনোপন্যাস ঃ তার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি। কিন্তু কাহিনী সরলরেখায় অগ্রসর হ'যে যায়নি, খণ্ড খণ্ডভাবে উপস্থিত, ঘোরানো সিঁড়ির মতো ; সেই খণ্ডগুলি আবার এক অবিভাজ্য সামগ্র্য নির্মাণ করে, বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ফুলের একত্রগ্রথিত এক তোড়াব মতো। যে সুতোয় ঐ তোড়া বা মালা গ্রথিত, তাও আবার যেন দুটো সাদা-কালো সুতো পাকিয়ে তৈরী ; অর্থাৎ এ কাহিনীর কথক দু'জন ঃ একজন মূল কথক, সমস্ত কাহিনীটি যে আমাদের উত্তমপুরুষে জানিয়েছে, আলোচনার সুবিধের জন্যে একে আমরা 'কথক/১' নামে আখ্যা দিয়েছি ; আরেকজন হচ্ছে তবারক ভুঁইয়া, কাহিনীর অধিকাংশ যে ব'লে গেছে, তাকে আমরা চিহ্নিত করেছি 'কথক/২' নামে। এই রীতি আরব্যোপন্যাসের কাহিনী কথনরীতির স্মৃতিবাহী ; আরব্যোপন্যাসে অবশ্য কথক আরো বেশি, এক কাহিনীর মধ্য থেকে পরিষ্কার আর একটি কাহিনী বেরিয়ে আসে এবং শাখাকাহিনীগুচ্ছ অনেক বেশি সরল ও স্বয়ম্ভর। এখানেই এই উপন্যাসের চরিত্রপাত্রের একটি নকশা তৈরী ক'রে নিলে আলোচনা সুগম হ'তে পারে ঃ

আমি = কথক/১
লোকটি, তবারক ভুঁইয়া (পেঁচা) = কথক/২, কুমুরডাঙার
স্টিমারঘাটের টিকেট-কেরানি

মুহাম্মদ মুস্তফা = কুমুরডাঙার ছোটো হাকিম
বাদশা মিঞা = স্টিমারঘাটের লস্কর-সর্দার
খতিব মিঞা = স্টিমারঘাটের স্টেশন-মাস্টার
কফিলউদ্দিন = উকিল
হোসনা = তার কন্যা
খোদেজা = কথক/১-এর বোন, মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাতো বোন
খেদমতুল্লা = মুহাম্মদ মুস্তফার পিতা
আমেনা খাতুন = মুহাম্মদ মুস্তফার মাতা
মোসলেহউদ্দিন = মোক্তার
সকিনা = তার কন্যা
ডাঃ বোরহানউদ্দীন = ডাক্তার
ছলিম মিঞা = দোকানী
কালু মিঞা — ইত্যাদি।

কথক/১, উত্তমপুরুষে সমগ্র কাহিনী যার মুখে ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু যার নাম আমরা জানতে পারি না, মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে একই যৌথ পরিবারে বড়ো হয়েছে সে, তার বোন খোদেজা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে। ঔপন্যাসিক ও কথক/১-কে অনন্য ব্যক্তি ব'লে মনে হয়। মোপাসা-র 'আমি'-রই তুলা বলা চলে তাকে: শুধু যে শেষপর্যন্ত চিন্তার দিক থেকে অংশ নেয়। কথক/২-এর মুখে গল্প শুনাতে শুনতে মুহাম্মদ মুস্তফার প্রসঙ্গ এলে তার প্রাক্তন স্মৃতি উদ্বোধিত হয়, সে-ও মুহাম্মদ মুস্তফার মানসচরিত বুনে চলে—এবং এরই মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফার সম্পূর্ণ জীবনচরিত ক্রমে ক্রমে আমাদের চোখের সামনে খুলে যেতে থাকে।[১] আশ্চর্য নির্লিপ্ত সে, শিল্পীশোভন নির্লিপ্ত ও জড়িত। চাপা আবেগের বাষ্পে ভরপুর কি সে?—তা না হ'লে এই সারা উপন্যাস অসামান্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে ব'লে গিয়ে অন্ত্যম মুহূর্তে তার স্বগতোক্তি নিষ্ক্রান্ত হয় কেন: "কাঁদো নদী কাঁদো।" অবশ্য তখনো তার উপর মেলা রয়েছে এক নৈর্ব্যক্ত নির্বেদ। তার বোন খোদেজা এবং তার মাতা ও পিতা সম্বন্ধে উক্তি তার এই নৈর্ব্যক্তিকতার পরিচায়ক। 'খোদেজা তার জন্যে

১. **এই ধরনের বাংলা ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টার দু'টি উদাহরণ: প্রেমেন্দ্র মিত্রের "প্রতিধ্বনি ফেরে" ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "রঙে রঙে বোবা"।**

আত্মহত্যা করেছে—বাড়ীর লোকদের এই ভিত্তিহীন অমূলক ধারণাটি কি ক'রে মুহাম্মদ মুস্তফা বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে?' (পৃঃ ২৫৮)। কথক/১-এর এই প্রশ্ন ও বিস্ময় এক হিসেবে বিস্ময়কর। নিজের বোনের ব্যাপারে মুহাম্মদ মুস্তফাকে সে অনায়াসে মনে মনে অভিযুক্ত করতে পারতো, অন্তত সেখানে যুক্তি-বুদ্ধির চেয়ে ভাবাবেগের প্রাবল্যই ছিলো স্বাভাবিক; কিন্তু তা সে মনে করেনি, সমস্ত বিষয়টি যেন সে বিবেচনা করেছে স্থির ও শান্ত মনীষায়।

কথক/২-কে দেখা হয়েছে কথক/১-এর চোখ দিয়ে। কথক/১-এর মতো কথক/২-ও কাহিনীর সঙ্গে বক্তা হিসেবে নয়—অন্যতম ঘনিষ্ঠ চরিত্র হিসেবেই জড়িত। কিন্তু কথক/২ কথক/১-এর সম্পূর্ণ প্রতীপস্বভাবী মানুষ: কথক/১ গম্ভীর, সংযত, নৈর্ব্যক্তিক, মিতবাক, বিশ্লেষক; কথক/২ বাচাল, সত্যিকার গল্প-বলিয়ে, জীবন বিষয়ে অতীব কৌতূহলী সে, দর্শক, প্রথমে তাকে দিয়ে তার চরিত্রজ্ঞাপক এলোমেলো কএকটি গল্প বলিয়ে ক্রমে মূল কাহিনীতে কেন্দ্রীভূত করা হয়। কথক/২ হয়তো তবারক ভুঁইঞা, একথা খুব স্পষ্ট ক'রে বলা হয়নি।[২] তার ডাক-নাম 'পেঁচা'—তার পেঁচকসুলভ জীবনানুসন্ধিৎসার পরিজ্ঞাপক—এ-কথা লেখক নিজেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

সবচেয়ে জটিল-গভীর চরিত্র মুহাম্মদ মুস্তফা-র, এই উপন্যাসের যে কেন্দ্র-নায়ক। তার প্রবল জ্বরের সময় স্টিমারঘাটের টিকিটপরিদর্শক তবারক ভুঁইয়া উপস্থিত ছিলো; সেই জ্বরের ঘোরেই মুস্তফার কন্ঠে একটি মেয়ের নাম উচ্চারিত হয় (পৃঃ ১৫)। কুমুরডাঙা যাবার পথে এক দারোগার সঙ্গে মুস্তফার সাক্ষাৎ (পৃঃ ২৬); স্টিমারঘাটে মুস্তফা (পৃঃ ৪০) ইত্যাদি। মুহাম্মদ মুস্তফা তার অজ্ঞাতসারে একটি মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারটি হচ্ছে এই: খোদেজার পিতা মারা গেলে খেদমতুল্লা বিধবা 'বোনের দুঃখে দুঃখপরবশ হয়ে' (পৃঃ ৫৭)

২. **এই উপন্যাসে যে-আবরণের পর আবরণ চড়ানো হয়েছে, তার প্রমাণ আছে বহু স্থানে। ৩১ পৃষ্ঠায় বন্ধনীর মধ্যে বলা হলো:**

সে যে তবারক ভুঁইয়া—সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই কারণ দেখতে পাই না

আশ্চর্য, আরো এগিয়ে গিয়ে, ৪৭ পৃষ্ঠায় বন্ধনীর মধ্যে

সে কি সত্যই তবারক ভুঁইয়া? আমার ভুল হয়নি তো?

—এইসব প্রতীপোক্তি এই উপন্যাসের মূল কুশলতারই সহযাত্রী।

বলেছিলেন যে মুস্তফা বড়ো হ'লে খোদেজার বিবাহ দেওয়া হবে তার সঙ্গে। এই প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছিলো অনেকটা ভাবাবেগ থেকে অনেকটা তাৎক্ষণিক। পরে মুস্তফা বড়ো হ'য়ে তার পরিবারের পক্ষে বিরাট চাকুরি পেলো : একটি শহরের ছোটো হাকিম; তখন আর তার খোদেজার সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারে না, তাছাড়া সবাই তার সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়েছিলো। ইতিমধ্যে মুস্তফার বিবাহ ঠিক হয়। বাড়িতে এই বিবাহসংবাদবহ পত্র যাবার পরে-পরেই খোদেজা বাড়ির পিছনের পুকুরে ডুবে মরে। এই আত্মহনন মুস্তফার মনে দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথমে সে এই মৃত্যু-সংবাদে মাত্র 'ঈষৎ আঘাত পেয়েছিলো' (পৃঃ ৪৩)। ক্রমশঃ তার মধ্যে প্রতি-ক্রিয়া গভীরে বসতে থাকে। দু'দিনের ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গেলে পারিবারিক পরিবেশ তাকে এ কথা বুঝিয়ে দ্যায় যে 'মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে খোদেজা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে' (পৃঃ ৪৬)। বিয়ে প্রথমবারের জন্যে স্থগিত হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহ-তারিখ ঠিক হবার পর স্টিমার না-আসায় মুস্তফা যথাসময়ে রওনা হ'তে পারেনি। দ্বিতীয়বার বিবাহ-তারিখ স্থিরীকৃত হ'লে স্টিমার না-আসায় মুহাম্মদ মুস্তফা যথাসময়ে রওনা হতে পারেনি; পরে নৌকোয় যাবার মনস্থ করলেও আকস্মিক জ্বরাক্রান্ত হ'যে এবারও তার যাত্রা স্থগিত হয়। জ্বরাক্রান্ত হ'য়ে সে যখন খোদেজার নাম উচ্চরণ করে (পৃঃ ১৫) তখন বোঝা যায় এ মৃত্যু তার অবচেতনে মূর্তি ধরেছে।' তারপর শুরু হয় মুহাম্মদ মুস্তফার ঘটনার বিশ্লেষণ (পৃঃ ৫৮, ১৮৭ ও ২০১)। মুস্তফার এই অবচেতনভীতির একটি প্রকাশ সাকিনা খাতুনকে খোদেজার বিভ্রমে (পৃঃ ২১৮); খোদেজার স্বপ্নদর্শনে (পৃঃ ২২৫); ক্রমশঃ মৃত খোদেজা তার চেতনার সমগ্র দখল করে (পৃঃ ২৩৫)। মুস্তফা, শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু বিফল হয় (পৃঃ ২৪৬)। পরে সে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায় এবং সেখানেই আত্মহত্যা করে (পৃঃ ২৬১)।

২ : চেতনাপ্রবাহ

"কাঁদো নদী কাঁদো" চেতনাপ্রবাহ-পদ্ধতির উপন্যাস। পূর্বজ দু'টি উপ-ন্যাসে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ অন্যরকম প্রকরণের আশ্রয় নিয়েছিলেন। "চাঁদের অমাবস্যা"-র মনোবিশ্লেষণ এখানে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে

যেন। এ বিষয়ে আরো অগ্রসরণের আগে চেতনপ্রবাহী উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত রেখালেখ্য অংকন করা যাক।

চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসে সব-কিছুই উপস্থিত হয় আপাতভাবে অসংগ্রথিত চিত্রকল্প ও ভাবাষঙ্গের একটি ধারায়, ঐ ধারায় যুক্তির শৃঙ্খলার চেয়ে অনুষঙ্গই প্রধান। প্লট ও চরিত্রাবলি প্রবাহিত হয় প্রধান চরিত্রপাত্রের মানুষের ভিতর দিয়ে এবং তারই চেতনাপ্রবাহে আভাসিত হয় সমস্ত, চুম্বন ক'রে চলে যায় সমস্ত কিছু একই মুহূর্তে—একটি বাইরের ঘটনা মনোলোকে যে-সব ভাবানুষঙ্গ ও স্মৃতিচূর্ণ গ'ড়ে তোলে তারই সমাহৃতি। এই ধরনের উপন্যাস আধুনিক কালেরই আবিষ্কার, প্রায় মনোবিদ্যা থেকেই পরিগৃহীত, 'অবাধ অনুষঙ্গ' এর প্রধান চারিত্র্য। এই প্রকরণের প্রথম প্রকৃত স্রষ্টা এদুয়ার্দ দুজার্দাঁ, একজন ফরাশি ঔপন্যাসিক, উপন্যাসের নাম "অরণ্যে আর না", ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত। জেমস জএস (১৮৮২-১৯৪১) ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ (১৮৮২-১৯৪১) এই ধারার প্রধান দু'জন ঔপন্যাসিক। জএস নিজে তাঁর লেখার বছর তিরিশেক আগে দুজার্দাঁ-র প্রথম চিৎপ্রবাহী উদ্ভাবনা স্বীকার করেছিলেন। চিৎস্রোতল উপন্যাসের সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ জএস-এর 'ইউলিসিস' (১৯২২)। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্-এর উপন্যাসমালা বেরিয়েছে ১৯২২ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে—"জ্যাকবের ঘর", "মিসেস ড্যালোএ", "বাতিঘরের দিকে", "তরঙ্গমালা" প্রভৃতি।[৩] মারসেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২)

৩. একমত না হ'লেও চিৎপ্রবাহী ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কএকটি লাইন উদ্ধৃত করছি :

চৈতন্যধারাকে আতলস্বচ্ছ রাখতে হলে, তাতে খাল কেটে বাইরের জল আনা চলে না। উবেল প্লাবনে তার উষর উপকূলের কাদাই বাড়ে, দু'পাশে উর্বরতা আসে না ; এবং এই প্রণালী দিয়ে লেখক যদি পাঠকের সমুদ্রসঙ্গমে ছুটতে চান, তবে তাঁর পক্ষে অবৈকল্য ও একনিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ এ-ধরনের উপন্যাসে চরিত্রের বাহুল্য যেমন ভয়াবহ, দৃশ্যের অপর্যাপ্তিও তদ্রূপ। জয়েস এ-কথা বোঝেননি, বলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান "য়ুলিসিস" সিদ্ধির সন্নিকটে পৌঁছেও কেবল ঔৎসুক্যময় পরীক্ষাতে আবদ্ধ থেকে গেছে এবং এই ধ্রুবতারার নাম নিয়ে প্রুস্ৎ নিরুদ্দেশযাত্রায় বেরিয়েছিলেন ব'লেই, পাতাল ঘুরে তিনি অবশেষে অমরাবতীতে পদার্পণ করেছেন। "মিসেস ডালোয়ে" পাঠে আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে শ্রীমতী উল্‌ফ একাগ্রতার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে সচেতন। "দি ওয়েভস" প'ড়ে জেনেছি যে, সে ধারণা ভ্রান্ত। ["স্বগত"]

চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির একজন প্রধান শিল্পী। তাঁর উপন্যাস, "লুপ্ত সময় সন্ধানে" ষোলো খণ্ডে বেরিয়েছে ১৯১৩ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে—শেষ খণ্ডগুলি তাঁর মৃত্যুর পরে। হারানো ও অপ্রাপনীয় এই সময় সন্ধানে প্রুস্ত জেমস জএস, হেনরি জেমস, এলিঅট প্রমুখের স্মারক। চিৎপ্রবাহের জলোৎস হয়তো বের্গসঁ, যিনি 'যান্ত্রিক সময়' আর 'মনস্তাত্ত্বিক সময়'কে পৃথক ব'লে চিহ্নিত করেছিলেন। আরো প্রত্যক্ষভাবে দায়ী উইলিঅম জেম্‌স্।

বাংলা উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ রীতি আসে আরেকটু পরে তিরিশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে। বুদ্ধদেব বসুর "তিথিডোর" (১৯৪৯), "নির্জন স্বাক্ষর" (১৯৫১), "কালো হাওয়া" (১৯৪২) প্রভৃতি উপন্যাস; ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "অন্তঃশীলা" (১৯৩৫)[8] "আবর্ত" (১৯৩৭), "মোহানা" (১৯৪৩)—উপন্যাসত্রয়ী; গোপাল হালদারের "একদা" (১৯৩৯), "অন্যদিন" (১৯৫০), "আর একদিন" (১৯৫১)—উপন্যাসত্রয়ী;—এই সবই বাংলা উপন্যাসের চেতনাপ্রবাহ রীতির বিরল উদাহরণ। সাল-তারিখ মিলিয়ে দেখলে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেই আমরা বলতে পারি বাংলা উপন্যাসের প্রথম চেতনাপ্রবাহী উদ্‌গাতা। অতঃপর ঐ তিন সূত্রধারের রচনা থেকে চিৎস্রোতের তিনটি উদাহরণ সন্ন্যস্ত করা যাক:

> ১. চুপ; সারা বাড়ি চুপ; পৃথিবী চুপ; শ্বেতা একবার আকাশের দিকে মুখ তুললো, তারা, চুপ; স্বাতী নড়লো না, সত্যেন নড়লো না, চুপ; কুলোর প্রদীপের ছায়া-ছায়া আলো, লুকোনো, লাজুক, বলতে না পারা কথা, ভুলতে না পারা. . . .চোখ নেই, চোখ খোলা, খোলা জানালা কালো, বাইরে কালো, কালো আকাশে তারা; দূরে, পারে, পরপারে; হ'য়ে-যাওয়া, না-হওয়া, হ'তে থাকা, চিরকালের, আকাশ-ভরা স্তব্ধ তারা তাকিয়ে থাকলো।
>
> [তিথিডোর : বুদ্ধদেব বসু]

---

৪. ১৯৩৫-য়েই একটি গ্রন্থালোচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন :

> ধূর্জটিপ্রসাদ খগেনবাবুর মারফৎ আমাদের জানিয়েছেন যে, প্রুস্‌ৎ, জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ ইত্যাদি অন্তর্মুখীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত; এবং সে খবর না পেলেও তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের ভুল ঘটত না।
>
> ["কুলায় ও কালপুরুষ"]

২. মুকুন্দ যেন সাঞ্চো পাঞ্জা! কিন্তু স্পেনের মেয়েদের কাল চোখ, কাল ভুরু, দাঁড়ায় কোমরে হাত দিয়ে, দেহের গঠন পুরুষ্টু, বেশী বাঁকা, অথচ যেন মিলিটারী মেয়ে, নির্লজ্জ। মোটে সাড়ে তিনটে...ঘড়িতে দম দেওয়া হয়নি যথাসময়ে—যায় মন্থরগতিতে—ডনকুইক্সটের ঘোড়ার মতন, সাঞ্চো পাঞ্জার মতন। ডন্ রোগা ছিলেন, তিনি হাঁটতেন কেমন? অত আস্তে চলা পোষায় না, নতুন ঘড়ি কিনতে হবে। মুকুন্দকে নিয়ে যেতে হবে—চিন্তামণিকে নিয়ে যাওয়াই যায় না—বমলা দেবীর চাকর—বনবে না। কিন্তু মুকুন্দ সত্যি গায়ে-পড়া। ওর কাছে কোথায় খেয়েছি, কেন খাইনি কৈফিয়ৎ দিতে হবে! ছাই দিতে হবে! যা হুকুম করব তাই করতে হবে, আব্দেরে হ'য়ে উঠেছেন, ভাবছেন, মা আর নেই বাড়ীর গিন্নী হয়েছেন, পঁচিশ টাকার বামুন এনেছেন। ঠাকুরটা ফাজিল।

[অন্তঃশীলা : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়]

৩. শীতের রৌদ্রে দাঁড়াইয়া অমিত দেখিতেছে, কলিকাতার বুকের উপর তুষারমণ্ডিত হিমালয়—দার্জিলিং।

তরাইয়ের বন, ধোঁয়াটে পাহাড়, সাদা তুষারমৌলি,—কুণ্ডলায়িত মেঘ, পাতলা কুয়াসা, পাগলা ক্ষ্যাপা মেয়ে ঝরণা, পথের ফুল, পাহাড়িয়া নরনারীর রহস্যময় মুখাবয়ব আর....ললিতার হাসি। প্রচুর হাসি, অকারণ হাসি। অকারণে ছুটাছুটি, হাতাহাতি, মারামারি, সময়ে-অসময়ে, 'চল বেড়িয়ে আসি। ফগ আছে, চল; ফগ নেই, চল।' অসম্ভব খাদ্যের আয়োজন, অপরিমিত চা ও কেক, চপ ও রোস্ট।' গরম জল লইয়া ছুটাছুটি—'হাতে ঠাণ্ডা জল! মা গো মারবে যে! নাও নাও!' 'বিছানাটা ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে।' 'বেশ ছেলে! পায়ে মোজা নেই! গেছ এবার।' 'আমার শালটা জড়িয়ে নিন দেবব্রত বাবু। না, না, দার্জিলিং ইজ এ হরিব্ল প্লেস--জানেন না।' স্যাল, ক্যালকাটা

রোড কাশিয়িং, লেবং, টাইগার হিল, সিঞ্চল—যেতেই হবে।
না, যেতেই হবে।

[একদা : গোপাল হালদার]

"কাঁদো নদী কাঁদো" উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ ব'য়ে গেছে স্মৃতি ও অনুষঙ্গের সূত্র ধ'রে। কথক/২-এর গল্প কবাব সূত্র ধরে কথক/১-এর মনে চাক বেঁধেছে স্মৃতি এবং ঐ দু'জন মিলে যেন সমগ্র উপন্যাসের কাহিনীটি বুনে গেছে। চিৎপ্রবাহী রচনায় জলধারা অনেক সময় একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উপন্যাসের স্টিমার-যাত্রার ব্যাপারটিতে শুধু নয়, মূল কথকের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য :

> আরো পবে মনে হয় তাব মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে যা নিঃসৃত হয় তার ওপর সমস্ত শাসন সে হারিয়েছে, কথার ধারা বোধ কবার ইচ্ছা থাকলেও বোধ করাব কৌশল তার জানা নেই; বস্তুত তার বাক্যস্রোত রীতিমত একটি নদীর ধাবায় পরিণত হয়। তবে এমন একটি ধারা যা মৃদুকন্ঠে কলতান করে, কিন্তু বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি করে না, দুর্বার বেগে ছুটে যায় না। সে ধারা ক্রমশঃ অজানা মাঠ-প্রান্তর গ্রাম-জনপদ চড়াই-উৎরাই দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।
>
> [পৃঃ ৩]

উপন্যাসের প্রথম দিকে কথক/২-এর কথা শুনে কথক/১-এর সেই যে 'একবার মনে হয়, তার কথা আমার স্মৃতির পর্দায় কোথায় যেন ঈষৎ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে' (পৃঃ ১১)। বস্তুত সমগ্র উপন্যাসটিই তৈরী হয়েছে স্মতির ঐ সংক্রামে। উপন্যাসটি তাই, ওয়ালিউল্লার অন্যান্য উপন্যাসের মতো পরিচ্ছেদে-পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়নি, জলধারার মতো ব'য়ে গেছে। স্মৃতিসঞ্চারী কথক তবারক ভুঁইয়া ফিরে এসেছে বারবার এই কাহিনীর সূত্রধারের মতো। প্রকৃত চিৎপ্রবাহী উপন্যাসের মতোই এখানেও কাহিনী একটি রেখায় অগ্রসর হ'য়ে যায়নি, জলের মতো ঘুরে-ঘুরে এসেছে, কথক/১-এর গল্প বর্ণনায় আর কথক/২-এর স্মৃতিসংক্রামে একটি কাহিনীর চরিত্রেরা যেন বানরদোলার মতো ঘুরে ফিরেছে। ৩৯, কিংবা আরো স্পষ্টভাবে ৪৬ পৃষ্ঠায় আমাদের জানিয়ে দেওয়া হ'লো বটে, 'মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে খোদেজা

পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।' কিন্তু তার পটভূমি আর পটভূমি-উত্তর ঘটনাবলি নির্মাণ করতে লেগে যায় তার সারা উপন্যাস। চিৎপ্রবাহী উপন্যাসে স্মৃতি ও ভাবানুষঙ্গের মধ্য দিয়ে কাহিনী সম্পূর্ণ হয় ব'লে সময়-ধারণার একটি নতুন প্রকাশ আমরা দেখি: অত্যল্প সময়েই অতীত বিহার সম্পন্ন হয়। এই উপন্যাসের কাহিনী একটি স্টিমারযাত্রার মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। সূচনায়:

> লোকটিকে যখন দেখতে পাই তখন অপরাহ্ণ, হেলে-পড়া সূর্য গা-ঘেষাঘেঁষি হয়ে থাকা অসংখ্য যাত্রীর উষ্ণ নিশ্বাসে দেহতাপে এমনিতে উত্তপ্ত তৃতীয় শ্রেণীকে আরো উত্তপ্ত ক'রে তুলেছে। সে-জন্যে এবং রোদ-ঝলসানো দিগন্তবিস্তারিত পানি দেখে দেখে চোখে শ্রান্তি এসেছিল, তন্দ্রার ভাবও দেখা দিয়েছিল। তারপর কখন নিকটে গোল হয়ে বসে তাস খেলায় মগ্ন একদল যাত্রীর মধ্যে কেউ হঠাৎ চীৎকার করে উঠলে তন্দ্রা ভাঙে, দেখি আমাদের স্টিমার প্রশস্ত নদী ছেড়ে একটি সংকীর্ণ নদীতে প্রবেশ করে বাম পাশের তীরের ধার দিয়ে চলেছে।
>
> [পৃঃ ১]

আর, অন্তিমে:

> স্টিমার ধীরে ধীরে ঘাটের পাশাপাশি হয়, তার চতুষ্পার্শ্বে উচ্ছৃঙ্খল পানি শত শত হিংস্র সরীসৃপের মত গর্জন করে।
>
> [পৃঃ ২৬২]

মাঝখানে স্টিমার অনেক নগর-বন্দর-প্রান্তর ছুঁয়ে এসেছে।

শুরুতে যে নদীর স্রোতের মতো বাক্যস্রোতের কথা বলা হয়েছে, হয়তো তারই জন্যে এই উপন্যাসে সংলাপ অত্যল্প। আড়াইশো পৃষ্ঠারও বেশি পাতার এই উপন্যাসে একটি পনোক্ষতা তৈরী করা হয়েছে বর্ণনাস্রোতে ও সংলাপ বিরলতায় বই-এর এমন সংলাপটি পাওয়া গেলো ৯ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় ১৬ পৃষ্ঠায়, তৃতীয়টি ২২ পৃষ্ঠায়—এমনি। এইসব সংলাপও প্রায় বিচ্ছিন্ন উচ্চারণ। বর্ণনা বাদ দিয়ে সংলাপকে যদি কোথাও-কোথাও একটি কথোপকথনে পরিণত করা যায়, সেখানেও দেখা যাবে একই প্রশ্নোত্তরের আবৃত্তি:

> 'আজ বিষুৎবার নাকি?'
> 'হ্যাঁ, আজ বিষুৎবার।'

'আজ বিষ্যুৎবার।'

'হ্যাঁ, আজ বিষ্যুৎবারই উকিল সাহেব।

[পৃঃ ৯৪-৯৫]

২ 'বটতলায় কে?'

'আমি মুহাম্মদ মুস্তফা।'

'কে মুহাম্মদ মুস্তফা?'

'আমি খেদমতুল্লার ছেলে মুহাম্মদ মুস্তফা।'

[পৃঃ ১২৩-১২৪]

৩. 'কিছু বলবেন কালু মিঞা?'

'বলেন কালু মিঞা।'

'কিছু বললেন কালু মিঞা?'

'তিনি বললেন—খেদমতুল্লাকে খুন করেন নাই—কবানও নাই?'

[পৃঃ ১৪৩-১৪৪]

৪. 'সত্যি কিছু শুনতে পান নাকি?'

'না, একটা কান্নার শব্দ থেকে থেকে শুনতে পাই।'

'শুধু আপনিই শোনেন আর কেউ শুনতে পায় না—তা কি করে সম্ভব?'

'কান্নার আওয়াজটা কেমন ধরনের?'

'তবে আওয়াজটা সব সময় একদিক থেকেই আসে।'

'কোন্‌দিক থেকে?'

'নদীর দিক থেকে।'

'কান্নাটি শুনলে ভর করে না?'

'না, ভয় করে না।'

'মন খুশীতে আত্মহারা হ'য়ে ওঠে বুঝি?'

'কি, কান্নার আওয়াজ শুনলে মন বুঝি খুশিতে ভ'রে ওঠে?'

'ভয় হতো, তবে আর হয় না। নদীর কান্নায় ভয় কি? নদী কাঁদে, বাকাল নদী কাঁদে।'

সংলাপ বিরল ব'লেই তীব্র কখনো কখনো একটি মাত্র সংলাপে ভর ক'রে একটি পুরো দৃশ্যাংশ রচিত হ'য়ে যায়।

৩ : দায়িত্বের ভার

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্য কোনো কোনো রচনার মতো "কাঁদো নদী কাঁদো" উপন্যাসেও অস্তিত্ববাদের প্রভাব স্পষ্টতই পড়েছে।

অস্তিত্ববাদ একটি দার্শনিক মতবাদ, যা একটি সাহিত্যধারা সৃষ্টি করেছে। এর ভিত্তিভূমি হ'লো এই যে, প্রতিটি ব্যক্তির প্রকৃত অস্তিত্বই হ'লো মৌলিক ও জরুরী বিষয়—কোনো নির্বস্তুকতা বা থিয়োরী নয়। যদিও এই মতবাদ বহু প্রাচীন, তবু আধুনিককালে এর প্রধান উদ্‌গাতা সোরেন কিএরকেগর্দ (১৮১৩-৫৫)। এই মতপন্থা নিয়ে কাজ করেছেন আরো জ্যাসপার্স, হাই-ডেগার ও উনামুনো। দস্তএভস্কি (১৮২১-৮১) ও বিশেষতঃ কাফ্‌কা-র (১৮৮৩-১৯২৪) রচনায় আছে এর বিশেষ আবহ। এর সাহিত্যিক সত্যিকার তৎপরতা শুরু হয় জাঁ-পল সার্ত (১৯০৫-) ও সিমন দ্য বভোআ এবং তাঁর অনুসারীদের হাতে, তাঁদের "Les Temps Moderns" পত্রিকায়। আর কোনো দার্শনিক মতবাদ, সম্ভবত, সাহিত্যে এতো গভীরাবতি পায়নি। অস্তিত্ববাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে আঁদ্রে মালরো এবং আলবেআর কাম্যু-র মতো লেখক, যদিও তাঁরা এ আন্দোলনের শরিক ব'লে কখনো নিজেদের মনে করেননি।

কেন্দ্রবিষয় হ'লো এই: মানুষ নিজেকে যেভাবে তৈরী করে, সে তা-ই—ঈশ্বর বা সমাজ বা জীববিদ্যার দ্বারা চালিত নয় সে। তার আছে স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীন ইচ্ছার অনুগামী দায়িত্ববোধ। সে-ই অবজ্ঞেয়, যে ঐসব বাইরের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। তাই অস্তিত্ববাদী সাহিত্য কর্মপ্রবাহের উপর জোর দ্যায়—অস্তিত্ববাদীরা মানুষের মধ্যকার মৌল বিষয়গুলির উপরই দৃষ্টি ফেলেছে, তার অচেতন ও অবচেতন স্তরকেও অন্তর্ভুক্ত ক'রে। তারা মনে করে জীবন চির-চলিষ্ণু, চির-পরিবর্তমান—মানুষের জীবন কোনো নির্বস্তুক ব্যাপার নয়—ধারাবাহিক মুহূর্তে নির্মিত। তাই তাদের কাছে নির্বস্তুকতার চেয়ে বস্তুই বড়ো, অস্তিত্বের ধারণার চেয়ে অস্তিত্বই গরীয়ান।

খ্রীস্টিয় অস্তিত্ববাদের অন্য একটি ধারা আছে—তার প্রবক্তা গাব্রিএল মারসেল। ইচ্ছার একটি সক্রিয় ভূমিকা বর্তমান—সার্ত-এর এই প্রস্তাবের সঙ্গে খ্রীস্টিয় অস্তিত্ববাদ একমত; কিন্তু এর অন্ত্যম পরিণতি ধর্মীয় ঈশ্বরে ধাবমান। খ্রীস্টিয় অস্তিত্ববাদেরও সাহিত্যিক প্রতিফলন পড়েছে—যেমন, মারসেলেরই কএকটি নাট্যে।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রফাটল ধরিয়েছে অস্তিত্বের সংকট এবং সেই সংকটপাত্র উপন্যাসের মূল চরিত্র মুহাম্মদ মুস্তফার। এমনিতে মুহম্মদ মুস্তফা নির্বিবাদী ও অক্রিয় (Passive) ধরনের চরিত্র। কিংবা বলা চলে, তার অক্রিয়তার মধ্যেও র'য়ে গেছে সক্রিয়তার বীজ—সে হচ্ছে তার চেতনা, যা তাকে এক দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দ্যায়। মুহাম্মদ মুস্তফার এই অতি-অক্রিয় চরিত্র সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে :

> মুহাম্মদ মুস্তফা মানুষের মতামতে কদাচিৎ দোষের বা আপত্তির কিছু দেখতে পায়, কারো মত তার নিজস্ব মতের বিরুদ্ধে গেলেও বিচলিত হয় না, সে-বিরুদ্ধ মতটিকে ধ্বংস করার ইচ্ছাও জাগে না তার মনে। সে ভাবে, অন্যের ভুলত্রুটি শুধরিয়ে কি লাভ ? ছাত্র-বয়সে তারুণ্যের আতিশয্যে নবলব্ধ জ্ঞানের মাদকতায় অন্যেরা যখন তুমুল তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয় সে-বয়সেও সে কোনোদিন এ-পক্ষে সে-পক্ষে কোন মত প্রকাশ করেনি। বলতে গেলে, এ পর্যন্ত তার জীবনটা একটি গভীর নিরবতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে।... তার চিন্তাধারা এমনই যে তার যদি ধারণা হয় বিভিন্ন ফুলের নাম-বিবরণ জানা নিষ্প্রয়োজনীয় তবে ফুলের দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না, কেউ গোলাপকে সূর্যমুখী বলে ভুল করলে বিস্মিত হবে না, প্রতিবাদও করবে না। (পৃঃ ২৮)

এই অক্রিয়তাই যে মুহাম্মদ মুস্তফার তীব্র চেতনার জন্যে দায়ী, তার ইঙ্গিত আছে অনেক পরে, বই-এর প্রায় শেষে :

> তবে একটি কথায় বড়ই বিস্মিত হই। সেটি এই যে, খোদেজা তার জন্যে আত্মহত্যা করেছে—বাড়ীর লোকদের এই ভিত্তিহীন অমূলক ধারণাটি কি করে মুহাম্মদ মুস্তফা বিশ্বাস করে নিয়েছে। কিন্তু কেন বিস্মিত হয়েছিলেন ? সে কি সব কথাই নির্বিবাদে মেনে নেয় না ?
>
> [পৃঃ ২৫৮]

মুহাম্মদ মুস্তফার অক্রিয়তাই তাকে একসময় ভিতরে ভিতরে গভীরতর এক দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দ্যায়। সেই যে তার পিতা একসময় কোনো-কিছু ভাবনা-চিন্তা না-ক'রেই খোদেজার সঙ্গে তার বিবাহ দেবে বলেছিলো,

সেই অকারণ হঠাৎ-আবেগে উচ্ছ্বসিত খেয়ালি প্রতিশ্রুতি মুহাম্মদ মুস্তফা কিছুতেই মন থেকে একেবারে উচ্ছিন্ন করতে পারেনি। এখানে উপন্যাসের একটি অংশ জরুরি ভূমিকা নেয়ঃ

> কখনো কখনো আমার মনে হতো, এ-সবের মধ্যে কোথায় যেন একটি গূঢ় অর্থ। মুহাম্মদ মুস্তফা অনেক কথাই বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছে, যে-সব ছেলের পক্ষে অতিশয় দুর্বিষহ...তবু দুর্বৃত্ত বাপের প্রতিও ছেলের কি কোন দায়িত্ব নেই? হয়তো সে দায়িত্বের কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত; পিতা-পুত্রের মধ্যে দায়িত্বের ব্যাপারে তাদের রক্তসম্বন্ধের মতই রহস্যময় যা সাধারণ বুদ্ধির বহির্গত। কেবল সে দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্মৃত হওয়া কোন ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। সে-দায়িত্বের কথা ভুলে ছেলে যদি তার জীবন গড়ার চেষ্টা করে এবং গড়ে তুলতে সক্ষমও হয় তার জীবন কি চোরাবালির উপরেই গড়া হবে না, তার সঙ্গে কি একটি অবাস্তবতা একটি অসত্যতা চিরদিনই জড়িত থাকবে না? যে দায়িত্ব প্রতি মুহূর্তে রক্তের স্রোতে অশান্তির ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে, সর্বদা কী একটা অস্বস্তিকর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তা অস্বীকার করা যায় না। [পৃঃ ১০৬-৭]

তার পিতার কথা অস্বীকার ক'রে বিবাহ করতে গিয়ে প্রতিবার ব্যর্থ হ'য়েও মুহাম্মদ মুস্তফার মনে হয়েছিলো চোরাবালির ওপর জীবন তৈরী তার। খোদেজার মৃত্যুর পরে তার বিস্মৃত দায়িত্ববোধ আরো তীব্র আকার ধারণ করে তার মানসে। শেষ পর্যন্ত আতীব্র অনুশোচনা তাকেও নিয়ে যায় খোদেজার মতোই আত্মহননের চোরা ও গর্বিত গলিতে। এবং স্বেচ্ছামৃত্যুর পর যখন 'গাছ থেকে মুহাম্মদ মুস্তফার নিষ্প্রাণ দেহ ঝুলছে, চোখ খোলা। সে-চোখ শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মত ক্ষুদ্র পুকুরে কী যেন সন্ধান করছে' (পৃঃ ২৬১)। শ্যাওলাচ্ছন্ন ছোটো পুকুরে খোদেজা আত্মহত্যা করেছিলো।

৪ : নিয়তিলেখ

নিয়তি এই উপন্যাসে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে, ঘুরে-ঘুরে ফিরে-ফিরে এসেছে ধ্রুবপদের মতো কিংবা কেন্দ্রীয় মন্দিরের মতো স্থির বসেছে জীবনের মধ্যখানে।

নিয়তি যে এই উপন্যাসে লোকের চেতনে-অবচেতনে দারুণ সক্রিয় ছিলো, তার নজির হিসেবে আমরা কি ভুলতে পারি কথক/২ তথা তবারক ভূঁইয়া-কথিত প্রথমতম গল্পটি ?—কোনো এক মকসুদ জোলার সেই ভাগ্যহত কাহিনী ?—

> লোকটি হতভাগ্য—এমনই হতভাগা যে এক বছর যদি বিনা বৃষ্টির দরুন তার ফসল ধ্বংস হয় অন্য বছর ধূলিসাৎ হয় শিলাবৃষ্টিতে, এ বছর তার বাড়ীঘর যদি বন্যায় ভেসে যায় অন্য বছর ভস্মীভূত হয় নিদারুণ অগ্নিকাণ্ডে, যার প্রিয়জন একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যার বিষয়সম্পত্তি হাতছাড়া হয় দুর্বৃত্ত লোকের কারসাজিতে, কাঠ কাটতে গিয়ে কাঠে না পড়ে যার পায়েই কুঠার নেমে আসে নির্মমভাবে, অবশেষে মেঘশূন্য আকাশে বজ্রাঘাতের মত অকারণেই যেন ভাগ্য-পরাক্রান্ত লোকটি পঙ্গু হয়ে পড়ে।[৫] [পৃঃ ৩-৪]

মুহাম্মদ মুস্তফা স্পষ্টভাবেই নিয়তিচালিত। 'মনে হয় দরিদ্র পরিবারে যাদের জন্ম তাদের জন্যে আর্থিক বিপত্তির চেয়ে আরেকটি জিনিস বিষম অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে পশ্চাতে ফেলে যাওয়ার বিষয়ে দ্বিধা' (পৃঃ ২০২)। বালক মুস্তফা একদিন যে-সীমারেখা...কখনো অতিক্রম করেনি সে-সীমারেখা অনায়াসে পেরিয়ে যায় (পৃঃ ৭৩)। হয়তো এজন্যেই সে গ্রামের বাড়ীতে বন্দী হ'য়ে থাকেনি (পৃ ৭৩), লেখাপড়া শিখে বড়ো চাকরি করে। কিন্তু মানুষ কি সীমারেখা পেরিয়ে যেতে পারে? তাই হয়তো মুস্তফাকে ফিরে আসতে হয় তার প্রাঙ্গনের কাছে: 'যে তেঁতুল গাছের তলে বাল্যবয়সে একটি অদৃশ্য সীমারেখা পেরিয়ে গিয়েছিলো সে-গাছ থেকে মুহাম্মদ মুস্তফার নিষ্প্রাণ দেহ ঝুলছে, চোখ খোলা' (পৃঃ ২৬১)। কিন্তু নিয়তি কি সারা জীবন তাকে অনুসরণ ক'রে ফেরেনি?—চমকিত হ'য়ে সে (মুহাম্মদ

---

৫. কুখ্যাত মারকুইস দ্য সাদ্-এর কুখ্যাত "জাস্টিন" উপন্যাসটির কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে আমার। কী দেখি আমরা এই উপন্যাসে ?—জাস্টিন ও জুলিএট দু'বোন। বাপ-মা'র মৃত্যুর পরে ওরা দু'বোন পৃথিবীতে একা হ'য়ে গেলো। "জাস্টিন" উপন্যাসে জাস্টিনের জীবনেতিহাস বর্ণিত হয়েছে—যেখানে জাস্টিন একের পর এক ক্রমাগত অসংখ্য ব্যক্তির হাতে ধর্ষিত-লাঞ্ছিত-নিগৃহীত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তার জীবনে যখন শান্তি-সুখের সূচনা হ'লো ছোটো বোন জুলিএটের আশ্রয়ে এসে, তখনই একদিন বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হ'লো। যৌন-উপন্যাস হিসেবে কুখ্যাত হ'লেও "জাস্টিন" মূলতঃ সম্পূর্ণ একটি দার্শনিক উপন্যাস।

মুস্তফা) এবারে অনেক কিছুর মধ্যে গূঢ় অর্থ দেখতে পায় (পৃঃ ২৫৯)। আমরাও বহু নিহিতার্থ টের পেয়ে যাই: যে-দিন বিয়ে করার উদ্দেশে কুমুর-ডাঙা থেকে স্টিমার ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হবে, সেদিনই স্টিমার চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেলো; পরে নৌকো ক'রে যাবার সমস্ত যখন ঠিকঠাক করা হ'লো তখনই মুস্তফা অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। আর সর্বোপরি যে মৃত্যু তাকে প্রথমে 'ঈষৎ আঘাত' দিয়েছিলো, তাই তার মনোলোকে বিশাল বিলোড়ন তুলে স্বেচ্ছামরণের দিকে নিয়ে যায়।

এই নিয়তির নিয়ামক ও প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে এই উপন্যাসে একটি ছোটো চড়া-প'ড়ে-যাওয়া নদী: বাকাল নদী। এই নদী কুমুরডাঙার অধিবাসীদের অনেকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে, কেননা এই নদীই হচ্ছে কুমুরডাঙার সঙ্গে বহিরাঞ্চলে যোগাযোগের একমাত্র পথ। এই নদীতে স্টিমার চলাচল বন্ধ হ'য়ে গিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফার বিয়ে বিঘ্নিত হয়েছে। শুধু মুস্তফা নয়, যেন নিয়তির মতো দেখা দিয়েছে কুমুরডাঙার আরো সব অধি-বাসীদের বিচিত্র জীবনযাত্রা: স্টিমার ঘাটের লস্কর সর্দার বাদশা মিঞা, স্টেশন-মাস্টার খতিব মিঞা, কুমুরডাঙার উকিল কফিলউদ্দিন, ডাক্তার বোরহানউদ্দিন, মোক্তার মোছলেহউদ্দীন ও তাঁর কন্যা সকিনা, দোকানি ছলিম মিঞা ও মোহন চাঁদ, গুণ্ডা কালু মিঞা প্রমুখ। এই উপন্যাস কেবল মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনাত্মক নয়, কুমুরডাঙা নামক জনপদটির সমগ্রই এর লক্ষ্য। ফলে, আমরা শুধু মুস্তফার পরিণতিই দেখি না দেখি আরো কালু মিঞার অবশেষ (পৃঃ ১৩৮)। ১০৭ পৃষ্ঠায় 'এবাই নিজেদের নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে' যে মুস্তফার পরিণতি-জ্ঞাপক আমরা তা তখন বুঝতেই পারি না। ২৯ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ মুস্তফা সম্পর্কে উক্তি যেন তার সমগ্র জীবনের নির্দেশক: 'সর্বদা সে (মুহাম্মদ মুস্তফা) ভাগ্যের নৌকায় একটি আরোহীর মতোই বোধ করে, যে-নৌকা সে চালনা করে না, যার দিক গতিপথ স্থির করে না।' উকিল কফিলউদ্দীন চিরতরে কুমুরডাঙা পরিত্যাগ করে যাবার সময় নৌকায় উঠতে গিয়ে আকস্মিকভাবে মারা যায় (পৃঃ ২১৭)। কোম্পানীর চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত খতিব মিঞা কুমুরডাঙার সারাজীবন থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় (পৃঃ ২৪৭)।

এই নিয়তিবাদই এই উপন্যাসের ট্রাজিক বোধের সূচনা ও শেষের জন্যে দায়ী।

ব্যাকরণবোধ এবং বাঙলা ব্যাকরণ

হুমায়ুন আজাদ

ব্যাকরণ হচ্ছে এক রকমের অপ্রীতিকর বই, যা ছাত্রদেরকে ভীত এবং অন্যান্যদের বিরক্ত করে। বাঙলা ব্যাকরণ হচ্ছে অপ্রিয় এক শ্রেণীর বই, যাতে সন্ধি সমাস কারক বিভক্তি প্রত্যয় উপসর্গ পদ লিঙ্গ বচন ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাকরণপ্রিয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও উদাহরণ থাকে, এবং সে আলোচনা উদাহরণ আমাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানের জগতে কোনো কাজে আসে না। ব্যাকরণ এবং বাঙলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে উপরোক্ত রকমের ধারণা আমরা অনেকেই পোষণ করি। আমাদের প্রচলিত ব্যাকরণবোধ ব্যাকরণ-বিরোধী, এবং ভাষা-বিরোধী। ব্যাকরণ বলতে আমাদের চোখের সামনে ভাসে ব্যাকরণ বই, যে বই হয়তোবা ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বা জগদীশ ঘোষ কর্তৃক রচিত। এ বইগুলো যাত্রা শুরু করে বিশাল দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে, এরা আমাদেরকে বাঙলা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বুঝতে শেখাতে চায়; তবে শেষাবধি এরা প্রতিশ্রুত দায়িত্ব পালন করে না। এ-বইগুলো পাঠ করে বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে আমাদের কোনো সুস্থ বোধ জন্মে না, বরং ভাষা সম্বন্ধে আমাদের সহজাত বোধ বিভ্রান্ত হয়। প্রচলিত ব্যাকরণ বইগুলোর বিরুদ্ধে জনপ্রিয় অভিযোগ হচ্ছে, এরা বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার মতো ব্যাখ্যা করে। কিন্তু এ বইগুলোর প্রধান ত্রুটি হলো, এরা কিছুই ব্যাখ্যা করে না, আমাদের ভাষাবোধকে আলোকিত করে না, আমাদের বোধকে কোনো সুনিয়ন্ত্রিত লক্ষ্যের দিকে চালনা করে না। এ বইগুলো মূলত শিশুপাঠ্য। ব্যাকরণবিদেরা উচ্চমঞ্চ থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান জ্ঞান বিতরণ করেন, তাঁদের ভাবখানা এমন, যেনো তাঁদের পাঠকদের ভাষা সম্বন্ধে কোনো বোধ নেই, তাই তাঁরা অনুগ্রহ করে মূল্যবান জ্ঞান দান করছেন। প্রচলিত বাঙলা

ব্যাকরণ বইগুলোতে কিছু প্রিয় বিষয় নিয়ে প্রথাসম্মতভাবে নাড়াচাড়া করা হয়। তাই বিভিন্ন ব্যাকরণবিদের আলোচনার বিষয় হয় অভিন্ন বস্তু, এবং তাঁরা একই রকমের আলোচনায় উদাহরণে তাঁদের গ্রন্থ স্ফীত করে তোলেন। এ বইগুলো পড়ে আমাদের কিছুতেই মনে হয় না যে, ব্যাকরণবিদেরা ভাষার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন। তাঁরা ভাষার দিকে না তাকিয়ে তাকান পূর্বসূরীদের দিকে, এবং পূর্বগামীদের কাছ থেকে জেনে নিতে চান, ভাষার কোন্ বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা কি বলবেন। তাই প্রতিটি নতুন ব্যাকরণ হয়ে ওঠে পুরানো বইগুলোরই রূপান্তরিত নবপ্রকাশ, যা ভাষাকে ব্যাখ্যা করে না, ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো পূর্ণবোধ সৃষ্টি করে না। বাঙলা ব্যাকরণ বইগুলোর দিকে তাকালে যে জিনিস সহজে চোখে পড়ে, তা হলো বিভিন্ন ব্যাকরণবিদের মধ্যে আশ্চর্য মতৈক্য; তাঁরা এমন শান্ত বিনীত বোধশূন্য যে, কোনো বিষয়েই তাঁদের মতানৈক্য হয় না, কোনো বিষয়েই তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন না। এ রকম পরম পরিতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসাহীন মতৈক্যের ফলে আমরা যে গ্রন্থরাজি পেয়েছি, তা আমাদের কিছুই দিতে পারে না। প্রচলিত বাঙলা ব্যাকরণ বইগুলো অনুশাসনমূলক, অর্থাৎ এরা আমাদের শেখাতে চায় বাঙলা ভাষায় কি শুদ্ধ, আর কি অশুদ্ধ। এদের রচনার মূলে ভাষা সম্পর্কিত বা ব্যাকরণ সম্পর্কিত কোনো তত্ত্ব নেই; এমনকি এদের রচয়িতারা বিভিন্ন ভাষাবস্তু ব্যাখ্যার জন্যে নিজেদের বোধ বা বোধিকেও ব্যবহার করেন না। অনুশাসনমূলক ব্যাকরণ, যেহেতু তা অনুশাসনমূলক, ভাষার পরিপূর্ণ রূপকে ধরতে পারে না, তবে এর প্রয়োজন রয়েছে শিক্ষার্থীদের নিকটে। আমাদের প্রচলিত ব্যাকরণ বইগুলো শব্দগঠন-কৌশল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে অতি উৎসাহী; তাই, এই ব্যাকরণ পড়ে আমাদের বোধ জন্মে, শব্দগঠন কৌশলই ভাষার প্রধান বিষয় আর অন্যান্য বিষয়গুলো যদি কিছু থাকে, অপ্রধান। শব্দগঠন কৌশলকে, অর্থাৎ রূপতত্ত্বকে আমাদের ব্যাকরণ বইগুলোতে প্রধান স্থান দেয়া হয়, কেননা ও-বিষয়ে শতাব্দী পরম্পরায় কাজ হয়েছে, তাই ও-বিষয়টিকেই সহজ সম্বল করে নেন ব্যাকরণ রচয়িতারা। শব্দ সহজে ধরা দেয় আমাদের কাছে, আমরা শব্দের মূল বের করে প্রত্যয় বিভক্তি উপসর্গ ইত্যাদি সহযোগে তাকে নবরূপ দিতে পারি, আর এ সহজ দিকটিই আকর্ষণ করে আমাদের ব্যাকরণবিদ্‌দের। অবশ্য রূপতত্ত্বও এক জটিল বিষয়, পদে পদে সেখানে জটিলতা, কিন্তু আমাদের

ব্যাকরণবিদেরা যেহেতু আপাতসরলতায় মুগ্ধ, তাই শব্দগঠন-কৌশলকেই তাঁরা প্রিয় বিষয় হিসেবে আলিঙ্গন করেন। আমাদের ব্যাকরণবিদেরা ধরে নেন যে, বাক্য গঠন করতে আমরা সবাই জানি; এবং বাক্যের অর্থ বুঝি বেশ চমৎকারভাবে, শুধু যা পারি না, বুঝি না, তা হলো শব্দগঠন। তাই সমাসের উপর, সন্ধির উপর, প্রত্যয়ের উপর, বিভক্তির উপর, উপসর্গের উপর তাঁদের দৃষ্টি পড়ে--দৃষ্টি পড়ে না বাক্যের উপর, অর্থের উপর। আমরা প্রতিদিন সংখ্যাহীন বাক্য বলি এবং শুনি, তাদের অর্থ বুঝি। 'কেমন আছেন?' 'ভালো তো?' 'তুমি কেমন আছো?' ইত্যাদি কিছু সংখ্যক বাঁধা বুলি বাদ দিলে আমাদের প্রতিদিনের উচ্চারিত এবং শ্রুত সমস্ত বাক্যই নতুন, অভিনব। তাহলে আমরা তাদের বুঝি কেমনে, তৈরী করি কেমনে? নিশ্চয় এমন হতে পারে না যে, আমরা আমাদের সম্ভাব্য সমস্ত বাক্য তৈরী করে মস্তিষ্কে রেখে দিয়েছি, আর তাই ব্যবহার করে যাচ্ছি প্রতিদিন। ব্যাপারটি হওয়া উচিত এ রকম: বাংলা ভাষার বাক্য নির্মাণের কিছু নিয়ম আছে, শব্দগঠনের কিছু নিয়ম আছে, তাদের অর্থবোধের ও উচ্চারণের নিয়ম আছে, আর আমরা বাঙলা ভাষাভাষীরা সে নিয়মগুলো আয়ত্ত করেছি। এবং সে নিয়মাবলী ব্যবহার করছি প্রতিদিন। এ নিয়ম সংখ্যাহীন হতে পারে না, কেননা সংখ্যা-হীন নিয়ম ধারণের ক্ষমতা মস্তিষ্কের নেই। মূলকথা হলো, বাঙলা ভাষার কিছু নিজস্ব শৃঙ্খলা রয়েছে, আর সে শৃঙ্খলাই হলো বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ। বাঙ্গালা ব্যাকরণ বইয়ের, সংক্ষেপে বাঙলা ব্যাকরণের কাজ হলো, সে শৃঙ্খলারাজিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। তাই 'ব্যাকরণ' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক, এক অর্থে তা ভাষার শৃঙ্খলাকে নির্দেশ করে, অন্যার্থে তা ভাষার শৃঙ্খলা-বিশ্লেষক গ্রন্থকে নির্দেশ করে।

বাঙ্গলা ব্যাকরণের আলোচনার বিষয় কি? ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণে' (১৩৭৩, পৃঃ ১৬) বাঙলা ব্যাকরণের আলোচনার বিষয়-সমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। ভাগগুলো হলো: ধ্বনিপ্রকরণ (Phonology), শব্দপ্রকরণ (Accidence), বাক্যপ্রকরণ (Syntax), ছন্দপ্রকরণ (Prosody) এবং অলঙ্কারপ্রকরণ (Rhetoric)। তিনি এ গ্রন্থে ধ্বনিপ্রকরণ আলোচনা করেছেন ৩৯ পৃষ্ঠাব্যাপী, শব্দপ্রকরণ আলোচনা করেছেন ১৩৯ পৃষ্ঠাব্যাপী, বাক্যপ্রকরণ আলোচনা করেছেন ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী, ছন্দ-অলঙ্কারপ্রকরণ আলোচনা করেছেন ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী। বইটি বিশেষভাবেই

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা, ছাত্রদের উপকারার্থে তিনি এটি রচনা করেছিলেন, এবং এ গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সহজাত এলোমেলো ভাব সর্বত্র বিস্তৃত।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে শব্দপ্রকরণ (১৩৯ পৃষ্ঠা), আর স্বল্পতম গুরুত্ব পেয়েছে বাক্যপ্রকরণ। অর্থপ্রকরণ সম্বন্ধে তিনি নীরব। তবে তিনি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন ছন্দপ্রকরণ এবং অলঙ্কারপ্রকরণকে, যাদের ব্যাকরণে স্থান হতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ভাষা সম্বন্ধে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এক রকমের এলোমেলো ধারণা, যা পাঠকদের সমূহ ক্ষতিসাধন করেছে।

ব্যাকরণ দু'প্রকারের হতে পারে: (ক) বিশ্লেষণাত্মক ব্যাকরণ, এবং (২) অনুশাসনমূলক ব্যাকরণ। বিশ্লেষণাত্মক ব্যাকরণের দায়িত্ব হলো ভাষা ব্যাখ্যা করা, ভাষার সমস্ত সংগুপ্ত নিয়মাবলীকে নির্ভুলভাবে তুলে ধরাই হলো এর কাজ। প্রসঙ্গত বলা উচিত যে, ব্যাকরণ দ্বারা মানুষ কি করে বাক্য তৈরী করে নিজ মস্তিষ্কের মধ্যে, কিন্তু তা ব্যাখ্যা করতে পারে না, কেননা মস্তিষ্কের যে অংশ ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে সে অংশ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অতি সামান্য। ব্যাকরণ পারে নির্মিত বাক্যের ব্যাখ্যা দিতে, সে বাক্যের নির্মাণকৌশলকে আবিষ্কার করতে। অনুশাসনমূলক ব্যাকরণের দায়িত্ব হলো ভাষার সুষ্ঠু ব্যবহার-পদ্ধতি শেখানো। বাঙলা ভাষার কোনো বিশ্লেষণাত্মক ব্যাকরণ নেই, আছে অনুশাসনমূলক ব্যাকরণ। অনুশাসনমূলক ব্যাকরণগুলো এতো ত্রুটি-পূর্ণ যে, ও-গুলো আমাদের কিছুই শিক্ষা দেয় না। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনে একটি ইউটোপিয়ান আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তা হলো ব্যাকরণ ভাষার সব কিছু ব্যাখ্যা করে দেবে। অর্থাৎ আমরা অনেকে বাঙলা ভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণ চাই। প্রতিটি ভাষার নিয়মাবলী এতো প্রচুর যে, সম্পূর্ণ ব্যাকরণ রচনা কারো একক প্রচেষ্টায় কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমরা অনেকদিন ধরে বাঙলা ভাষার একটি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ (বই) কামনা করে আসছি। এ কামনা পোষণ করেছেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এবং যে কোনো ভাষাসচেতন বাঙালি। কিন্তু কারোই স্পষ্ট ধারণা নেই, আমাদের সে আকাঙ্ক্ষিত ব্যাকরণ বইটি কেমন হবে, কারোই ধারণা নেই, তাতে কি থাকবে। আমার ব্যক্তিগত বোধ হলো

বাঙালিরা কামনা করে একটি চমৎকার অনুশাসনমূলক ব্যাকরণ, যে বই তাদের সুষ্ঠুভাবে ভাষা ব্যবহার করতে শেখাবে। কিন্তু ও-আকাঙ্ক্ষিত পরম গ্রন্থ ছাড়াই বাঙালি এতোদিন চমৎকারভাবে ভাষা ব্যবহার করে এসেছে, কারো কাছে যেতে হয়নি বিশুদ্ধ বাঙলা শিখতে। অধিকাংশ বাঙালিই যে আজ অশিষ্ট বাঙলা ব্যবহার করেও দৈনন্দিন জীবনে কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে না, এই বলে দেয় যে, আমরা আকাঙ্ক্ষিত ব্যাকরণ বইটির জন্যে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে পারি। আমাদের যা এখানে প্রয়োজন, তা হলো একটি ভালো বিশ্লেষণাত্মক ব্যাকরণ বই, যা আমাদের কাছে আমাদের ভাষাকে ব্যাখ্যা করে দেবে—প্রস্তাবিত এ বিশ্লেষণাত্মক ব্যাকরণে কি থাকবে?

আমার প্রস্তাবিত এ ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনার আগে ভাষার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। ভাষার কয়েকটি স্তর রয়েছে, ও-স্তরগুলো পরস্পর সম্মিলিত হয়ে ভাষাকে একটি প্রাণীদেহের তুল্য করে তোলে। কোনো জটিলতায় প্রবেশ না করে বলা যায়, ভাষার একটি উচ্চারিত রূপ আছে, একটি বাক্যগঠনের স্তর রয়েছে, একটি শব্দগঠনের স্তর রয়েছে, একটি অর্থবোধের স্তর রয়েছে, এবং ভাষাকে লিখিত রূপও দেয়া যায়। ভাষার যে দিকটি আমাদের ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন করে তোলে, সেটি হলো ভাষার ধ্বনির দিক বা উচ্চারণের দিক। উদাহরণস্বরূপ একটি বাক্য নেয়া যাক।

(১) জানালাটি খুলে গেছে।

একটি বাক্যের লিখিত রূপ উপরে দেয়া হয়েছে, এবং এর একটি উচ্চারিত রূপ রয়েছে। এ বাক্যটি তৈরি করা হয়েছে একটি বিশেষ নিয়মের দ্বারা, এবং এর অর্থ আমরা বুঝি বিশেষ একটি নিয়মের দ্বারা। দেখা যাচ্ছে, অতি তুচ্ছ উপরের বাক্যটির পেছনে রয়েছে অর্থের নিয়ম, বাক্যগঠনের নিয়ম (এবং শব্দগঠনের নিয়ম), ধ্বনিগঠনের ও উচ্চারণের নিয়ম। যেহেতু এসব নিয়ম ব্যতীত আমরা বাক্যটিকে তৈরি করতে পারি না, সেহেতু ব্যাকরণের আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত:

(২) ক বাক্যগঠন কৌশল (বাক্যতত্ত্ব)
খ অর্থবিশ্লেষণ কৌশল (অর্থতত্ত্ব)
গ শব্দগঠন কৌশল (রূপতত্ত্ব)

ঘ ধ্বনিসংগঠন কৌশল ও উচ্চারণ কৌশল (ধ্বনিতত্ত্ব ও উচ্চারণতত্ত্ব)

ঙ লিপিকৌশল (লিপিতত্ত্ব)

ভাষা এক অতি ব্যাপক বস্তু, এবং উপরে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপকতাও অসামান্য। তাই কোনো ভাষারই সম্পূর্ণ রূপ বিশ্লেষণ যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য। তাই এককভাবে কারো পক্ষে যা করা সম্ভব, তা হলোঃ তিনি ভাষার প্রধান বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারেন, আর সে বিশ্লেষণের আলোকে অন্যান্য বিষয়কে আলোকিত করতে পারেন। (২) এ উল্লেখিত পঞ্চ-স্তরের মধ্যে (ঘ) এবং (ঙ) হচ্ছে ভাষার বাহ্যস্তর, এবং এদের বিশ্লেষণও সহজ। অন্য স্তর তিনটি পরস্পর সংলগ্ন, এবং এদের মধ্যে সর্বাধিক জটিল এবং প্রতারক স্তর হচ্ছে অর্থবিশ্লেষণের স্তর। ভাষাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অগ্রগতিও ভাষার অর্থ ব্যাখ্যাকে সহজ করতে পারেনি। বাক্যনির্মাণ কৌশলও বিশেষ জটিল, তবে এর কৌশল অনেকখানি উদ্‌ঘাটন করেছে রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ। বাঙলা ভাষার জন্যে যা এখন করা যেতে পারে, তা হলো একটি ব্যাপক বাক্যবিশ্লেষণাত্মক ব্যাকরণ রচনা।

নিম্নে কিছু বাঙলা বাক্যের উদাহরণ দেয়া হলোঃ

(৩) ক মেয়েটি সুন্দর।

খ যে মেয়েটি এলো, সে সুন্দর।

গ একটি মেয়ে এলো, এবং সে সুন্দর।

(৪) ক আমি জানতাম যে, তুমি আসবে।

খ আমি জানতাম, তুমি আসবে।

গ আমি এ কথা জানতাম যে, তুমি আসবে।

ঘ তুমি যে আসবে, আমি তা জানতাম।

(৫) ক * একটি গান হেঁটে এলো।

খ * ভদ্রলোক রূপসী।

গ * একটি যাচ্ছে সুন্দর।

(৩ক) একটি সরল বাক্য, এবং এ সরল বাক্যটির সাথে অর্থের মিল রয়েছে অসরল (৩খ, গ) এর। কিভাবে এরা তৈরী হয়েছে, কোথায় এদের মিল, কোথায় অমিল? (৩খ) হচ্ছে একটি সম্বন্ধাত্মক বাক্য (Relative Clause Sentence) আর (৩গ) হচ্ছে একটি যুগ্ম বাক্য (Coordinate Sentence)। আমরা

বোধ করি যে, (৩)-এর বাক্যগুলোর আপাত বৈসাদৃশ্যের গভীরে কোথাও মিল রয়েছে। ব্যাকরণ তা ব্যাখ্যা করতে পারে। (৪)-এর বাক্যগুলো অভিন্নার্থক, বলা যায়, এরা আসলে বিভিন্ন রূপে একই বাক্য। এখানে সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ার সহায়ে একবাক্যে অপর বাক্য গ্রথিত করে জটিল বাক্য রচিত হয়েছে। (৫)-এর বাক্য তিনটি ব্যাকরণসম্মত নয়, তবে এদের ব্যাকরণ বৈরিতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। (৫ক) বাক্যটিকে বাক্য-নির্মাণ কৌশলের নিয়মানুসারে অশুদ্ধ বলা যায় না, এটি বাঙলা বাক্যের স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত। এটির যা ত্রুটি, তা অর্থে, অর্থাৎ এটি একটি অস্বাভাবিক বাক্য। তবে একে আমরা রূপকার্থে ব্যাখ্যা করতে পারি, বা এটি নির্ভুল স্বাভাবিক বাক্য হতে পারে তার কাছে, যে অন্যরকম বাস্তবলোকের অধিবাসী। তার চেতনায় গানও বিচরণশীল রক্তমাংসময়। বাঙলা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে (৫খ) একটি ব্যাকরণ অসংগত বাক্য। এখানে স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক বিশেষ্যপদের সাথে। তবে এরও একটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে, যাতে বাক্যটি শুধু শুদ্ধ নয় রসাত্মক বলেও বিবেচিত হবে। যদি কথিত ভদ্রলোক শোভনলোভন নারীসুলভ হন, তবে (৫খ)-কে চমৎকার বিদ্রূপ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বাক্যটি আর ব্যাকরণ-অসম্মত থাকে না। (৫গ) বাক্যে একটি ক্রিয়াপদকে সংখ্যাবাচক শব্দসহ বাক্যের কর্তা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তার বিধেয়পদে রয়েছে একটি বিশেষণ। বাঙলা ভাষা এরকম সংগঠনকে প্রশ্রয় দেয় না, আর বাঙালির রূপকচেতনাও একে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তাই (৫গ) পরিত্যাজ্য।

বর্তমান রচনায় বাঙলা ভাষার কোনো স্তরের কোনো অংশের বিশ্লেষণ দেয়া আমার লক্ষ্য নয়, আমার লক্ষ্য, নতুন ব্যাকরণবোধ সঞ্চার, এবং একটি বিশ্লেষণাত্মক ব্যাকরণ গ্রন্থের জন্যে কামনা জ্ঞাপন।। আমার কাম্য ব্যাকরণ সকলের পাঠ্য হবে না, কোমলমতি বালক-বালিকাদের তা কোনো আশু সাহায্য করবে না, কিন্তু তা বাঙলা ভাষার সমস্ত জটিলতাকে, গূঢ় প্রক্রিয়াকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবে। এবং সে ব্যাকরণ থেকে একদিন আমরা তৈরি করে নিতে পারবো স্কুলপাঠ্য প্রীতিকর ব্যাকরণ, অফিসের ব্যবহারিক ব্যাকরণ, আর ভাষাশিক্ষার্থীর অনুশাসনমূলক ব্যাকরণ। সে ব্যাকরণ বাঙালিদের সামনে এমন এক জটিল গভীর মায়াময় রাজ্যের দ্বার খুলে দেবে যার নাম বাঙলা ভাষা।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নোবেল বক্তৃতা

আবুল কাসেম ফজলুল হক অনূবাদিত

["বিভিন্নমুখী এবং তাৎপর্যপূর্ণ রচনার মাধ্যমে লোকহিতকর আদর্শ ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ সংগ্রামীর ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি হিসেবে" বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে (১৮৭২-১৯৭০) সুইডিশ একাডেমি ১৯৫০ সনে নোবেল পুরস্কার (সাহিত্য) প্রদান করেন। ১৯৫০ সনের ১১ই ডিসেম্বর এই পুরস্কার-অনুষ্ঠানে রাসেল 'রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি-প্রবৃত্তি' বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন, নীচের রচনাটি তারই অনুবাদ। রাসেলের জীবনদৃষ্টি ও বক্তব্যের অনুসারী না হয়েও এবং এই বক্তৃতার অনেক বক্তব্য যে খণ্ডণযোগ্য তা জেনেও এটি অনুবাদ করেছি এই বিবেচনায় যে, এতে জীবন ও সমাজের এমন এক দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে যে-দিকটি একদা আমাদের দেশে সামাজিক অগ্রগতির আন্দোলনে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়ে থাকলেও সাম্প্রতিক কালে আর হয় না। আমার ধারণা, বাংলাদেশে যাঁরা উন্নততর নতুন জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তায় ও কর্মে নিয়োজিত, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা সত্ত্বেও এ বিষয়টির প্রতিও তাঁদের দৃষ্টি প্রদান জরুরি। বর্তমান অনুবাদ হয়তো এ কাজে সহায়ক হতে পারে—এই ধারণা বশেই এটি অনুবাদ করেছি।]

রাজনীতি ও রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কিত আজকালকার আলোচনায় মনোজগতের বিষয়াদি খুব সামান্যই বিবেচনা করা হয় বলে আমার ধারণা। এজন্যই আজ রাতের বক্তৃতার বিষয় হিসেবে এ বিষয়টি আমি বেছে নিয়েছি। অর্থনৈতিক ঘটনাবলি, জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলি, সাংবিধানিক সংগঠন এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়। কোন অসুবিধাই হয় না, কোরিয়ান যুদ্ধের সময় উত্তর কোরিয়ার ও দক্ষিণ কোরিয়ার লোকসংখ্যা কত ছিল, তা খুঁজে বের করতে। আপনারা যদি ঠিক ঠিক বইগুলোতে খোঁজ করেন তাহলে সহজেই জানতে পারবেন, তাদের মাথাপিছু গড় আয় কত ছিল এবং তাদের কোন্ পক্ষের সেনাবাহিনীতে

সৈন্যসংখ্যা কত ছিল। কিন্তু আপনাদের যদি জানার দরকার হয়: একজন কোরিয়ান কি প্রকৃতির লোক এবং একজন উত্তর কোরিয়ান ও একজন দক্ষিণ কোরিয়ানের মধ্যে সত্য সত্যই কোন পার্থক্য আছে কি-না; যদি আপনারা জানতে আগ্রহী হন: তাদের মধ্যে কোন্ পক্ষের জীবনদৃষ্টি কি, তাদের অসন্তোষ কি কি, আশা কি কি, ভয় কি কি?—এক কথায় তাদের ভাষায় যা তাদের 'স্পন্দিত করে' তা কি—তাহলে তথ্যাদির জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থগুলোতে আপনাদের আদ্যন্ত অনুসন্ধান অনর্থক হবে। আর সে-জন্যই আপনারা বলতে পারেন না, দক্ষিণ কোরিয়ানরা জাতিসংঘে স্থান পেতে উদগ্রীব,—নাকি তারা তাদের উত্তর কোরিয়ান ভাইদের সঙ্গে একত্রিত হওয়াকেই উৎকৃষ্টতর মনে করবে। আর আপনারা অনুমানও করতে পারেন না, তারা নামও শুনেনি এমন কোন রাজনীতিকের ভোট পাওয়ার সুবিধার জন্য তারা ভূমি-সংস্কারের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে সম্মত কি-না। এসব প্রশ্নের প্রতি দূরবর্তী রাজধানীতে অবস্থানকারী বিখ্যাত ব্যক্তিদের অবহেলাই প্রায়শ হতাশার কারণ ঘটায়। রাজনীতিকে যদি বিজ্ঞানসম্মত করতে হয়, আর পরিণামকে যদি সব সময় বিস্ময়কর দেখতে না হয়, তাহলে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাকে মানবিক কার্যকলাপের মূল উৎসের আরও গভীরে প্রবেশ করানো একান্ত দরকার। শ্লোগানের উপর ক্ষুধার প্রভাব কি? আপনাদের খাদ্যে কেলোরির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগানের কার্যকারিতার উত্থান-পতন কি রকম? এক ব্যক্তি যদি আপনাকে গণতন্ত্র দেওয়ার প্রস্তাব করেন এবং অপর এক ব্যক্তি যদি আপনাকে এক বস্তা খাদ্যবস্তু দেওয়ার প্রস্তাব করেন, তাহলে অনাহারের কোন্ পর্যায়ে আপনি ভোটের চেয়ে খাদ্যকে উৎকৃষ্টতর মনে করবেন? এসব প্রশ্নের বিবেচনা খুব সামান্যই করা হয়। যা-হোক, কোরিয়ানদের কথা আপাতত ভুলে গিয়ে চলুন এখন আমরা সমগ্র মানব-জাতির কথা চিন্তা করি।

[দুই]

মানুষের সকল কাজেরই মূলে থাকে প্রবৃত্তির তাড়না। কিছু সংখ্যক নৈতিকতাবাদী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা দ্বারা এই মর্মে একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন যে,

কর্তব্য ও ন্যায়-অন্যায় বিচার সংক্রান্ত নীতির খাতিরে প্রবৃত্তিকে দমন করা সম্ভব। এ তত্ত্ব সম্পূর্ণই প্রতারক। আমি যে এ তত্ত্বকে প্রতারক বলি তার কারণ এই নয় যে, কোন লোকই কোন কালে কর্তব্যবোধ থেকে কোন কাজ করে না। আমার এ কথা বলার কারণ, যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে কর্তব্য-পরায়ণ হওয়ার প্রবৃত্তি না জাগে তাহলে তার উপর কর্তব্যের কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকে না। মানুষের আচরণ সম্পর্কে যদি আপনারা জানতে চান, তাহলে আপনাদের একমাত্র, কিংবা প্রধানভাবে, মানুষের বাস্তব পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানলেই চলবে না ; অবশ্যই আপনাদের আরও জানতে হবে, মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তির গোটা প্রণালীকে, এবং সেই প্রণালীর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আপেক্ষিক শক্তিকে।

কতকগুলো প্রবৃত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও সাধারণত সেগুলোর কোন বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। প্রায় সব মানুষেরই জীবনে কোন না কোন সময় বিয়ে করার আগ্রহ জাগে। কিন্তু সাধারণত কোন রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব ছাড়াই মানুষ এই প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে এ ক্ষেত্রে ; স্যাবাইন জাতির মেয়েদের হরণ করে নেওয়ার ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আর উত্তর অস্ট্রেলিয়ার উন্নয়ন গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এই কারণে যে, যে বীর্যবান যুবকদের সেখানে কাজ করা উচিত তারা নারী-সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে চায় না। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ব্যতিক্রমই ; সাধারণত নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের প্রভাব রাজনীতির উপর খুবই সামান্য।

যেসব প্রবৃত্তি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে মুখ্য ও গৌণ, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মুখ্য ভাগে পড়ে জীবন ধারণের অপরিহার্য বিষয়গুলো : খাদ্য, আশ্রয় ও পরিধেয়। এসব জিনিস যখন একান্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে, তখন এগুলো পাওয়ার আশায় মানুষ যেভাবে চেষ্টা চালাবে কিংবা হিংসার পথে যেভাবে অগ্রসর হবে, তার কোন পরিমাপ নেই। প্রাচীন ইতিহাসের পাঠকেরা বলে থাকেন, বিভিন্ন পর্যায়ে অনাবৃষ্টির দরুণ চারবার আরবের লোকেরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। এই চারটি ঘটনার মধ্যে শেষেরটি হল ইসলামের অভ্যুদয়। জার্মান গোত্রসমূহের

ধীরে ধীরে রাশিয়া থেকে ইংলণ্ডে ও পরে স্যানফ্র্যান্সিস্‌কোতে ছড়িয়ে পড়ার পেছনেও একই ধরনের ঘটনা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। খাদ্যের তাড়না নিঃসন্দেহে চিরকাল বিরাট বিরাট রাজনৈতিক ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে এসেছে, এবং আজও হচ্ছে।

কিন্তু যে-একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা তা হল, মানুষের এমন কতকগুলো বৃত্তি-প্রবৃত্তি রয়েছে যেগুলো বলতে গেলে অন্তহীন, যেগুলোর পূর্ণ পরিতৃপ্তি কখনও সম্ভব নয়, এবং যেগুলো বেহেস্‌তেও মানুষকে অস্থির করে রাখবে। অতিকায় অজগর সাপ উদরপূর্তির পর ঘুমিয়ে থাকে এবং পুনরায় ক্ষুধা না লাগলে জাগে না। মানুষের প্রকৃতি কিন্তু মোটেই এ-রকম নয়। যে-আরবরা অল্প কয়েকটা খেজুর খেয়ে নিতান্ত দরিদ্র জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল তারাই যখন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্পদের অধিকারী হয়ে প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের বিলাসিতামণ্ডিত প্রাসাদে বাস করত, তখন তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি। দারিদ্র্যের জায়গায় যখন প্রাচুর্য এল, তখন আর ক্ষুধা তাদের জীবনে একটি চালিকাশক্তি হিসেবে কার্যকর থাকেনি, কারণ গ্রীক দাসেরা সামান্য ইশারাতেই তাদেরকে চমৎকার সব খাদ্য সামগ্রী এনে দিত। কিন্তু অন্যান্য প্রবৃত্তি তাদেরকে সক্রিয় রেখেছিল: সেগুলোর মধ্যে চারটির কথা নির্দিষ্টভাবে বলা যায়: সম্পদলিপ্সার, প্রতিদ্বন্দ্বিতার, নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের এবং ক্ষমতানুরাগের প্রবৃত্তি।

[তিন]

সম্পদলিপ্সা হল, যত বেশি সম্ভব সম্পদ নিজের দখলে রাখার কিংবা সম্পদের মালিকানা ভোগের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার উৎস, আমার মনে হয়, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি না পাওয়ার ভয় এবং অর্জনের তাগিদ—একই সঙ্গে এই উভয়ের মধ্যেই নিহিত। আমি একবার ইস্টোনিয়ার দু'টি ছোট্ট মেয়েকে সাহায্য করেছিলাম। মেয়ে দু'টি মন্বন্তরের সময় অন্নের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছিল। তারা আমার পরিবারে বাস করত এবং অবশ্যই তারা প্রচুর খেতে পেত। কিন্তু তারা তাদের সমস্ত অবসর সময় কাটাত পার্শ্ববর্তী শস্যক্ষেত্রে ঘোরাফেরা করে, আলু চুরি করে। আলুগুলো তারা জমা করত।

রকফেলার শৈশবে চরম দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তী জীবনটাও তিনি কাটিয়েছেন একইভাবে। তেমনি আরব সর্দাররা রেশমি বাইজেনটাইন ডিভানের উপর বসেও মরুভূমির কথা ভুলতে পারেনি, এবং তারা জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যত সম্পদ সম্ভব, তার চেয়েও বহুগুণ সম্পদ মজুদ করেছিল। সম্পদলিপ্সার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যাই হোক, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না যে, অধিক শক্তিশালী প্রবৃত্তি-সমূহের মধ্যে এটা একটা প্রধান প্রবৃত্তি। আর এ-কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, এটা হল মানুষের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা নিচয়েরই একটা। যত বেশিই আপনি অর্জন করুন না কেন, সব সময়ই আরও বেশি আপনি অর্জন করতে চাইবেন। সম্পূর্ণ পবিতৃপ্তি হল এক স্বপ্ন, আর এই স্বপ্ন সব সময় আপনাকে ছলনা করবে।

সম্পদলিপ্সা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রধান চালিকাশক্তি। কিন্তু ক্ষুধাকে জয় করার পর মানুষের যেসব প্রবৃত্তি সজাগ থাকে, সেগুলোর মধ্যে এটি কোনক্রমেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রবৃত্তি নয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাড়না অনেক বেশি শক্তিশালী। মুহাম্মদীয়দের ইতিহাসে রাজবংশগুলো যে-কারণে বার বার দুর্দশায় পতিত হয়েছে তা হল: কোন সুলতানের বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা একমত হতে পারেনি, ফলে দেখা দিয়েছে গৃহযুদ্ধ, আর গৃহযুদ্ধের ফলে এসেছে সার্বিক ধ্বংস। একই ধরনের ঘটনা আধুনিক ইউরোপেও ঘটছে। ব্রিটিশ সরকার যখন নিতান্ত অবিবেচকের মত জার্মান সম্রাটকে নৌবাহিনী পরিদর্শনে স্পিটহেডে উপস্থিত হতে অনুমতি দিল, তখন তাঁর মনে যে চিন্তা জাগল, তা আমাদের অভিপ্রেত ধারণা থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন। তিনি যা চিন্তা করলেন তা হল, "আমারও অবশ্যই বড় মামার নৌবাহিনীর মত একটা নৌবাহিনী থাকতে হবে।" এই চিন্তাই আমাদের পরবর্তী দুর্দশার উৎস। সম্পদলিপ্সা যদি সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাড়না থেকে শক্তিশালী হত, তাহলে পৃথিবী বর্তমানের চেয়ে অনেক সুখের স্থান হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক লোকই সানন্দে দারিদ্র্য বরণ করে নেবে যদি তার বিনিময়ে তারা প্রতিদ্বন্দ্বির সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটাতে পারে। এ মনোবৃত্তির কারণেই করভার বর্তমান পর্যায়ে পৌঁচেছে।

নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষা হল একটি অপরিসীম

শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষা। শিশুদের নিয়ে যাঁদের ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁরা জানেন, কেমন করে শিশুরা সব সময় অদ্ভুত কিছু করতে থাকে এবং বলতে থাকে, "আমার দিকে তাকাও"। "আমার দিকে তাকাও"-এর প্রবৃত্তি হচ্ছে মানব-হৃদয়ের একটি অত্যন্ত মৌলিক প্রবৃত্তি। ভাঁড়ামি থেকে আরম্ভ করে মরণোত্তর খ্যাতি অর্জনের প্রয়াস পর্যন্ত অসংখ্য রূপে এই প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটতে পারে। রেনেসাঁস কালের ইটালির এক ক্ষুদ্র নৃপতিকে মৃত্যুশয্যায় যাজক জিজ্ঞেস করেছিলেন, অনুশোচনা করার মত তাঁর কিছু আছে কি-না। নৃপতি বলেছিলেন, "হাঁ, একটি বিষয় আছে। একবার এক অনুষ্ঠানে আমি একসঙ্গে সম্রাট এবং পোপ উভয়েরই সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম। তখন আমি তাঁদেরকে নিয়ে দৃশ্য দেখার জন্য আমার সুউচ্চ দুর্গের শীর্ষে গিয়েছিলাম, এবং তাঁদের উভয়কে নিচে ফেলে দেওয়ার সুযোগ তখন হেলায় হারিয়েছিলাম। তখন যদি আমি তাঁদেরকে নিচে ফেলে দিতাম, তাহলে আমি অমর খ্যাতির অধিকারী হতাম।" ইতিহাসে বর্ণিত নেই যাজক তাঁর পাপমুক্তির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন কি-না। নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবৃত্তি নিয়ে একটা অসুবিধা হল এই যে, যে-কোন দিক থেকে প্রশংসার ইন্ধন পেলেই তা আরও বেশি করে জ্বলে উঠতে থাকে। আপনার সম্পর্কে যতই আলোচনা হয়, আপনি ততই আরও বেশি করে আলোচিত হতে চান। ঘৃণ্য হত্যাকারীকে যদি তার বিচারের বিবরণ খবরের কাগজে দেখতে দেওয়া হয়, তাহলে কোন কাগজে তার রিপোর্ট কম উঠেছে দেখলে সে রাগান্বিত হয়, আর অন্যান্য কাগজে নিজের সম্পর্কে যতই সে বেশি উল্লেখ দেখতে পায় ততই ঐ কম-বিবরণ-দানকারী কাগজের প্রতি তার রাগ বাড়তে থাকে। রাজনীতিকদের আর কবি-সাহিত্যিক-লেখকদের বেলায়ও এই রকমই ঘটে থাকে। যতই তাঁরা বিখ্যাত হতে থাকেন, প্রেসকাটিং সংস্থাগুলো তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ততই বেশি করে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তিন বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে যার ভ্রূকুটিতে দুনিয়া প্রকম্পিত হয় সেই ক্ষমতাবান পর্যন্ত সকলের জীবনেই নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বাসনা এত প্রবল যে তার কোন প্রকার অতিরঞ্জন অসম্ভব। মানবজাতি এমনকি এমন ধর্ম-বিগর্হিত কাজও করেছে যে, দেবতাকে পর্যন্ত এই প্রবৃত্তির শিকার বানিয়েছে : দেবতাকে সর্ব মুহূর্তে প্রশংসালোলুপ রূপে কল্পনা করেছে মানুষ।

আমাদের আলোচিত মানবজীবনের এইসব চালিকাশক্তি প্রবল। কিন্তু

এসবের তাড়না যত প্রবলই হোক, এগুলোর বাইরে আর একটি প্রবৃত্তি রয়েছে যা এই সবগুলোর চেয়েই শক্তিশালী। তা হল ক্ষমতানুরাগ। নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রবণতার সঙ্গে ক্ষমতানুরাগের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু কোনক্রমেই এ দু'টি সম্পূর্ণ এক জিনিস নয়। নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় যশ বা খ্যাতির, আর ক্ষমতা ছাড়াই খ্যাতি অর্জন সহজ। যুক্তরাষ্ট্রে যারা সবচেয়ে বেশি যশের অধিকারী তারা হল চিত্রতারকা। কিন্তু 'কমিটি ফর আন-অ্যামেরিকান একটিভিটিজ'-এর মত মর্যাদাহীন প্রতিষ্ঠানও চিত্রতারকাদের খ্যাতির অবসান ঘটাতে পারে। ইংলণ্ডে রাজার গৌরব প্রধান মন্ত্রীর চেয়ে বেশি কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা রাজার চেয়ে বেশি। অনেক লোক ক্ষমতার চেয়ে যশ বা খ্যাতিকে বেশি মূল্যবান মনে করেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তুলনায় যাঁরা যশের চেয়ে ক্ষমতাকে বেশি দাম দেন, ঘটনাপ্রবাহের উপর তাঁদের ভূমিকাই বেশি কার্যকর হয়। ১৮১৪ সনে ব্লুচার নেপোলিয়নের প্রাসাদগুলো দেখে বলেছিলেন, "এত কিছুর অধিকারী হয়েও যিনি মস্কোতে অভিযান চালিয়েছিলেন তিনি কী বোকাই না ছিলেন।" নেপোলিয়ন অবশ্যই নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে নিতান্ত ব্যর্থ ছিলেন না; তবু পছন্দ করার সময় তিনি ক্ষমতাই পছন্দ করেছিলেন। ব্লুচারের কাছে এই পছন্দটাকে বোকামি মনে হয়েছে। নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষার মত ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষারও পূর্ণ পরিতৃপ্তি কখনও সম্ভব নয়। একমাত্র সর্বশক্তিমান হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়েই এই প্রবৃত্তির পূর্ণ পরিতুষ্টি ঘটতে পারে না। আর যেহেতু প্রবলভাবে সক্রিয় লোকদের মধ্যেই বিশেষ করে এই দোষ দেখা যায়, সেজন্যই কখনও কখনও ক্ষমতানুরাগের পরিতৃপ্তির জন্য কিছু কিছু ফল দেখা গেলেও, এই প্রবৃত্তি যেভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তার সঙ্গে তুলনায় সেই ফল এতই সামান্য যে, দু'য়ের মধ্যে কোন প্রকার তুলনাই করা চলে না। গুরুত্বপূর্ণ লোকদের জীবনে অন্যান্য আকাঙ্ক্ষার তুলনায় নিঃসন্দেহে এই আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে শক্তিশালী।

ক্ষমতা উপভোগের অভিজ্ঞতা ক্ষমতানুরাগকে খুবই বাড়িয়ে দেয়। এ কথা ক্ষুদ্র ক্ষমতার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি বিরাট রাজকীয় ক্ষমতার বেলায়ও প্রযোজ্য। ১৯১৪ সনের পূর্ববর্তী সুখের দিনগুলোতে স্বচ্ছল মহিলারা বিরাট একদল চাকর রাখতে সক্ষম হতো। সে অবস্থায় বয়স বাড়ার

সঙ্গে সঙ্গে পরিবারিক ব্যাপারাদিতে ক্ষমতা খাটানোর আনন্দ তাঁদের অবিচল-ভাবে বেড়ে যেত। একইভাবে যে-কোন স্বৈরাচারী সরকারের ক্ষমতার অধিকারীরা ক্ষমতা উপভোগের অভিজ্ঞতাজাত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হারে অত্যাচারী হয়ে ওঠে। মানুষের উপর ক্ষমতা দেখানোর উপায় হল, মানুষ যা করতে চায় না, তা করতে তাদের বাধ্য করা। এজন্যই যে-লোক শুধুই ক্ষমতার বাসনা দ্বারা চালিত, সে দুঃখ দেওয়াতে যতটা নিপুণ, আনন্দ অনুমোদনে কখনও ততটা উদার নয়। কোন বৈধ কারণে অফিসে অনুপস্থিত থেকে যদি আপনি আপনার উপরওয়ালার কাছে ছুটি চান, তাহলে তাঁর ক্ষমতার বাসনা সম্মতি দেওয়ার চেয়ে অসম্মতি প্রদানে বেশি পরিতৃপ্ত হবে। আপনি যদি দালান তোলার অনুমতি চান, তাহলে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদে-আমলা স্পষ্টতই 'হ্যাঁ' বলার চেয়ে 'না' বলে বেশি আনন্দ পাবে। এই ধরনের বিষয়গুলোই ক্ষমতার বাসনাকে এত বিপজ্জনক প্রবণতায় পরিণত করে।

কিন্তু ক্ষমতানুরাগের অন্য দিকও রয়েছে যা বেশি অভিপ্রেত। আমি মনে করি, জ্ঞানানুশীলনের পেছনে ক্ষমতার বাসনাই প্রধান চালিকাশক্তি। একথা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সকল অগ্রগতি সম্পর্কেও খাটে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও একজন সংস্কারকের ঠিক একজন স্বৈরাচারীর মতই ক্ষমতানুরাগ থাকতে পারে। ক্ষমতার বাসনা মাত্রকেই একটি সম্পূর্ণ দোষণীয় প্রবণতা বলে সিদ্ধান্ত করলে তা সম্পূর্ণ ভুল হবে। এই বাসনা দ্বারা আপনি ভাল কাজে পরিচালিত হবেন, না খারাপ কাজে পরিচালিত হবেন, তা নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার উপর এবং আপনার অন্তঃস্থিত সামর্থ্যের উপর। আপনার সামর্থ্য যদি তাত্ত্বিক কিংবা প্রকৌশলগত হয়, তাহলে আপনি জ্ঞান কিংবা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অবদান রাখবেন এবং সাধারণভাবে আপনার কাজ মঙ্গলকর হবে। আপনি যদি রাজনীতিক হন তাহলে আপনি ক্ষমতার বাসনা দ্বারা পরিচালিত হতে পারেন; তবে সাধারণত আপনার এই বাসনা এমন কিছু কাজ করার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও যুক্ত হবে যাকে কোন না কোন কারণে আপনি প্রচলিত অবস্থার চেয়ে উৎকৃষ্টতর অবস্থা সৃষ্টির উপায় বলে মনে করেন। এল্‌সি-বিএড্‌স্-এর মত বিরাট জেনারেল কোন্ পক্ষে যুদ্ধ করবেন সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারেন; কিন্তু প্রায় সকল জেনারেলই নিজের দেশের পক্ষে যুদ্ধ করাকে উৎকৃষ্টতর মনে করেছেন এবং সে-জন্যই ক্ষমতার বাসনা ছাড়া

অন্য বাসনাও তাঁদের ছিল। কোন রাজনীতিবিদ সব সময় নিজেকে সংখ্যাধিক্যের মধ্যে দেখার জন্য ঘন ঘন দল বদল করতে পারেন; কিন্তু প্রায় সকল রাজনীতিকই এক দলের চেয়ে অন্য দলকে উৎকৃষ্টতর মনে করেন এবং তাঁদের ক্ষমতার বাসনাকে এই পছন্দের অধীনে রাখেন। ক্ষমতার বাসনাকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত অবস্থায় নানা ধরনের বিভিন্ন লোকের মধ্যে দেখা যেতে পারে। এক ধরনের লোক বেশি বেতন বা পদোন্নতির জন্য যে-কোন জায়গায় কাজ করতে উদগ্রীব: নেপোলিওন এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমি মনে করি কর্সিকার চেয়ে ফ্রান্সের প্রতি নেপোলিওনের কোন আদর্শগত অনুরাগ ছিল না, কিন্তু তিনি যদি কর্সিকার সম্রাট হতেন তাহলে একজন ফরাসি হিসেবে ভাণ করে তিনি যত খ্যাতিমান হয়েছিলেন তত বিখ্যাত হতে পারতেন না। এই ধরনের লোকেরাও অবশ্য সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ উদাহরণ নয়, কারণ এরাও নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের দ্বারা প্রচুর তৃপ্তি লাভ করেন। সবচেয়ে বিশুদ্ধ উদাহরণ হল 'ছদ্ম' ক্ষমতার উদাহরণ। সিংহাসনের পশ্চাতে অবস্থানকারী এই ক্ষমতা কখনও জনসমক্ষে উপস্থিত হয় না, এবং মনের কোণে সংগোপনে কেবল এই রকমভাবে: "কারা সুতো টানছে সে সম্পর্কে এই পুতুলেরা কত সামান্যই না জানে।" এক্ষেত্রে নিখুঁত উদাহরণ হলেন ব্যারন হলস্টিন, যিনি ১৮৯০ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জার্মান সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি একটি বস্তিতে বাস করতেন। তিনি কখনও সমাজের সামনে উপস্থিত হতেন না। তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলতেন। একবারই কেবল সম্রাটের পীড়াপীড়ি এড়াতে না পেরে তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি দরবারের সকল আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন এই বলে যে, তার কোন দরবারি পোশাক নেই। তিনি গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার ফলে চ্যান্সেলর ও সম্রাটের ঘনিষ্ট সহচরদের গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ রাখার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তিনি ব্লাক মেইলের এই ক্ষমতা ব্যবহার করতেন সম্পদ কিংবা খ্যাতি অর্জনের জন্য নয়, কিংবা অন্য কোন নগদ সুবিধা লাভের জন্যও নয়, তিনি সে ক্ষমতার ব্যবহার করতেন কেবল তাঁর পছন্দমত পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণে বাধ্য করার জন্য। প্রাচ্যে খোঁজাদের মধ্যে এই ধরনের চরিত্র নেহাৎ দুষ্প্রাপ্য ছিল না।

এবার আমি অন্য কতকগুলো প্রবণতার কথায় আসছি। যেসব প্রবণতার কথা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি সে-সবের তুলনায় এগুলো কম মৌলিক। তবু এগুলোও উল্লেখযোগ্য গুরুত্বের অধিককারী। এগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসে উত্তেজনাপ্রীতির কথা। মানুষ যে জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার একটা প্রমাণ, মানুষের একঘেয়েমিজনিত বিরক্তিবোধের ক্ষমতা। চিড়িয়াখানায় নরবানরদের পরীক্ষা করতে গিয়ে কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে যে তাদের মধ্যেও এই অনুভূতির—ক্লান্তিবোধের—প্রাথমিক উপাদান বর্তমান। তাদের মধ্যে এই অনুভূতি থাকুক অথবা না থাকুক, অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের প্রবৃত্তি প্রায় সকল মানুষেরই একটি যথার্থ শক্তিশালী প্রবৃত্তি। সাদা মানুষেরা যখন কোন বর্বর বন্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন তারা তাদেরকে যিশুর বাণীর আলো থেকে আরম্ভ করে মাংস ও ফল দিয়ে তৈরি পিঠা পর্যন্ত সকল প্রকার সুবিধা দানের প্রস্তাব করে। আমরা এর জন্য যতই দুঃখ করি না কেন, অধিকাংশ বর্বর জাতিই ঔদাসীন্যের সঙ্গে এগুলো গ্রহণ করে। আমরা যেসব উপহার তাদের সামনে হাজির করি, সেগুলোর মধ্যে উত্তেজনাকর মদকেই তারা যথার্থ মূল্য দেয়। এই মদই জীবনে প্রথমবারের মত কিছুক্ষণের জন্য তাদেরকে এই ভ্রম অনুভবে সামর্থ করে যে, নির্জীব থাকার চেয়ে সজীব থাকা উৎকৃষ্টতর। রেড্ ইণ্ডিয়ানরা সাদা মানুষদের সংস্পর্শে আসার আগে পাইপের সহায্যে ধূম পান করত। আমরা যেমন শান্তভাবে ধূমপান করি সেভাবে নয়, উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল হৈচৈপূর্ণ উৎসবে এত গভীর টানে তারা ধূমপান করত যে একেবারে মূর্ছিত হয়ে পড়ত। নিকোটিনের দ্বারা উত্তেজনা যখন আর সম্ভব হত না তখন কোন দেশপ্রেমিক বক্তা তাদেরকে পার্শ্ববর্তী গোত্রের উপর আক্রমণ চালাতে উত্তেজিত করত। আমাদের মেজাজ অনুযায়ী আমরা ঘোড়দৌড় কিংবা সাধারণ নির্বাচন থেকে যে আনন্দ পাই, এ থেকে তারা ঠিক সেই আনন্দই লাভ করত। জুয়া খেলার আনন্দও প্রায় সম্পূর্ণই উত্তেজনার মধ্যে নিহিত। শীতকালে চীনের মহাপ্রাচীরে অবস্থানকারী চীনা ব্যবসায়ীদের বর্ণনা দিয়ে মশিঁয়ে হাক লিখেছেন: জুয়া খেলে তারা সমস্ত টাকাকড়ি হারত, তারপর তারা বাজি রেখে রেখে সমস্ত

পণ্যদ্রব্য শেষ করত, এবং অবশেষে জুয়া খেলে তারা পরণের কাপড় পর্যন্ত হেরে উলঙ্গ হয়ে ঠাণ্ডায় মারা যাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ত আমার মনে হয়, আদিম রেড ইণ্ডিয়ান গোত্রগুলোর বেলায় যেমন, সভ্য মানুষদের ক্ষেত্রেও তেমনি—উত্তেজনাপ্রীতির জন্যই যুদ্ধের সূচনা হলে জনসাধারণ সরবে তা সমর্থন করে। আবেগটা ঠিক ফুটবল প্রতিযোগিতার আবেগের মতই, তবে ফল কখনও কখনও গুরুতর হয়।

উত্তেজনাপ্রীতির মূল কারণ কি, তা নির্ণয় করা মোটেই সহজ নয়। আমার কখনও কখনও মনে হয় যে, আমাদের মানসিক গড়ন, মানুষ যখন শিকারের দ্বারা জীবিকা সংস্থান করত, তখনই বর্তমান পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। মানুষ যখন আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে খাবারের আশায় সারাদিন হরিণের পেছনে সংগোপনে ধাওয়া করত এবং যখন দিনের শেষে সে বিজয়ীর মত হরিণের মৃতদেহ টেনে নিয়ে গুহায় উপস্থিত হত, তখন সে সন্তোষভরা ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হত আর তার স্ত্রী মাংস তৈরি করে রান্না করত। সে তখন নিদ্রালু, তার হাড়ে সামান্য ব্যথা এবং রান্নার গন্ধ তার চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহমান। অবশেষে খাওয়ার পর সে ঘুমে মগ্ন হত। এই ধরনের জীবনে একঘেঁয়েমিজনিত ক্লান্তির কোন সময় অথবা শক্তি অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু যখন সে কৃষিকার্য অবলম্বন করল এবং তার স্ত্রীকে মাঠের সকল কঠিন কাজে পাঠাল, তখন সে মানবজীবনের অসাড়তা সম্পর্কে চিন্তা করার সময় পেল—সময় পেল পুরাণ সৃষ্টির, দার্শনিক চিন্তাধারা উদ্ভাবনের, আর সেই পার-লৌকিক জীবনের স্বপ্ন দেখার, যে-জীবনে সে অনন্তকাল চিরশান্তিতে বাস করবে। আমাদের মানসিক গড়ন অত্যন্ত কঠোর শারীরিক শ্রমের জীবনের উপযোগী। আমার বয়স যখন কম ছিল তখন ছুটির দিনগুলোতে আমি হাঁটতাম। আমি দিনে পঁচিশ মাইল হাঁটতাম এবং যখন সন্ধ্যা হত তখন একঘেঁয়েমিজনিত ক্লান্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আমি অন্য কিছুরই প্রয়োজন অনুভব করতাম না, কারণ শুধু বসে থাকার আনন্দই আমার পক্ষে যথেষ্ট হত। কিন্তু আধুনিক জীবন এই রকম শারীরিক শ্রমসাধ্য নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। অধিকাংশ কাজই বসে বসে করতে হয় এবং প্রায় সকল শারীরিক শ্রমের কাজের দ্বারাই বিশেষ কয়েকটি পেশীর অনুশীলন হয় মাত্র। সরকার জনসাধারণকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—এ জাতীয় কোন ঘোষণার উৎফুল্ল প্রতিধ্বনি করার জন্য ট্রাফলগার স্কয়ারে যে জনতার

জমায়েত হয়, সেই লোকেরা সকলেই যদি দৈনিক পঁচিশ মাইল করে নিয়মিত হাঁটতে অভ্যস্ত থাকত তাহলে তারা এ-রকম আচরণ করত না। যাবমুখো অবস্থার অবসানের জন্য এই নির্দেশ অবশ্য প্রযোগসাধ্য নয়। মানবজাতিকে যদি বেঁচে থাকতে হয়—যা সম্ভবত অনভিপ্রেত—তাহলে যে অব্যবহৃত শারীরিক শক্তি উত্তেজনাপ্রীতির জন্য দেয় তার নির্দোষ বহির্প্রকাশের অন্য উপায় অবশ্যই উদ্ভাবন করতে হবে। এ বিষয়টা নৈতিকতাবাদীরা কিংবা সংস্কারকেরা কেউই বিশেষ বিবেচনা করছেন না। সংস্কারকদের মত হল: বিবেচনা করার মত আরও গুরুতর বিষয় তাঁদের রয়েছে। অপরদিকে নৈতিকতা-বাদীরা উত্তেজনানুরাগের সকল অনুমোদিত বহির্প্রকাশের গুরুত্বের কথা ভেবেই গভীরভাবে অভিভূত. তাঁদের মনে যে গুরুতর চিন্তা, তা হল পাপবোধ। আমরা যদি আমাদের চোখ-কানকে বিশ্বাস করি তাহলে নৃত্যশালা, সিনেমা, নৃত্য-বাদ্য-সঙ্গীতের এই কাল—সবই দোজখে যাওয়ার এক একটি দরজা এবং আমরা যদি ঘরে বসে আমাদের পাপের কথা ভেবে ভেবে সময় কাটাই তাহলেই আমরা মহত্ত্বের পরিচয় দেব।—এই ধরনের সতর্কবাণী উচ্চারণকারী গম্ভীর লোকদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে আমি অপারগ। শয়তানের নানা রূপ আছে, কতক রূপ তরুণদের প্রতারণা করার জন্য পরিকল্পিত আর কতক রূপ বৃদ্ধ ও গুরুগম্ভীর লোকদের প্রতারণা করার জন্য পরিকল্পিত। তরুণদেরকে জীবনোপভোগে যে প্রলুব্ধ করে সে যদি শয়তান হয়, তাহলে বৃদ্ধদেরকে সেই জীবনোপভোগের নিন্দা করার জন্য যে উস্কানি দেয় সেও কি একই রকম শয়তান নয়? আর নিন্দা কি সম্ভবত নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সের পক্ষে উপযোগী উত্তেজনারই একটা রূপ মাত্র নয়? আর এই নিন্দার অভ্যাস কি সম্ভবত আফিমের মতই একটা মাদক দ্রব্য নয়—যা অভিপ্রেত ফল লাভের জন্য ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়? এই ভয়ও কি করতে হবে না যে, সিনেমার নষ্টামির নিন্দা দিয়ে আরম্ভ করে ক্রমে আমরা বিরোধী রাজনৈতিক দল, নীচ জাতের দক্ষিণ ইউরোপবাসী, জলপাই বর্ণের ইটালিয়ান, এশিয়ার অধিবাসী, ইত্যাদিরও নিন্দায় অগ্রসর হব, এবং শেষ পর্যন্ত কেবল আমাদের ক্লাবের সহযোগী সদস্যদের ছাড়া আর সকলেরই নিন্দা করব? আর এই ধরনের নিন্দাই যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন তা থেকেই যুদ্ধের সূচনা হয়। নৃত্যশালা থেকে কোন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে এমন কথা আমি কখনও শুনিনি।

উত্তেজনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, এর অনেক রূপই ধ্বংসাত্মক। মদ্যপান ও জুয়া খেলায় যারা মাত্রা বজায় রাখতে সক্ষম হয় না, তাদের বেলায় উত্তেজনা ধ্বংসাত্মক। উত্তেজনা যখন জনতার নিতান্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপের রূপ গ্রহণ করে তখন তা ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। আর সর্বোপরি উত্তেজনার পরিণতি যখন যুদ্ধের দিকে যায়, তখনই তা ধ্বংসাত্মক হয়। উত্তেজনার তাগিদ এতই গভীর যে, নির্দোষ নিষ্ক্রমণের সুযোগ না পেলেই তা এই ধরনের ক্ষতিকর বহিপ্রকাশের পথ খুঁজবে। বর্তমানে খেলাধূলার এবং শাসনতন্ত্র অনুমোদিত রাজনীতির মাধ্যমে উত্তেজনার নির্দোষ বহিপ্রকাশের উপায় আছে। কিন্তু এসব উপায় প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। আর যে ধরনের রাজনীতি আজকাল সবচেয়ে উত্তেজনাকর, তাই সবচেয়ে ক্ষতিকরও। সভ্য জীবন একান্তই শান্ত জীবনে পরিণত হয়েছে। জীবনের এই অবস্থাকে যদি স্থিতিশীল রাখতে হয় তাহলে আমাদের দূরবর্তী পূর্বপুরুষেরা শিকারের মাধ্যমে তাদের যে আবেগকে পরিতৃপ্ত করত, আমাদের সেই আবেগের পরিতৃপ্তির জন্য অবশ্যই উদ্ভাবন করতে হবে এমন পন্থা যা ক্ষতিকর নয়। অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা কম, খরগোস জাতীয় রেবিটের সংখ্যা প্রচুর। সেখানে আমি লক্ষ্য করেছি একটি গোটা সমাজের লোকেরা তাদের আদিম আবেগকে আদিম নৈপুণ্যের সঙ্গে হাজার হাজার রেবিট হত্যার মাধ্যমে পরিতৃপ্ত করছে। কিন্তু লণ্ডন অথবা নিউ ইয়র্কে আদিম প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য অন্য কোন উপায় অবশ্যই উদ্ভাবন করতে হবে। আমার মনে হয়, প্রতিটি বড় শহরেই এমন কৃত্রিম জলপ্রপাতের ব্যবস্থা করা উচিত যা থেকে মানুষ অত্যন্ত ভঙ্গুর ক্ষুদ্র নৌকায় চড়ে নিচে নামতে পারে, আর সেগুলোতে থাকা উচিত যন্ত্রের তৈরি কৃত্রিম হাঙ্গরে পূর্ণ স্নান-সরোবর। যে-লোককেই কোন প্রতিরোধসাধ্য সংঘর্ষের পক্ষে ওকালতি করতে দেখা যায়, তাকেই দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত এই কৃত্রিম দানবদের মধ্যে ফেলে দৈনিক দু-ঘন্টা করে লড়তে বাধ্য করা উচিত। আরও গুরুত্বের সঙ্গে উত্তেজনানুরাগের গঠনমূলক বহিপ্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। পৃথিবীতে আকস্মিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মুহূর্তের চেয়ে উত্তেজনাকর আর কিছুই নেই। কখনও কখনও ভাবা হয় যে, এই আনন্দের যোগ্যতা নিতান্তই স্বল্প লোকের। এ ধারণা ঠিক নয়। এই আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা আরও অনেক বেশি লোকের আছে।

অন্যান্য রাজনৈতিক প্রবণতার সঙ্গে জড়িত দুইটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত প্রচণ্ড আবেগ আছে যেগুলো মানুষের মনকে দুঃখজনকভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে : আমি ভয় এবং ঘৃণার কথা বলছি। যাকে আমরা ভয় পাই তাকে ঘৃণা করা স্বাভাবিক। আর এটাও ঠিক যে, যাকে আমরা ঘৃণা করি তাকে, সব সময় না হলেও অধিকাংশ সময়ই, ভয় পাই। আমার মনে হয়, আদিম মানুষদের বেলায় এটাকে নিয়ম হিসেবে ধরা যায় যে, যাই তাদের কাছে অপরিচিত তাকেই তারা ভয়ও পায় আর ঘৃণাও করে। তাদের নিজস্ব যূথ আছে, প্রারম্ভিক পর্যায়ে তা খুবই ক্ষুদ্র। একটি যূথের অভ্যন্তরে শত্রুতার কোন বিশেষ কারণ না থাকলে সকলেই বন্ধু। অন্যান্য যূথ তাদের সম্ভাব্য কিংবা প্রকৃত শত্রু। তাদের যূথের কোন একজন সদস্য যদি ঘটনাচক্রে যূথভ্রষ্ট হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে। ভিন্ন যূথকে সাধারণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হবে কিংবা অবস্থানুসারে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। এই আদিম যান্ত্রিক রীতিই আজও বৈদেশিক জাতির প্রতি আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে ব্যক্তি কখনও কোন দেশ ভ্রমণ করেননি, তিনি সকল বিদেশীর প্রতিই সেই মনোভাব পোষণ করবেন, যা বর্বর মানুষেরা ভিন্ন যূথের মানুষদের বেলায় করে। কিন্তু যে ব্যক্তি দেশ-ভ্রমণ করেছেন, কিংবা যিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি অধ্যয়ন করেছেন তিনি আবিষ্কার করবেন যে, যদি তাঁর যূথের উন্নতি করতে হয় তাহলে অবশ্যই তাঁদের কিছু পরিমাণে অন্য যূথের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। আপনি যদি ইংরেজ হন এবং কেউ যদি আপনাকে বলেন "ফরাসিরা আপনাদের ভাই", তাহলে আপনার সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম অভিব্যক্তি হবে "বাজে কথা। তারা কাঁধ উঁচু করে বাহাদুরি দেখিয়ে হাঁটে এবং ফরাসি ভাষায় কথা বলে। এমন কথাও শুনেছি যে তারা ব্যাঙ খায়।" তিনি যদি আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, রাশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হতে পারে ; আর যদি তাই হয়, তাহলে রাইনের সীমানা রক্ষা করার প্রয়োজন হবে ; আর যদি রাইনের সীমানা রক্ষা করতে হয়, তাহলে ফরাসিদের সাহায্য অপরিহার্য—তাহলে আপনি বুঝতে আরম্ভ করবেন, তিনি যখন বলেন যে ফরাসিরা আপনাদের বন্ধু, তখন তা দ্বারা তিনি কি বোঝান। কিন্তু যদি কোন সহযাত্রী বলে যেতেন যে, রাশিয়ানরাও আপনাদের ভাই, তাহলে যদি তিনি মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীদের দিক থেকে

আমাদের কোন বিপদের ভয় দেখাতে না পারতেন, তাহলে তিনি আপনাকে বোঝাতে সক্ষম হতেন না। যারা আমাদের শত্রুদেরকে ঘৃণা করে তাদেরকেই আমরা ভালবাসি, এবং যদি আমাদের কোন শত্রু না থাকত তাহলে খুব কম লোককেই আমাদের ভালবাসার দরকার হত।

এসব কথা অবশ্য ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ আমরা শুধু অন্য মানুষদের প্রতি মনোভাবের বিষয় বিবেচনা করি। আপনি মাটিকেও আপনার শত্রু ভাবতে পারেন, কারণ মাটি জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে অত্যন্ত কৃপণভাবে—নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। আপনি প্রকৃতিমাতাকে সাধারণভাবে আপনার শত্রু ভাবতে পারেন এবং মানবজীবনকে ভাবতে পারেন প্রকৃতিমাতার কাছ থেকে অধিক পাওয়ার জন্য একটি সংগ্রাম হিসেবে। মানুষ যদি জীবনকে এভাবে দেখত তাহলে সমগ্র মানবজাতির সহযোগিতা সহজ হয়ে উঠত। যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংবাদপত্রসমূহ এবং রাজনীতিবিদেরা এই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করতেন তাহলে মানুষকে সহজেই এই জীবনদৃষ্টির দিকে নিয়ে আসা সম্ভব হত। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশপ্রেম শিক্ষাদানে তৎপর, সংবাদপত্রগুলো উত্তেজনা জাগাতে ব্যস্ত এবং রাজনীতিবিদেরা পুনরায় নির্বাচিত হতে অস্থির। সুতরাং এ তিনের কেউই মানবজাতিকে পারস্পরিক আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কিছু করতে পারে না।

ভয়কে জয় করার দুটো উপায় আছে: একটা হল বাইরের বিপদ কমানো এবং অপরটা হল সুখ-দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকার সহিষ্ণুতা অনুশীলন। যেসব ক্ষেত্রে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য নয় সেখানে এই সহিষ্ণুতা বাড়ানো যেতে পারে আমাদের চিন্তাধারাকে ভয়ের কারণ থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে। ভয়কে জয় করা অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। ভয় মূলত অধঃপতন ঘটায় এবং সহজেই তা একটা মন-আচ্ছন্নকারী বিষয়ে পরিণত হয়। মনে ভয় থাকলে যাদেরকে ভয় করা হয় তাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ভয় সহজেই মানুষকে মাত্রাহীন নির্দয় কাজে পরিচালিত করে। নিরাপত্তার মত আর কোন কিছুরই মানুষের উপর মঙ্গলকর ক্রিয়া নেই। যুদ্ধের ভয়ের অবসান ঘটাতে পারার মত একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা গেলে অতি দ্রুত গতিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন মনোবৃত্তির অপরিসীম উৎকর্ষ সাধিত হত।

পৃথিবীতে ভয় এখন সব কিছুকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দুষ্ট কমিউনিস্ট কিংবা দুষ্ট পুঁজিবাদী—যার দ্বারাই ব্যবহৃত হোক—আণবিক বোমা ও জীবাণু বোমা ওয়াশিংটন ও ক্রেমলিনকে প্রকম্পিত রাখে এবং মানুষকে আরও রসাতলের পথে ধাবিত করে। অবস্থার যদি উন্নতি ঘটাতে হয় তাহলে অপরিহার্য প্রথম পদক্ষেপ হবে ভয় দূর করার একটা উপায় বের করা। পৃথিবী এখন বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘাতের দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত, এবং সংঘর্ষের একটি সুস্পষ্ট কারণ হল নিজেদের মতবাদের বিজয় ও অন্যদের মতবাদের পরাজয়ের আকাঙ্ক্ষা। আমার মনে হয় না যে, মূল উদ্দেশ্য এখানে আদর্শের সঙ্গে খুব একটা সম্পর্কশীল। আমি মনে করি, আদর্শ হল মানুষকে দলবদ্ধ করার একটা উপায় মাত্র, আর কার্যকর মনোবৃত্তিটা হল যে-কোন ক্ষেত্রে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে যে মনোবৃত্তি জাগে তাই। কমিউনিস্টদের ঘৃণা করার অবশ্য বিভিন্ন কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ হল আমাদের এই বিশ্বাস যে, তারা আমাদের সম্পত্তি নিয়ে নিতে চায়। কিন্তু সিঁদেল চোরেরাও তাই করে। চোরদের আমরা অনুমোদন করি না ঠিক, তবে কার্যত তাদের প্রতি আমাদের মনোভাব কমিউনিস্টদের প্রতি আমাদের মনোভাব থেকে অনেক ভিন্ন। এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ, সিঁদেল চোরেরা সমপরিমাণ আতঙ্ক সৃষ্টি করে না। কমিউনিস্টদেরকে আমাদের ঘৃণা করার দ্বিতীয় কারণ, তারা ধর্মহীন। কিন্তু চীনারা একাদশ শতক থেকেই ধর্মহীন অথচ আমরা তাদেরকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি যখন তারা চিয়াংকাইশেককে খেদিয়েছে, তখন থেকে। কমিউনিস্টদেরকে আমাদের ঘৃণা করার তৃতীয় কারণ, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এ কারণে ফ্রাঙ্কোকে ঘৃণা করার প্রয়োজন আমরা বোধ করি না। কমিউনিস্টদেরকে ঘৃণা করার আমাদের চতুর্থ কারণ হল, তারা স্বাতন্ত্র্য অনুমোদন করে না। এটা আমরা এতই তীব্রভাবে অনুভব করি যে, আমরা তাঁদেরকে অনুকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি!—এসবের কোনটাই-যে আমাদের ঘৃণার প্রকৃত ভিত্তি নয়, তা সুস্পষ্ট। তাঁদের প্রতি আমাদের ঘৃণার কারণ, তাঁদেরকে আমরা ভয় পাই এবং তাঁরা আমাদেরকে হুমকি দেয়। রাশিয়ানরা যদি এখনও গ্রীকদের গোঁড়া ধর্ম অবলম্বন করে থাকত, যদি তারা সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রাখত এবং যদি তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন সংবাদপত্র থাকত, আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে তারা যদি প্রতিদিন আমাদেরকে গালাগালি করত, তাহলেও—তাদের এখনকার মত শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী থাকলে এবং

তাদেরকে আমাদের শত্রু ভাববার মত কারণ তারা সৃষ্টি করে রাখলে—তাদেরকে আমরা ঘৃণাই করতাম। অবশ্য ঈশ্বর সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণকারীদের প্রতি বিরূপ মনোভাবও শত্রুতার কারণ হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তা যূথ-জীবনের অনুভূতিরই একটা রেশ: যে লোকের ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা ভিন্ন তার অনুভূতি অপরিচিত এবং যা অপরিচিত তাই বিপজ্জনক। প্রকৃতপক্ষে মতাদর্শ হল যূথ গড়ে তোলার একটা উপায়, আর যূথ যেভাবেই গড়ে উঠুক, মনস্তত্ত্বটা একই।

[পাঁচ]

আপনারা মনে করে থাকতে পারেন যে, আমি কেবল খারাপ প্রবণতা-সমূহের, কিংবা বড়জোর নৈতিকতার দিক থেকে নিরপেক্ষ প্রবণতাসমূহের কথাই চিন্তা করেছি। আমাদের আলোচিত এসব প্রবণতা সাধারণভাবে অধিক-তর পরার্থবাদী প্রবণতাসমূহ থেকে বেশি শক্তিশালী—এমন একটা ভীতিপূর্ণ ধারণা আমার আছে; কিন্তু আমি অস্বীকার করি না যে, পরার্থবাদী বাসনারও অস্তিত্ব আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলোও কার্যকর হতে পারে। দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের উনিশ শতকের প্রথম দিককার আন্দোলন যে পরার্থ-বাদী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং তা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়েছিল। ১৮৩৩ সনে ব্রিটিশ করদাতারা জামাইকার ভূস্বামীদেরকে তাদের দাসদের মুক্তিদানের জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে কোটি কোটি টাকা পরিশোধ করেছে তা এই আন্দোলনের পরার্থবাদিতারই প্রমাণ। তাছাড়া, এ ঘটনা দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভিয়েনার কংগ্রেসে ব্রিটিশ সরকার অন্যান্য জাতিকে দাস-প্রথা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা দানের জন্য তৈরি ছিল। এটা অতীতের উদাহরণ। কিন্তু আজকের আমেরিকায়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ মেলে। আমি অবশ্য এ সবের আলোচনায় প্রবেশ করব না, কারণ চলতি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা আমার নেই।

সহানুভূতি যে একটা অকৃত্রিম অনুভূতি এবং কখনও কখনও কোন কোন লোক যে অন্যদের দুর্দশায় কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেন, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। সহানুভূতির ফলেই গত একশ বছরে অনেক লোকহিতকর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পাগলদের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের কথা শুনলে আমরা দুঃখিত হই; এবং এখন অনেক আশ্রম আছে যেখানে পাগলদের প্রতি নির্দয় আচরণ করা হয় না। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে কয়েদিদেরকে পীড়ন করার আইন নেই, যদি কখনও তাদেরকে পীড়ন করা হয় এবং সেই পীড়ন সম্পর্কিত তথ্য ফাঁস হয়ে যায় তাহলে চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়। ওলিভার টুইস্টে অনাথদের প্রতি যে রকম আচরণের সাক্ষাৎ মেলে, সে-রকম আচরণ আমরা অনুমোদন করি না। প্রটেস্ট্যান্ট দেশগুলোতে পশুদের প্রতি নির্দয়তা অনুমোদিত নয়। এই সমস্ত উপায়েই সহানুভূতি রাজনৈতিকভাবে কার্যকর হয়েছে। যদি যুদ্ধের ভয় দূর করা হত তাহলে এর কার্যকারিতা আরও অনেক বেশি হত। সম্ভবত মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় আশা এটাই যে, সহানুভূতির পরিধি ও গভীরতা বৃদ্ধি করার উপায় উদ্ভাবিত হবে।

[ছয়]

এখন সময় হয়েছে আমাদের আলোচনার সার-সঙ্কলনের। রাজনীতির সম্পর্ক ব্যক্তির চেয়ে যূথের সঙ্গেই বেশি; এবং সেজন্যই কোন যূথের বিভিন্ন সদস্য যেসব প্রচণ্ড আবেগ একইভাবে অনুভব করতে পারে, সেগুলোই রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। সহজাত প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশের যে স্থূল যান্ত্রিক প্রণালীর উপর রাজনৈতিক সৌধ নির্মাণ করতে হয় তা হল, নিজেদের যূথের মধ্যে সহযোগিতার ও অন্য যূথের প্রতি শত্রুতার রীতি। অনেক সদস্য থাকেন যাঁরা স্বাধীনচেতা, যাঁরা সবকিছু মেনে চলেন না, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যাঁরা বিশিষ্ট—অর্থাৎ যূথের বাইরে। এই সদস্যদের অবস্থান, হয় সাধারণ স্তরের নিচে, না হয় সাধারণ স্তরের উপরে। তারা হল বোকা ও অপরাধী এবং নবী-অবতার ও

আবিষ্কারক-উদ্ভাবক। একটি বিচক্ষণ যূথ শিখবে, কেমন করে যাঁরা সাধারণ স্তরের উপরে তাঁদের বিশিষ্টতাকে সহ্য করতে হয় এবং যারা সাধারণ স্তরের নিচে তাদের প্রতি যতদূর সম্ভব কম হিংস্রতার সঙ্গে আচরণ করতে হয়।

অন্য যূথের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আধুনিক রীতি ব্যক্তিস্বার্থ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি—এ দুয়ের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি করেছে। আগের দিনে দু'টি গোত্র যখন যুদ্ধে নামত তখন একটি অপরটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করত এবং তাদের রাজ্যকে নিজেদের রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিত। বিজয়ীর দিক থেকে সমস্তটা অভিযানই হত পরিপূর্ণভাবে সন্তোষজনক। তখন হত্যাকাণ্ড সাধন কোন ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল না, আর উত্তেজনাটাও অশোভন ছিল না। সে অবস্থায় যুদ্ধ-যে লেগে থাকত, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দুঃখের বিষয়, আমাদের আবেগসমূহ এখনও এই ধরনের আদিম যুদ্ধের অনুকূল, কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত অভিযানের রূপ এখন সম্পূর্ণ পালটে গেছে। আধুনিক যুদ্ধে শত্রু-হত্যার অভিযান এখন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আপনারা যদি চিন্তা করেন, গত যুদ্ধে কতজন জার্মান নিহত হয়েছে এবং বিজয়ীরা আয়কর হিসেবে কত দিচ্ছে, তাহলে লম্বা অঙ্কের এক ভগ্নাংশে আপনারা একজন মৃত জার্মানের মূল্য নির্ণয় করতে পারবেন এবং আপনাদের কাছে তা যথাযোগ্য বলেই মনে হবে। এটা সত্য যে, প্রাচ্যে জার্মানদের শত্রুরা পরাজিত জনসাধারণকে বিতাড়িত করার এবং তাদের ভূমি দখল করে নেওয়ার সুবিধাসমূহ লাভ করেছে। পাশ্চাত্যের বিজয়ীরা অবশ্য এ রকম কোন সুবিধা অর্জন করতে পারেনি। এটা স্পষ্ট যে আধুনিক যুদ্ধ অর্থনৈতিক দিক থেকে মোটেই সুবিধাজনক ব্যবসায় নয়। দু'টি বিশ্বযুদ্ধেই অবশ্য আমাদের জয় হয়েছে, তবু যদি যুদ্ধ দু'টি না ঘটত তাহলে আমরা আরও অনেক সমৃদ্ধিশালী হতে পারতাম। মানুষ যদি আত্মস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হত, তাহলে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সহযোগিতা দেখা দিত। কিন্তু কেবলমাত্র স্বল্পসংখ্যক ঋষি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউই আত্মস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয় না। যদি আত্মস্বার্থ মানবজীবনের চালিকাশক্তি হত, তা হলে পৃথিবীতে আর কোন যুদ্ধ সংঘটিত হত না, কোন সেনাবাহিনী থাকত না, নৌবাহিনী থাকত না, আণবিক বোমা থাকত না। এমন কোন প্রচারক বাহিনীও থাকত না যারা খ-জাতির বিরুদ্ধে ক-জাতির এবং ক-জাতির বিরুদ্ধে খ-জাতির মনকে বিষিয়ে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত। বিদেশের

উৎকৃষ্টতম বইপত্র ও চিন্তা-ভাবনাও যাতে দেশের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য সীমান্তে যে আমলা বাহিনী কর্মতৎপর, তারাও থাকত না। যেখানে একটি বৃহৎ কর্মোদ্যোগ আর্থিক দিক থেকে অধিক লাভজনক সেখানে অনেকগুলো ক্ষুদ্র কর্মোদ্যোগের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য কোন শুল্ক-প্রতিবন্ধক থাকত না। প্রতিবেশীদের দুর্দশা যত তীব্র উৎকণ্ঠার সঙ্গে মানুষ কামনা করে, ততটা উৎকণ্ঠার সঙ্গে যদি তারা নিজেদের সুখ কামনা করত, তাহলে এই সব কিছুই অতি দ্রুতগতিতে ঘটত। কিন্তু আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন, এই কল্পস্বর্গের স্বপ্ন দেখে কি লাভ? নৈতিকতাবাদীরা যত্নবান হবেন যাতে আমরা সম্পূর্ণ স্বার্থপর হয়ে না পড়ি: অথচ সম্পূর্ণ স্বার্থপর যদি আমরা না হই তাহলে ভবিষ্যতের সেই স্বর্ণযুগ—যখন স্বয়ং যিশু সশরীরে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে সহস্র বৎসর রাজত্ব করবেন—সম্ভবপর হবে না।

আমি চাই না যে, একটা নৈরাশ্যপূর্ণ বীতশ্রদ্ধ কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ হোক। আমি অস্বীকার করি না যে, স্বার্থপরতার চেয়েও উৎকৃষ্ট জিনিস আছে, এবং কেউ কেউ সেসব জিনিসও অর্জন করেন। তবে আমি মনে করি যে, স্বার্থপরতাকে যদি কুসংস্কারমুক্ত ব্যক্তিস্বার্থ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে রাজনীতি ক্ষেত্রে, একদিকে এমন উপলক্ষ নিতান্ত কমই পাওয়া যাবে যাতে বিরাট জনতা স্বার্থপরতার উপরে উঠতে পারে, এবং অপরদিকে এমন উপলক্ষ প্রচুর পাওয়া যাবে যাতে জনসাধারণ স্বার্থপরতার আওতায় পড়বে।

আর যেসব ঘটনায় জনসাধারণ ব্যক্তিস্বার্থের আওতার মধ্যে থাকে সে-গুলোর বেলায়ও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাদের মনে এই প্রত্যয় জাগানো হয় যে, তারা আদর্শপরায়ণ লক্ষ্যে কাজ করছে। আদর্শপরায়ণতার নামে যা চলছে তার অধিকাংশই হয় ছদ্মঘৃণা, না হয় ছদ্মক্ষমতানুরাগ। বিপুল জনসাধারণকে যখন আপনারা কোন মহৎ অনুপ্রেরণার নামে আন্দোলিত হতে দেখেন, তখন আপনাদের কর্তব্য, একটু গভীরে দৃষ্টি দিয়ে নিজেদের অন্তরকে জিজ্ঞেস করা: এই অনুপ্রেরণার পেছনে ক্রিয়াশীল প্রকৃত কারণটা কি? মহত্ত্বের এতই আকর্ষণ যে, তার মুখোশ দেখলেই মানুষ তার পেছনে ধাবিত হয়। অংশত এই কারণেই, যে ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের চেষ্টা আমি করছি,

তা করা গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে আমি বলব, আমার বক্তব্য যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীকে সুখকর করে তোলার জন্য প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিস হল বুদ্ধি। আর সব রকমের বিবেচনার পরও, এই সিদ্ধান্ত আশাবাদী; কারণ বদ্ধির বিকাশ শিক্ষার জ্ঞাত পদ্ধতির সাহায্যে ঘটানো যায়।

স্মরণ করি

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

স্মরণ করি।
বুক ভরা তীব্র জ্বালা নিয়ে
তোমাদের নিশান তুলে ধরি॥

শহর পেরিয়ে গ্রাম
তারপর গ্রাম
তারপর তাল-শুপোরীর বেড়া পার হ'য়ে
লাউ-কুমড়োর মাচা বাঁধা চাষীদের ঘর
ধানের ক্ষেতে দোয়েলের ডাক শোনা যায়
পথ চলে গেছে দূর হ'তে দূরে—
সাড়ে সাত কোটি মানুষের মহাসাগর তীরে
একটা তীব্র ব্যথার ঢেউ খেলে যায়

ডাকি ঃ
তীব্র ব্যথায় বুক চেপে ধরে তোমাদের ডাকি!
বাংলার শ্যামল প্রান্তর ছাড়িয়ে
সে ডাক চলে যাক বিশ্বমানবতার সমুদ্র উপকূলে
সে ডাক চলে যাক দিক-দিগন্তে।
সে ডাক চলে যাক টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত

অশ্রু মুছে ফেলে তোমার নিশান তুলে দাঁড়াই
তারপর পূর্ব দিগন্তের লাল সূর্যের দিকে তাকাই ঃ
এ সূর্য অক্ষয় হ'বে
এ সূর্য আরো আরো ভাস্বর হ'বে
এ সূর্য গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে পথের অন্ধকার।

ডাকি—

সাড়ে সাত কোটির মিলিত দীপ্ত কণ্ঠে তোমাদের ডাকি

বলি—

সাড়ে সাত কোটির অগ্নিকণ্ঠে সেই শপথের কথাই বলি

ঃ যে শপথ সূর্যের আলোর মত তমসা নাশ করে

ঃ যে শপথ লাভার মত জ্বালা ছড়িয়ে দেয়

ঃ যে শপথে হিমাদ্রি পাহাড়ের স্থৈর্য ॥

স্মরণ করি

তোমাদের স্মরণ করি।

হৃদয়ের সিংহাসনে বরণ করি

বলিষ্ঠ দু'হাতে তোমাদের নিশান তুলে ধরি ॥

বাংলাদেশ গান গায় তাদের অক্ষয় শোণিতের

শামসুর রাহমান

তাদেরও একান্ত ব্যক্তিগত
পরিচয় ছিলো কোনোদিন রৌদ্রময়, জ্যোৎস্নামাখা।
বুঝিবা তাদের একজন অস্তিত্বের
সব তন্ত্রী বাজিয়ে বাজিয়ে
তন্ময় গাইতো গান কারো ওষ্ঠের, স্তনাভার;
অন্যজন সঙ্গোপনে ভ'রে তুলেছিলো
সাতটি সুনীল খাতা রাশি রাশি গন্তব্যবিহীন
জবুথবু পক্ষাঘাতগ্রস্ত পদ্যে, কেউ কতিপয়
স্বপ্ন এঁকেছিলো
আপন চৌকাঠে,
ঘরের দেয়ালে আর বিবর্ণ মেঝেতে কিছু লোকজ মটিফে,
কোনো কোনো স্বপ্নে ছিলো মিশরীয় ধাঁচ।

মেজাজ তিরিক্ষি ছিলো কারো, প্রায়শই
দেখা যেতো তাকে বিবাদের ঘূর্ণিপাকে;
কারো রক্তে ছিলো ফেরেশতার ছায়া, কেউ সারাক্ষণ
ভাবতো দ্বীপের কথা, যার তটে—দেখতো সে স্বপ্নময়তায়—
পড়ে আছে জলকন্যা, তীরবিদ্ধ, মৃতা।
একজন দপ্তরের টেবিলকে ইথাকা ঠাউরে নিয়ে খুব
ক্লান্ত হ'য়ে দেখতো অদূরে
উদ্যানের পাশে শুয়ে একটি কুকুর, ক্রমাগত হচ্ছে বুড়ো।

কখনো মৃত্যুকে ওরা আপ্যায়ন করেনি এবং
নৃপতির মতো ছুটে গেছে বারবার মরণের মৃগয়ায়।

স্মৃতিতে পলাশ ছিলো, ছিলো সাঁকো, বাগানের বেড়া,
ওষ্ঠের আর্দ্রতা আর অক্ষরের বিভা। একজন এ্যানাটমি
পড়ে করোটির ব্যাখ্যা খুঁজেছিলো, জেনে নিতে চেয়েছিলো
করোটি কখনো সত্য ধারণ করতে পারে কিনা
সাবলীলভাবে।
সত্যের আঁজলা থেকে জল খাবে ব'লে অপরাহ্নে
ধূলায় গড়িয়েছিলো হুহু তার নিজেরই করোটি।
মরণের করতলে ওরা, তবু জীবনের পাশাপাশি দীপ্র থেকে যায়।

কখনো হাওয়ায় ভেসে আসে কিছু কণ্ঠস্বর, যেন
কবেকার গ্রামোফোন বাজে বকুলবিছানো পথে।
নিউজপ্রিন্টের স্তূপ থেকে স্বপ্ন উঠে এসে স্তব্ধ
মধ্যরাতে পতাকার মতো কাঁপে প্রধান সড়কে,
নগরবাসীকে ডেকে নিয়ে যায় পার্কে, নদীতীরে,
নিউজপ্রিন্টের মধ্যে ঢেলে দেয় বসন্তের রঙ।

সত্তার শরীর থেকে কিছু
উদাসীন একাকী শরীর,
মালা, ফটোগ্রাফ আর শ্যামল নস্টালজিয়া কেমন অলক্ষ্যে ঝরে যায়।

তাদের নামের
ওপরে সূর্যের চুমু ঝরে, পড়ে নক্ষত্রের ছায়া,
বাংলাদেশ গান গায় তাদের অক্ষয় শোণিতের।

দুঃসময়

সাইয়িদ আতিকুল্লাহ

তোমাকে যে দুঃসময়
উস্কানি দিয়েছি খুব বেশি
কাজে ঢেলেছে ফুস্‌মন্তর অনবরত সারাক্ষণ
তাকেও আমি বেলাবেলি
দ্যাখো কেমন সঠিকভাবে ধরে ফেলেছি।
আরক্ত এক ভালোবাসায়
দাগ দিয়েছি কতো গভীর
হাতের রঙিন চকখড়ি
সময়মতো ঠিকই ছিলো
চটপটে ও কর্মপটু।

ঘষে মেজে পালকগুলো রেখেছো বেশ ঝকঝকে
তবে কখনো বিস্ফারিত
এক আকাশে নীল কুলীন
কেন যে তুমি উড়ে যাও না। হৃদয় আমার

তোমাকে দেখি রোজ বাসে।
কখনো ক্লান্ত, কখনো বিরক্ত
ঘুরে বেড়াচ্ছো শহরময়
কি এক লোভে বড্ড বেশি ঘামে ভিজে
একা একা। হৃদয় আমার

রোদ বৃষ্টি ও হাজার রকম
জবরদস্তি মাথায় নিয়ে
একেকেবারে সঙ্গীহীন
তুমি কি খুঁজছো হৃদয় আমার রাত্রিদিন?

খুঁজছো কি সেই ভীষণ বদ্ধ মাতালটিকে
বলাবাহুল্য পদযুগল
অস্থির যার বারোমাসই
নড়বড়ে ও দোদুল্যমান?

যে হাঁটে বেশ তাৎক্ষণিকের দেওয়াল ধরে
অবিশ্রান্ত সারা বছর
টলতে টলতে থুথু ছিটোয় চতুর্দিকে
খুঁজছো কি এই শহর জুড়ে তেমন কোনো পাতাবাহার?

খুঁজছো কি এক বিরল গোলাপ
ক্রুদ্ধ মাতাল ঝোড়ো রাতের আঙিনাতে
তেমন কিছু এই শহরে টকটকে লাল ঘোর হলুদ?

হৃদয় আমার, দেখছি নানাবিধ বিশ্রী
ধমক এবং উত্তেজনা
ঘুরছে তোমার আশে-পাশে সারাক্ষণ
সারাক্ষণ, সারাক্ষণ।

তোমার গোপন গুহায় জ্বলে
অসংকোচে কোন্ প্রদীপ
কোন্ সে রাজার নিশান ওড়ে
পাহারা দেয় ধন মানিক
কয় জোড়া সাপ, কয় জোড়া সাপ
ভীষণ পিশাচ নাচে গভীর
রাত অবধি কয় হাজার, কয় হাজার

দুর্দিনে এই দুঃসময়ে তোমার পেত্নী যাদুকরী
কোন্ সুবাদে আমায় বোলো, আমায় বোলো একটিবার

খোঁজাখুঁজির নেইকো শেষ শহরময়
হৃদয় আমার এখন তোমার
বেজায় রকম দুঃসময়, দুঃসময়।

টুকরো কবিতা

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

নদী যখন আপন মনে কথা বলে জলের ভাষায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে করতালি কি আনন্দে বাজিয়ে সেথায়!
পাহাড় যদিও দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে
বুকের ভাষা চিরকালই বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখে।
গাছ-গাছালি পরস্পরে পাতার ভাষায় কথা বলে
জনপদে লোকালয়ে দূরবিসারী বনাঞ্চলে
উদাস-মাঠে বাউরি-বাতাস ঘূর্ণী তোলে, ছন্দে নাচে
তারও গতির তূর্ণ-বেগে সরব-নীরব ভাষা আছে।
শব্দ কিংবা শব্দবিহীন--ভাষার আছে নানান ধারা
মনের কথা যায় না বলা আপন প্রাণের ভাষা ছাড়া

শীতার্ত সন্ধ্যা

রাজিয়া খান

এইসব শীতার্ত সন্ধ্যারা
ফিরে ফিরে আসে
দুচোখে তখন অশ্রুর অজস্রতা
মুক্তো হয়ে ঝরে।
শিউলীর লাজুক সৌরভে
হেমন্তের ভিজে আমেজ মেখে
ভীরু পদক্ষেপে
আসে এই শীতার্ত প্রদোষ।
তোমার চোখের আসন্ন বিষাদ
আমি কতবার মুছেছি চুম্বনে--
এখন বন্ধু ভীষণ দুঃসময়
পথপ্রান্তে পড়ে আছে
অসংখ্য কংকাল
আর ইতিহাস থেকে
তুমি গেছ মুছে।
জল-মেঘ-ধানের ঘ্রাণে
যে দেশ ছিল
অমিত সমৃদ্ধ
তার মৃত্তিকা ফাটে
তপ্ত নিঃশ্বাসে।
আমি রুদ্ধশ্বাসে
দিন গুণি আর কতবার
আমার দেশের মাটিতে

এই প্রাণের অপচয়
দেখে দেখে জ্বলবে হৃদয় ?

উষ্ণ একেকটি জীবন
রক্ত পলাশের মত বৃন্তচ্যুত
হতে আর কত
দেখব প্রত্যহ ?

এই সেই মাটি যার
গোপন জিহ্বা শুষে নেয়
নিজ সন্তানের তপ্ত-শোণিত।

আহা এ মোহিনী প্রান্তরে
একদিন জ্যোৎস্নার ঢেউ
মাতৃ-স্তন নিঃসৃত
অজস্র দুধের মত
প্লাবিত করত তোমাকে আমাকে।

আমি তাই এদেশের ঘাসে
আর উষ্ণ মাটিতে
কারো ইন্দ্রস্পর্শ চাই
চাই ঋষ্যশৃঙ্গের মত
কোনো বীরের পবিত্র বীর্য !

দানবের অন্তর্ধানে অবশেষে
কুমার সম্ভবা হোক
আমার এ দেশ
সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হোক
ষোড়শীর মত
ধর্ষিত এদেশ।

ভাই, আমি তো বাজি না

আসাদ চৌধুরী

ভাই, আমি তো বাজি না ; শুধু বেজে উঠি।

অদৃশ্যে বাজতে থাকে কালের দুন্দুভি
দ্রুত সাড়া দিই তাতে
কখনো বা প্রতিবাদে ফেটে পড়ি।
সাদামাঠা ক্রিয়া ছাড়া
অন্য কিছু নেই—
শুধু প্রতিক্রিয়া আছে।

আমার নিজস্ব কিছু নেই,
জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, মতামত, নিজস্ব দর্শন—
কিছু নেই।

আমার অতীত আছে, স্মৃতি আছে
এই নিয়ে আছি।
স্বপ্ন নেই,
স্বপ্নহীন
বর্তমানে
একা।
আমার অতীত আছে, ভাঙাচোরা আয়নার মতো।
মাঝখানে কখনো দেওয়াল, বড়ো গর্ত,—লাফানো চলে না।
সময়ও কি চ'লে যায় পতাকার সাথে ?
প'ড়ে থাকে শূন্য ভিটা, ঘুঘু ডাকে
ভাঙা প্রতিমার সাথে খেলা করে সোনালি সাপেরা।

খাটিয়ার দড়িগুলো জীর্ণ হ'তে থাকে।
সবকিছু দখলের তীব্র তৃষ্ণা নিয়ে
নূতন ক্ষমতা আসে, ফের কেঁদে কেঁদে চ'লে যায়।

শুধু তার দাগগুলো কখনো মোছে না।

হে আমার বর্ণমালা, রক্তাক্ত কুসুম
কেবল তুমিই বারুদের ঘ্রাণ আর প্রতিবাদ
ধ'রে রাখতে জানো।

আত্মজ, এক বিশাল আয়না

সিকদার আমিনুল হক

প্রগলভ প্রেমিকের মতো আমি আমার স্বদেশের কথা
বারবার বলবো। ভোর হবে, আকাশের দিকে তাকিয়ে
দ্যাখ কী রকম স্ফটিক-স্বচ্ছ এই ভোর। নৌকোগুলো কোন্
দুর্জয় আদেশে বর্বরতায় ছুটছে; যদিও নদীগুলো রেশমের
মতো মসৃণ, কিন্তু তীরে তীরে বিশাল সবুজের অলসতা।

হে আত্মজ, পায়রা বসানো আয়নার মতো তোমাকে
আজ দাঁড়াতে হবে। আমরা তাকিয়ে আছি, দাবি আমাদের
অশান্ত হৃদয়ের। প্রতিবিম্ব তোমার স্বপ্নের মধ্যে: হয়তো
সেখানেও আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন থাকবে আজকের
মতো। উজ্জীবিত আমাদের নায়ক, স্বদেশের একটি তৃণও
যেন এই মুহূর্তে বঞ্চিত নোংরা কুয়াশায় না হারিয়ে যায়।

হে আত্মজ, শোন; তোমার কাঁদবার মুহূর্তে আমরা
এসেছি। আমরা গ্রহণ করবো তিক্ততা ও ক্রোধ!----
আর কে বলে জলমগ্ন আমরা! তোমার আনন্দের মুহূর্তে
আমরা স্নিগ্ধ করবো উৎসবের প্রাঙ্গণ, নকশা তুলবো
তোমাদের পথের বালুতে।--- আর দ্যাখ, দ্যাখ; কত
ফেনিল হবে আমাদের আলিঙ্গন, সেই মুহূর্তে।

একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা

আহম্মদ ছফা

প্রবীণ বয়েসী বট
তরুর সমাজে তুমি
অতিকায় জটাধারী
রবীন্দ্রঠাকুর ;
বাড়িয়ে ব্যাকুল গ্রীবা
নীলিমার জানালায় রেখেছো চিবুক
পাতায় পাতায় বাজে
যুগান্তের রোমাঞ্চিত সুর।
ঝিলিমিলি নীলে
আলোক নিখিলে
পত্রপুঞ্জ পুচ্ছ নাড়ে
দুরন্ত সাঁতার কাটে আকাশে উড্ডীন মীন
সাঁই সাঁই সাঁই ;
বৃন্তে বৃন্তে গাহে পাখি
ছুটে চলা সময়ের গান
দোদুল ঝুরিতে নাচে
উজ্জ্বল রোশনাই।

২

গ্রামের সীমান্ত প্রান্তে আঁকাবাঁকা স্রোতে
কালোজল ক্লান্তিভরা নিথর চরণে
চুপি চুপি অতিধীরে হাঁটে যেইখানে
রোগা রোগা দিনগুলো ঝাঁ ঝাঁ রোদে নীরবে ঝিমায়।

যেইখানে সময়ের ধেনু
বছরে বছরে শীর্ণকান্তি বছর বিয়ায়
হস্তীর বিষ্ঠার মতো স্তূপাকার শতেক বছর
নিদ্রা যায় অচেতন মাটির ওপর।
যেইখানে ইতিহাস করুণ গোঙায়
কুয়াশার মতো এসে
চুপিসারে ঘুমন্ত অতীত
অতর্কিতে আগামীরে খুন করে যায়।
অবিরাম ভাঙাগড়া চলেছে যে নাটে
কেবল দুঃখের পণ্য বিকোয় যে হাটে
যেখানে কচিৎ ঘটে প্রাণ উন্মীলন
টলটল শিশির যেনো ঝরন্ত জীবন
যেখানে হাওয়ায় ভাসে ভাঙনের গান
পত্র পতনের শব্দে ধ্বংসের বাঁশরী বাজে
মুখবোজা ছায়া ঠেলে মৃত্যু দেয় শীষ
মহামারী নিত্য করে নাম সংকীর্তন,

গোলগাল থালার মতো
আকাশ পৃথিবী মেশা এক চিলতে দিগ্বলয়ে
যুগান্তের বার্তাবহ
প্রবীণ মনীষীবৃক্ষ বৃদ্ধ পিতামহ
জানি না কেমন করে
ধরে আছো এতো প্রাণ উদ্ভিদ শরীরে
ভীষণ ঝন্‌ঝায় যুঝে
বিশাল আকাশে মুখ গুঁজে
পাতালে প্রবেশপথ খুঁজে
নীলিমার খড়খড়িতে প্রাণের ফোয়ারা
কি করে জাগিয়ে রাখো
ছলকে ছলকে বহে সবুজের ধারা।

পদতলে প্রসারিত প্রশান্ত ছায়ায়
অতীত মহিমা এসে দু'দণ্ড জিরায়।
ফড়িঙের মতো চরে হরিৎ জীবন
ধাবমান ক্লান্তিহীন প্রাণের বাহিনী
দলে দলে সবুজের সেনা
আকাশের চরে দেয় হানা।
ডালেমূলে পত্রপুঞ্জে পল্লব মুকুলে
প্রাণের কেতন রাশি ওড়ে দুলে দুলে ;
নৃপতির মহিমায় মস্তকে মুকুট
ধারণ করেছো তুমি
অঙ্গে অঙ্গে অস্ত্রলেখা
পিতামহ বনস্পতি সাক্ষী শতাব্দীর।

৩

আমাকে স্মরণে রেখো
মাননীয় বৃদ্ধ তরুবর!
আমারে হৃদয়ে রেখো, মনে পড়ে?
ভীষণ দরদভরা মুগ্ধ শিশু এক
তোমার দীঘল শাখা কার্তিকের ঝড়ে
ভেঙে গেলে চুপে চুপে কেঁদেছে অনেক।

মনে পড়ে? ছিপছিপে চঞ্চল কিশোর
খুঁজেছে টিয়ার ছানা ডালের খোড়লে
হাঁসের পাখার মতো তুলতুলে ভোর
দেখেছে চরণ রাখে নদীর কোমলে।

মনে পড়ে? এতোটুকু হাঁট ফেরা ছেলে
মাথায় ধরে না বোঝা, ভাতঘুম রাতে
সুরা এখলাস্ মুখে বড়ো রাস্তা ফেলে
নেমেছে ভূতের ভয়ে বিলচেরা পথে।

মনে পড়ে? একজোড়া বালক বালিকা
নিঝুম দুপুর বেলা সাজালো বাসর
তেলতেলে লালফলে গাঁথিল মালিকা
একমনে খেলা করে বধূ আর বর।

মনে পড়ে? সেদিনের রাঙা বেনারসি
কিশোরী পাল্কিতে চড়ে কিশোর নীরব
বজ্রাহত শিশুতরু ধীরে বাজে বাঁশী
না বলা ব্যথায় কাঁদে তোমার পল্লব।

মনে পড়ে? অসময়ে হলো পিতৃহারা
জনক জান্নাতে যায় পড়শীরা এসে
কাফন পরালো লাশে, দুখে আত্মহারা
কে বালক নয়নের জলে যায় ভেসে।

ছেলেটি প্রবাসে যায় পেছনে জননী
তোমার পাতার ফাঁকে চোখ মেলে চায়
মনে পড়ে তার মুখ! বড়ো একাকিনী
লখিন্দর সোনা যার কোল ছেড়ে যায়।

মনে পড়ে? মনে পড়ে? বৃদ্ধ তরুবর
কে যুবক জননীর প্রিয়মৃত মুখ
দেখেছে নিথর চোখে শান্ত নিরুত্তর
অধম সে ভাগ্যহত শোকার্ত অমুক।

৪

প্রভাত বেলায় তরুর মেলায়
পাতায় পাতায় আলোর নাচন
উদাস দুপুরে জলের নূপুরে
শুনেছি কেমন মধুর মাতন।

একেলা বিজনে শাখার গহনে
বিরহী বিহগ তুলেছে কূজন
দেখেছি গোধূলি সিঁদুর সোনালী
অবাক নয়নে আমরা দু'জন।

তরল তিমিরে রাতের নিবিড়ে
তারায় তারায় বেজেছে ঘুঙুর
নিথর গামিনী নিঝুম যামিনী
বাঁশীতে ফুকারে তুলেছে কি সুর।

ফাগুনে এমন ধরেছে বরণ
দোদুল শাখায় দুলেছে হরিৎ
কঠিন শিকড়ে ছুটেছে কি করে
তরল ধারার সরল শোণিত।

জটা অরণ্য অতি বরেণ্য
শিহর জাগিয়ে শতেক নাগিনী
নেমেছে মাটিতে ললিত গতিতে
বনস্পতির বয়েসী রাগিণী।

যখন ফাগুনে ফুলের আগুনে
সেজেছে নিখিল বন ও বনানী
উতলা পবনে ভেসেছে সঘনে
কোকিল পহেলা খুলেছে জবানী।

চৈত্র দিবসে বিহগ হরষে
শাখায় করেছে ফলের আহার
ঝাঁকড়া মাথাতে দখিনা দোলাতে
দেখেছি তোমার জটার বাহার।

মরেছে চাঁদিনী গভীর যামিনী
তারার চেরাগে ভরেছে পুকুর
গ্রামীন মানুষ নিশীথে বেহুঁশ
প্রহরা মগন পাড়ার কুকুর।

কিষাণ কুটিরে হাতের মুঠিরে
পাকিয়ে শিশুরা তুলেছে কাঁদন
আঁধার পাথারে নীরব সাঁতারে
বাণীরা খুঁজেছে ভাষার বাঁধন।

আপন কুলায়ে পাখাটি বুলায়ে
বায়স করেছে নিশিরে জরীপ
রাতের কপাটে দিনের ললাটে
আকাশে ফুটেছে তারার প্রদীপ।

বোশেখে ধরণী ভীষণ বরণী
তাতানো বাতাসে ছুটেছে ফুল্কি
আকাশ ভূতলে অগ্নি উথলে
খরার ছুরিতে ফুটেছে উল্কি।

মেঘের ডমরু বাজে গুরু গুরু
ঝিলিকে ঝলেছে বাঁকানো বিজুলী
যমের সাঙাৎ আকাশ ডাকাত
অগ্নিলোচনে তাকানো ত্রিশূলী।

ঝড়ের কেশরে মড়্মড়্ স্বরে
তোমার শাখায় বেজেছে বাজন
দেখেছি নিরখে লটকে ঝটকে
বয়েসী জটার মরমী নাচন।

জ্যৈষ্ঠ প্রহরে মেঘের চিকুরে
কালোতে লেগেছে আলোর চমক
পাতায় খোঁপাতে শ্যামল শোভাতে
দিঠিতে আমার নাচেনি পলক।

নবীন মেঘের প্রথম জলের
ধারায় ভেসেছে উজানী মাগুর
বিজুলী ঝিলিকে চিলিক মিলিকে
দেবতা হেঁকেছে গুড় গুড় গুড়।

আষাঢ়ে বরষা নেমেছে সহসা
হাত পা ছুঁড়েছে জলের শিশুরা
শ্রাবণ ধ্বনিতে পেয়েছি শুনিতে
গহন গীতিকা পরাণ বিধুরা।

শরতে হাসিটি ভরেছে বাঁশীটি
তরুরা পরেছে নতুন কামিজ
মাঠের শিথানে কাশের বিতানে
দেখেছি সফেদ ফুলের শেমিজ।

চলন্ত আভাতে হেমন্ত প্রাতে
কনক বরণ মাঠের তনিমা
ব্যাকুল নয়নে যেমন স্বপনে
দেখেছি তোমার বিরাট মহিমা।

ধানের সাগরে সোনালী জোয়ারে
ভেসেছে যখন গাঁয়ের কিষাণ
ঝুড়িটি নাড়িয়ে মাথাটি বাড়িয়ে
গেয়েছো মধুরে গভীর কি গান।

শীতের পরশে প্রবীণ বরষে
শরীর ঢেকেছো কুয়াশা চাদরে
অধিক বয়েসী প্রবীণ তপসী
জপের মালাটি ধরেছো আদরে।

দেখেছি অনেক কখনো ক্ষণেক
কখনো ভরিয়ে সারাটি নয়ন
আবেশে মেতেছি হৃদয়ে গেঁথেছি
মরমে মরমে করেছি চয়ন।

ভাবনা দুলেছে জোয়ার ফুলেছে
স্মৃতিরে কাঁদায় লিলুয়া বাতাস
কালেরি ধারায় সকলি হারায়
পারিনে হারাতে তোমার আকাশ।

৫

আমি তোমার পাঠশালাতে
পাঠ নিয়েছি শব্দ ধ্বনির
রঙ লেগেছে চোখের তারায়
স্বাদ পেয়েছি কথার ননীর।

মর্মরিয়ে দখিন হাওয়া
পাতায় পাতায় ফোটায় বাণী
পরাণ মন উদাস করা
তরুর ভাষার অর্থ জানি।

চৈত ফাগুনে শাখার ফাঁকে
কোকিল যখন মুখ খুলেছে
দোল দোলানো ঝুরির মতো
বুকের ভেতর সুখ দুলেছে।

খেলে বেড়ায় নদীর জলে
কুলু কুলু ধ্বনির পোনা
চাষ করেছি মাছের মতো
হাজার হাজার যায় না গোনা।

শ্যামল চিকন দুর্বাদলে
টলমলানো শিশির কণা
গলার ভেতর ঢেউ খেলিয়ে
উসকে গেছে গানের ফণা।

নবীন হাওয়ার আমেজ মেখে
'গাঁতার' থেকে সহুঙকারে
বেরিয়ে এলো কালনাগিনী
আওয়াজটিও প্রাণের তারে

ঠিক ধরেছি আশীবিষের
হনন ভরা মুখের বচন
গোপন ঘরে ঠাঁই দিয়েছি
শব্দ ধ্বনির অরূপ রতন।

ঋতুরাজের রংমহলে
পাখপাখালির কলকূজনে
চারিয়ে গেছে গানের বিছন
প্রাণের মাটির এই ভুবনে।

ধুলোর সাদা ওড়না পরে
চৈত্র মাসের বউ টুবানী
চটুল পায়ে নাচ করেছে
জানি আমি সঠিক জানি।

এই চাতালে মিশে আছে
সোনাভানের ধূপের শরীর
কালো কেশের গন্ধ ছড়ায়
রূপকুমারী চম্পাবতীর।

সুনীল বরণ আকাশখানি
যেই নেমেছে মাটির পানে
বনের ঘুঘু কাঁদিয়ে দিয়ে
সীতা গেলেন নির্বাসনে।

বেহুলাকে ভেলার পিছে
স্রোতের টানে নদীর বাঁকে
দেখতে আমি পেয়েছি গো
বিষকাটালীর ফাঁকে ফাঁকে।

রঙ মেহেদীর দাগ মোছেনি
কারবালাতে কাশেম খুন
সখিনার সে মর্মবেদন
ঢেউ দিয়েছে চতুর্গুণ।

বীর হানিফার অশ্বরাজের
ঠক ঠকা ঠক খুরের ধ্বনি
জোছনা রাতে চমকে বেড়ায়
কালো মেঘের লাল অশনি।

গহন দুখে কাতর নিমাই
অঙ্গে বসন সন্ন্যাসীর
গেরুয়াতে শরীর ঢাকেন
নগ্ন চরণ নগ্ন শির।

ছবির মতো পাড় দুখানি
গহন কালো নদীর নীর
চরণতলে সোনার জুতো
জলের ওপর গাজী পীর।

দিন গিয়েছে গল্পগাছার
তবু রসের গোপন ধারা
একটুখানি নাড়া পেলেই
মধু বিলায় বেবাক পাড়া।

এইখানেতে ঢাকের বাজন
বড়ো সাধের গরুর লড়াই
বলী খেলার মরশুমেতে
অনেক কিছুর ধানাই পানাই।

মাঘসপ্তমী মেলার দিনে
সিক্ত বসন যুবতীরা
নাদীর জলে কলকলিয়ে
যেই করেছে তরল ক্রীড়া।

কাঁকন চুড়ির পরশ পেয়ে
সাদা সাদা ঢেউয়ের ফেনা
ভেসে বেড়ায় ফুলের মতো
সে তো অনেক দিনের চেনা।

তরু তোমার খাস তালুকে
মলিন বদন কিষাণীরা
অতিবৃষ্টি খরার মারে
জানিয়ে গেছে মর্মপীড়া।

তোমার তলায় সমাজ নমাজ
ভুঁয়ের আলের ঠেলাঠেলি
'কান ছেদানি' 'মুসলমানী'
মলুদ শরীফ বেলাবেলি।

বিবি তালাক জমি দখল
কুল-মজানী নারীর নালিশ
সায়ং বেলা তামুক টেনে
চ্যাংড়া ছেরার প্রেমের সালিশ।

দেশের কথা দশের কথা
যুগের হাওয়ার ফিসফিসানি
কথার আলোর মশাল জ্বেলে
পঞ্চ রকম মন ভাঙানি।

সোভিয়েতের আজব খবর
যাদুর ঘোড়ায় নবীন চীন
সাক্ষী তুমি শুনছে তারা
ভাবছে এলো নতুন দিন।

এমনি করে, এমনি করে
দিনের পরে দিন গিয়েছে
নতুন কথার প্রেমে পড়ে
গাঁয়ের কিষাণ মার খেয়েছে।

মনে আছে একাত্তুরের
বাংলাদেশে রক্তরোদন
নদীর মাজা কাঁপিয়ে এলো
স্বাধীনতার অকাল বোধন।

ডালে ডালে পাতায় পাতায়
সেই কি তোমার পাগলা নাচন

এক পলকেই খসে গেলো
হাজার সনের জরার বাঁধন।

যুগান্তরের মহীরূহে
ফুটি ফুটি নতুন মুকুল
মরা গাঙে জলের জোকার
তরঙ্গিছে ভরা দু'কূল।

তরুর নায়ক জানো বটে
স্বপ্ন দেখার পরিণাম
মাছির মতো প্রাণ হারালো
মনে আছে—সে সব নাম।

তাগড়া জোয়ান চাষার বেটা
শালের মতো সুঠাম শরীর
কেউ বা সবে বিয়ের লায়েক
কেউ বা খসম গাঁয়ের পরীর।

ঘর জ্বলেছে দোর জ্বলেছে
ঘরের লক্ষ্মীর শরম খুন
যেদিকেতেই চোখ রেখেছো
আকাশ ধাঁধায় লাল আগুন।

কার কপালে মরণ লেখা
কেই বা হলো আলবদর
কার করুণায় শকুন করে
পংক্তি ভোজন গ্রাম-শহর।

রুধিরে লাল ঝলমলানো
মুক্তো প্রমাণ অশ্রু গাঁথা
নরমুণ্ডের মাল্য গলায়
নাচনরত স্বাধীনতা।

রূপ দেখেছো মূর্তি কেমন
যুগান্তরের হরিৎ লোচন
যদি বলি শতেক মুখে
দুখের কথা হয় না মোচন।

তারপরেতে তুমি আমি
জানি অনেক খবর জানি
মারী মড়ক মন্বন্তরও
বানের জলের রাহাজানি।

হাজার পরত মাটির নীচে
গভীর শোকের গতিবিধি
সাধ জাগে এই লেখনীরে
শানিয়ে বানাই প্রতিনিধি।

হে সৌম্য ধীমান, প্রবীণ,
অনাদিকালের তাপসতরু!
হে অকলঙ্ক কৈশোর
অনিন্দ্যসুন্দর দর্পিত যৌবনকান্তি
প্রজ্ঞাস্নিগ্ধ বিনয়ী বার্ধক্য'
হে উত্তুঙ্গ মহিমা শিখর
ফলবান সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক!
হে নীলিমা বিলাসী প্রশান্ত সাহস
দিগ্বিদিক ধাবমান নিরন্তর প্রাণ-প্রবাহ
চলিষ্ণু জীবনের ঝিরঝির মৃদুনিনাদ,
হে সময়ের সংগীত যন্ত্র
আকাশ-পাতালে সংযোগ রক্ষাকারী
হরিৎলোচন মনীষী মহীরুহ
পিতামহ বৃদ্ধ বনস্পতি—
তোমার গ্রন্থিল শাখাবাহু মেলে

আরো একবার আমাকে
প্রিয় পৌত্রের স্নেহে আলিঙ্গনে বেঁধে
প্রবীণ হৃদয়ে গ্রহণ করো।
আরো একবার তোমার শেকড় জানুতে
স্থাপন করো আমাকে।
গলা ছেড়ে দিয়ে গাও সেই গান,
সন্ধ্যা সাগরের মোহনার রাঙা মেঘের মতো
নয়নে উদ্ভাসিত করো নয়নাভিরাম দৃশ্যরাজি।
শাখার ব্যজনে ডেকে আনো
স্বর্গলোকের বার্তা বহনকারী নরোম ফুরফুরে সেই হাওয়া।
তোমার ঘুমন্ত রাখালদের মন্ত্রবলে ফিরিয়ে দাও
যাদের হৃদয়নবনী প্রাণ আনচান করা বংশীধ্বনিতে
মাঠে-বাটে রচনা করে রঙীন কুয়াশা।

নীল শৃঙ্গ পাহাড় থেকে নেমে আসা
নদীটির ছলোচ্ছল হাস্য মুখরিত
তরঙ্গ চঞ্চল গতিধারায় অঙ্কুরিত করে ধ্বনির যাদু
সলিল শরীর আন্দোলিত করে
নদীর প্রাণে সৃষ্টি করে উজানে চলার পুলকিত প্রেরণা
—সেই বাঁশীগুলো আবার দাও বাজিয়ে।
আরো একবাব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমাকে আকর্ষণ করো,
কানে কানে স্নেহময় বচনে বলো
যুগান্তের বার্তাবহ বৃদ্ধ বনস্পতি,
পিতা-পিতামহদের জীবনের অমৃত কাহিনী।

৬

বলো কোন্ আকাঙ্ক্ষা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে
কোন্ বেদনা হৃদয়ে দিয়েছে দোলা,
জন্ম-মৃত্যুর কোন্ রহস্য অন্তরে গেঁথে নিয়ে
তারা সারি সারি কবরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিস্তব্ধ নিথর সুপ্তির রাজ্যে জীবনের অপর প্রান্তে
নিদ্রারত স্বজনের স্বপ্নে জোনাক পোকার মতো জ্বলে কোন্ উজ্জ্বল কামনা!
কোন বাসনার মায়াবী শিহরণে
সংকীর্ণ পরিসর মরণ কারার আড়াল ঠেলে
জীবনের সন্নিধানে তরঙ্গের মতো তারা ফেটে পড়তে চায়।
সূর্যের আলোকে দুরন্ত ফড়িঙের মতো
লাফিয়ে পড়ার স্বপ্ন তাদের করোটিতে অন্ধকারে ভীড় করে,
আমাকে বলো সেই কথা।
তোমার গাঢ় কোমল মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে
আরেকবার উচ্চারণ করো সেই মন্ত্র
অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দাও সেই সব পবিত্র স্থান
যেখানে মনুষ্য জীবন জন্ম নিয়েছে বুনো আগাছার মতো
কর্মিষ্ঠ কৃষক শস্যক্ষেত্রে
সোনালী ধান্যের মঞ্জরীতে ফলবান করেছে জীবনস্বপ্ন
এবং কানে কানে বলো—
এইখানে তোমার জন্ম, এইখানে তোমার বিলয়
এই তোমার পৃথিবী, এই তোমার স্বর্গ।

নদী সাগরে বিসর্জন দিয়েছে গতি
সাগর সাগরে প্রবিষ্ট।
পথ মিলেছে পথে
লতানো পথের রেখায় তেপান্তরের ইশারা
ছলনার পুষ্পের মতো ফুটে আছে সুন্দর।
গিরিরাজি উদার সমতল প্রান্তরের সম্মোহনে
হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।
জগতের সমস্ত কিছুর অন্ত আছে
যেমন সব তারা হারায় দিবসে।
সমস্ত চরাচরে যখন নেমে আসে অন্ধকার যবনিকা
এই সেই স্থান
প্রবাসী সন্তানের জন্য সর্বক্ষণ উন্মুক্ত করে রাখে মধুময় কোল!

আমাকে নিয়ে চলো আবার
সেই প্রাঙ্গণের উপান্তে যেখানে স্তূপাকারে সাজানো
মাঠ থেকে সদ্য কেটে আনা দুধকমল, চন্দ্রমণি নামের
ধানের মাড়াই।
সেই কুটিরের দাওয়ায়
যেখানে দিনের বেলা পোষা কুকুর নাক ঢেকে ঘুমোয়
গৃহস্থের পালিত মোরগ-মুরগী 'আধার' ঠুকরে খায়
অপলক নয়নে দেখি পরাক্রান্ত প্রেমিক মোরগের অলজ্জ প্রেম সম্ভাষণ,
লাল শালুর মতো চকচকে তাদের পালক
মস্তকে লাল নিশেন- অপ্রতিহত বীর্যবত্তার প্রতীক।
গোয়ালে বাঁধা দু'টি গরু পরম তৃপ্তি সহকারে
জাবর কাটায় মগ্ন,
এক পাশে হেলান দেয়া লাঙল-জোয়াল চাষের যন্ত্রপাতি।
সেই কিষাণ কুটিরে যেখানে শিশুর ক্রন্দন,
অভাবের কর্কশ বিষদাঁত, লাল চালের মোটাভাত
আধশুকনো লাকড়ি সহযোগে রান্না হয়
কচুর লতি কিংবা পোড়া মরিচে সমাধা হয় চমৎকার ভোজন।
নিয়ে চলো সেই নদীর পুলিনে
জোনাক পোকার পিদিম জ্বালানো নিবিড় নিকুঞ্জে
ভরা আশ্বিনে রূপবতী আধাঁর যেখানে
শবরী বালিকার কাঁচা যৌবনের মাধুরীর মতো ঘন হয়ে নামে।
সেই আকাশ পানে সজল গহন কালো চোখ মেলা
আধমজা দীঘিটির ধারে
কচুরীপানার আচ্ছাদনে অর্ধেক যার পড়েছে ঢাকা।
বাম পাশে শ্মশান
নৈঋত কোণে বহু পুরোণো হেলানো তেঁতুল গাছ
মোচড় খাওয়া শাখাটিতে যুগ যুগ ধরে বাসস্থান রচনা করে আছে
বয়েসী অনাথ স্ত্রীপুত্রহীন একেবারে অসহায় একটি ভূত,
আঁধারের কালো আঁশে গড়া তার কবন্ধ শরীর।

নিয়ে চলো চৈত্ররজনীর উতলা নিশীথে
সেই চালতা গাছের কিনারে, সেই ফুটফুটে
মনোরম জ্যোৎস্নায়
হৃদয়ের গভীরে কেঁপে ওঠা প্রণয় শিহরণে তাড়িত
ইরান বোস্তানের পরীরা দলে দলে যেখানে বিহার করতে আসে
তারা গোল হয়ে নাচ করে
রাতুল পদচারণে সোনার ঘুঙুরের বোল ফোটে
সমস্ত মাঠ সারা রাতভর
অপার্থিব আনন্দের আস্বাদনে মধুর স্বপ্নে মশগুল থাকে।

আমাকে চাক্ষুস করাও,
সেই দোআঁশ মৃত্তিকার বিস্তৃত নাবাল ভূমি
অনেক অনেক পূর্বে নদী আপন গর্ভ থেকে মুক্ত করেছে যাকে।
হরিণের মাংসের মতো লাল পাহাড়ি মাটি
নদীর স্রোতে রসায়িত হয়ে শুভ্র মখমলের বরণ ধরেছে।
আলবাল চিহ্নিত অধিকারের সীমানা আঁকা
এই স্থলখণ্ড জলের প্রহারে জর্জরিত হয়ে
একদা জলের বুকে যখন আত্মসমর্পণ করেছে
দুই তীরের মানুষ ছিন্নতার
দোতারার মতো কেমন কঁকিয়ে কেঁদেছে।

তথাপি বসতবাটি হন্তারক নদীর প্রতি বিশ্বাস কদাপি স্খলিত হয়নি,
নদী তাদের দুঃখে অভিভূত হয়ে, ততোধিক বিশ্বাসে
অনুতপ্ত হয়ে অবশেষে এক শরতে প্রসব করেছে এই চর।
মিহি চিকন মোলায়েম আঁশের মাটি
চরণছাপ ধরে রাখে পরম অনুরাগে।
লাঙলের হলা প্রবিষ্ট হয় গভীরে
ঠিক যেনো যৌবনবতী গ্রহণ করে প্রেমিক পুরুষ।
মৃত্তিকা তৃষিত মানুষ এই নাবাল ভূমিকে দেখেছে সে চোখে
যেই চোখে তারা দেখে স্তনভারে ঈষৎনতা আপন বনিতাদের।

বাঁশ, কাঠ, শনে গড়ে উঠেছে কুটির
কুটিরে কুটিরে নির্মিত হয়েছে এই জনপদ।
সেই কিষাণীদের কেউ একজন সামনের
হাজার বছরের দিকে তাকিয়ে
হাজার বছরী কীর্তি-স্তম্ভস্বরূপ
অতিশয় সরু, অতিশয় ক্ষুদ্র—উদ্ভিদ শিশু
তোমাকে সযত্নে রোপণ করেছে।
গৃহসঞ্জাত উপাদেয় গোময়ে রচিত হয়েছে তোমার আহার
নিদাঘ দিনে নিত্য জল ঢেলে নিবারণ করেছে তিয়াস।
হে বয়োবৃদ্ধ স্মৃতি ভারাক্রান্ত তরু
একদা তুমিও ছিলে শিশু
হাস্যময় কৈশোর তোমাতেও করেছিলো ভর
যৌবনের প্রখর চেতনা দিয়েছে ডাক।

তুমি শৈশব অতিক্রম করে শিশুত্ব ধারণ করেছো
কৈশোর অতিক্রম করে কিশোরতা
যৌবন পেরিয়ে ধারণ করেছো অক্ষয় যৌবন ভাণ্ড
বুড়োত্বের সিঁড়ি পেরিয়ে বার্ধক্য ।
আপন সৃষ্টিশক্তিতে জয় করেছো
শৈশব কৈশোর যৌবন বার্ধক্য—
আর সব কিছুকে একসঙ্গে ধারণ করে
এই জনপদের সম্মিলিত প্রাণ-প্রবাহে এক হয়ে মিশে রয়েছো
এখনো পান্থজনে ছায়া দিয়ে সেই কিষাণীর
আদি ঋণ শোধ করে চলেছো মহিমান্বিত তরুবর।

সহস্রবাহু অযুতলোচন তরুবর
আমাকে নিয়ে চলো সেই যূথচারী কিষাণ সমাজে
যারা দল বেঁধে বাস করে
শরীরের স্বেদবিন্দু মিশিয়ে মাটিকে করে উর্বরা,
ফসল ধারণের যোগ্যা।

লাঙলের সুতীক্ষ্ণ হলে পাতাল থেকে টেনে আনে মর্মমধু
বীজের অন্তরে যারা সঞ্চারিত করে অঙ্কুরণের স্বপ্ন
কোমল শীষের কানে কানে দেয় বেড়ে ওঠার অঙ্গীকার।
যারা শ্রমের ব্যঞ্জনায় মাঠকে করে সর্বাঙ্গসুন্দর
নদীর কটিদেশে পরিয়ে দেয় ফুলে ফুলে চিত্রিত শাড়ি
দোলায়িত সবুজে রচনা করে জীবনের জয়গাঁথা।

নিয়ে চলো আমাকে সেই বিজ্ঞ কিষাণের জীবনের একেবারে একান্তে
যারা বোঝে আলোছায়ার রহস্য
নদীর গতিধারার সঙ্গে যাদের দীর্ঘ পরিচয়
আকাশের পুবে রামধনু দেখলে যারা বন্যার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়
ধূসর জলবাহী মেঘ দেখে বোঝে
ফুটিফাটা মাঠের যন্ত্রণা অবসান,
নামবে বৃষ্টি অঝোর ধারায়।
হেমন্তের সোনার মতো কান্তিমান রোদে
গ্রামসুন্দরীর ভুবন ভোলানো রূপ দেখে তৃষিত নয়নে।
বনের মর্মরে পূর্বপুরুষের পদধ্বনি কান পেতে শোনে
পাহাড়ে পাহাড়ে প্রহত আওয়াজে দূরস্মৃতি
শ্রবণে মায়ালোকের যাদু রচনা করে।
আর্যত্বের গৌরবে স্ফীত নয় যাদের নাসারন্ধ্র
ইরান তুরানের স্বপ্ন হানা দিয়ে মনে তরঙ্গ জাগায় না যাদের
আভিজাত্যের অভিজ্ঞান লিখিত নেই যাদের ঠিকুজীতে
সেই জারুল পলাশ আশ শ্যাওড়ার আত্মীয়
খেয়ালী নিসর্গের স্বভাবজ সন্তান;
পাহাড় যাদের করেছে কঠিন
জল করেছে কোমল
বাঁকা নদী ও উন্মুক্ত প্রান্তর গলায় ঢেলেছে গান;

সেই কিষাণ সমাজের একেবারে অন্তঃপুরে নিয়ে চলো আমাকে
আমার হৃদযন্ত্র স্পন্দিত করো তাদের জীবনের ছন্দে
উন্মোচন করো সমস্ত অন্তরাল।

নাড়ীর গতি পূর্বপুরুষের রক্তধারার সঙ্গে মিশিয়ে
সৃষ্টি করো দুরন্ত কল্লোল
আমাকে আমার আপন জন্মের প্রতি সৎ এবং কর্তব্যশীল হতে দাও।
নিয়ে চলো আমাকে করুণ বেহালার মতো
সেই সব মানুষের জীবন রঙ্গভূমিতে
কায়িক শ্রমে বংশপরম্পরা যাদের উত্তরাধিকার
যাদের কাছে আমি রক্তের ঋণে ঋণী
এবং যাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি বলে গর্বিত,
সার্থক করো জন্ম আমার।
আমাকে পান করতে দাও বেদনার তীব্র হলাহল।
পূর্বসূরী স্রষ্টাপুরুষদের মতো
দহিত করো দুঃখের দহনে।
কঠিন করুণ খণ্ড খণ্ড নির্মম বাস্তবতার আঘাতে
আমাকে ভাঙো, আমাকে ছিন্নভিন্ন করো
ভেঙে ভেঙে নতুন করে সৃজন করো।
দাও এমন প্রাণ যা অনায়াসে নিতে পারে
স্বজনের সমস্ত দুঃখের ভার।

আপন মস্তকে সমস্ত ভূখণ্ড তুলে নিয়ে
ক্ষুরের মতো চিক্‌কন পিছল পথে পারে হেঁটে যেতে।
তরু ত্রিকালেশ্বর! দাও সেই আশীষ
যার স্পর্শে দুঃখের সমস্ত গরল
মধুময় অমৃতে হয় রূপান্তরিত,
আমি স্বজনের অধরে তুলে ধরতে পারি যেনো
মরণ বিজয়ী সুধার পেয়ালা।
দীঘল শাখার তরু দুলে দুলে তুমি সৃষ্টি করো
নরোম চিকন হাওয়া
যা সঙ্গীতের পংক্তিতে আনে পেলবতা
আমি গাইবো মরণ বিজয়ী গান
আপন স্বজনের উদ্দেশে।

৭

হলুদ পাখির মতো ভীষণ লাজুক
জন্মেছে হৃদয়ে যার সুন্দর নবনী
হাসিলে গলিয়া যায় এমন রমণী
বেতস লতার ফাঁকে যেমন ডাহুক।

কিষাণ কুলের গর্ব কন্যা রূপবতী
স্বপ্নে আসো আলো করে সমস্ত শয়ন
বদন মণ্ডল 'রিদ্রে' করেছি চয়ন
হেনেছো কুসুম শর মানিনী যুবতী।

চাচর চিকন কেশ বুকে ঢলে পড়ে
বঙ্কিম গাঙের মতো ঢেউ ঢেউ মেয়ে
বড়ো সাধ ভিজে উঠি সেই জলে নেয়ে
মন উচাটন বালা হৃদয়ের জ্বরে।

মানিনী লো একদিন নেবো মহাদান
সে সুখ আগাম ভেবে গাহিলাম গান।

৮

শিয়রে মরণ বসে কেশে রাখে হাত
জন্মের যমজ জানো কৃষ্ণকান্তিধারী
নিশব্দ চরণ তার--চিনে নিতে পারি
আয়ুতরু মূলে যেবা টানিছে করাত।

এলোকেশী সে আমার প্রাণের পারানি
ধরেছে তিয়াস ভাণ্ড অধর সীমান্তে

প্রগাঢ় চুম্বন মাগে প্রতি নিশা প্রান্তে
একদিন কণ্ঠে নেবো জানি আমি জানি।

যদি প্রেমে বাঁধা পড়ি নিধূয়া প্রান্তরে
ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে করো শেষ উপাসনা
সহজে প্রকাশ করি অন্তিম বাসনা
এই কথা রাষ্ট্র করো যুগে যুগান্তরে।

যদি মরি কোনোদিন নদীর উজানে
আমার কাফন করো ভাটিয়ালী গানে।

৯

বাড়িতেছে অন্তরের ছোট্ট পরিবার
আমার শবর রক্তে ধরেছে নাচন
ঘুমন্ত দ্রাবিড় প্রাণে নামে জাগরণ
আমাতে বেঁধেছে বাসা নিখিল সংসার।

যেদিকে নয়ন রাখি সব বাসি ভালো
শিশু নারী বৃদ্ধ যুবা যা কিছু সপ্রাণ
সাদা-কালো-পীত বর্ণ মনুষ্য সন্তান
পশু পাখি আর এই গোধূলির আলো।

হৃদয় পাতিয়া রাখি যে আসো সমুখে
শত্রু হও, বন্ধু হও অনায়াসে এসো
অন্তরে প্রবেশ করে হৃষ্ট মনে বসো
স্বদেশী বিদেশী হও ভাই বলি মুখে।

যেখানে তিলেক মাত্র স্থান পায় প্রাণ
প্রাণের বন্ধুর নামে গাহিলাম গান।

১০

শিশুকালে অসম্ভব ভালো লাগা মনে
তোমার উদাত্ত কণ্ঠে গাঢ় উচ্চারণ
শুনেছি প্রবীণ বৃক্ষ সরল আবেগে
ঝিরঝির মিরমির পাতার ভাষণ
গগনে গুঞ্জরি যায় মুক্ত সাম-গান
শান্ত স্বর, শুদ্ধ নাদ নিটোল শরীর
শাখায় ছন্দের দোলা দীঘল গম্ভীর।
অকস্মাৎ নৃত্যরত মুক্ত প্রভঞ্জন
জটায় ঘূর্ণির বেগ
আগুয়ান অন্ধকারে ওড়ে ধূলিরাশি
চকিতে চমকি যায় বিদ্যুতের হাসি
অম্বরে ডম্বরু ধ্বনি কাঁপে কড়কড়
রক্তিম আগুন ভরা মেঘমন্দ্র স্বর।

অসীম নীহারজলে গতিমান পাখার স্পন্দনে
তাড়িয়ে আকাশে ভাসে শুভ্র বালিহাঁস
ধবল সুন্দর ডিঙা দ্রুত ধাবমান,
পথিক পাখিরে ডেকে শুনিয়েছো গান।
সুবর্ণ রেখায় আজো উদ্বেলিত সুর
মুক্তির পিয়াস ঢালে মধুর, মধুর
মূর্ত করে দিব্য চোখে বিশ্বের বন্ধন
শ্রবণে প্রবল হানে মাটির ক্রন্দন।

আকাশে উড্ডীন হংস যেনো সব স্বর্গগামী প্রাণ
জটার সঙ্কেতে পথ দিয়েছো সন্ধান।
দেখেছি খেয়ালে চরে মেঘের শিশুরা
দলে দলে ক্রীড়াশীল শুভ্র হস্তীযূথ

বিচরণ রত দেখে কৌতুকে মুখর
বলেছো রহস্যভরা যে মুগ্ধ বাণী,
চেতনার সরণীতে করে কানাকানি।

শরীরে কুয়াশা মেখে করে আছো চুপ
ধ্যানমগ্ন যোগীবর
দেখেছি সে দিগম্বর প্রকাণ্ড স্বরূপ
পাতালে চরণ গাঁথা মেঘলোকে শির
প্রাণের দর্পণে জাগে নিখিল জগৎ
অতল সুপ্তির কানে বলেছো যে কথা
মহামৌনে মজ্জমান সব বাচালতা,
আতঙ্কে উঠেছে কেঁপে নদীর অন্তর
আকাশ নিয়েছে বুকে সেই সান্দ্র স্বর।

দেখেছি সবুজ পত্রে ঘন আন্দোলন
প্রান্তরের প্রান্তে বাজে প্রসন্ন বাঁশরী
খুলেছে নন্দন লোকে দখিন দুয়ার
ধরায় বসন্ত নামে, উচাটন মন্ত্রে মুগ্ধ মন
তরুশীর্ষে অপরূপ সুন্দর স্বপন,
দ্রুতগামী অশ্বারূঢ় আনন্দের গান
শ্রবণে প্রবিষ্ট হয়ে মাতিয়েছে প্রাণ।
উজাগর প্রাণে আজো সেই শব্দ ধ্বনি
বিলায় উদাস ক্ষণে চিকন লাবণি।

আমার নাবাল মনে বিদ্যুৎ রেখায়
এঁকেছো যে চিত্রলেখা
তার রাঙা বরণ শোণিমা
ঢেকে রাখে ব্যগ্র হাতে
অসুন্দর আকাশের সীমা।

নিয়ত ভাসিয়ে চলে
মহাকাশে নভোচর যেনো মগ্নতরী
কখনো নির্জনে আসে নর্ম সহচরী
রামধনু বালিকা সে
বুকে আসে চুপে চুপে হাত রাখে হাতে
ধবল মেঘের দূতী চিত্রিত অপ্‌সরী।

গীতবাদ্যে যেই শস্য বছরে বছরে
ফলিয়েছো তরুরাজ ছায়া ঢাকা চরে
অন্তরে বহন করি অমরের বীজ
সোনালী ধান্যের দানা গোলাঘর প্রাণ।

আমার কর্ষিত ক্ষেত্রে প্রবল স্ফুরণ
চেয়ে দেখো তরুরাজ শুদ্ধ অঙ্কুরণ।
অমৃতে আকাঙ্ক্ষা রেখে যতোদূর যাই
তোমার অমর শিশু সযত্নে ফলাই।

পিতামহ বনস্পতি ;
বিনীত সন্তানে তুমি দাও এই বর
সূক্ষ্ম শরীর ধরে এই মাঠে—
যেনো আমি বেঁচে থাকি অনেক বছর।

মলয়ের মৃত্যুতে কয়েক পঙক্তি

মহাদেব সাহা

বলেছিলে চিঠি দিও, চিঠি দেই নাই
তোমাকে না-লেখা চিঠি প্রত্যহ পাঠাই!
তুমি কি পাওনা তবে, বোঝো না কি ভাষা,
লেখা কি অস্পষ্ট খুবই? কিন্তু ভালোবাসা
তাও কি যায় না পড়া? বানান কি ভুল?
নদী বয় পাখি গায় তবু ফোটে ফুল!

তুমি কি এতোই দূরে এইসব স্মৃতি
তোমাকে দেয়না কভু অনন্ত উদ্ধৃতি?
লোকে বলে মৃত তুমি আমি দেখি নাই
আমার না-দেখা দিয়ে তোমাকে সাজাই
বন্ধু প্রিয়, জীবনের সঙ্গী প্রতিদিন,
আমাদের কোনো স্মৃতি হয়নি মলিন।
তোমার রূপালি মুদ্রা রেখে গেছো জমা
তাতে যতো জল ঢালি জন্ম নেয় ক্ষমা,
প্রেম সুরভিত হয়; উদ্যানে উদ্ভিদ
মেঘ নামে, বর্ষা হয়, ফিরে আসে শীত!

তোমাকে যে চিঠি লিখি রাত্রি তার খাম

আকাশ রঙীন প্যাড তাতে লিখি নাম!

বিনষ্ট হৃদয়বীজ

আবু কায়সার

বন মল্লিকার ঘরে দীর্ঘরাত কষ্টে কাটিয়েছি আমি বহুবার।
চাঁদের চত্বর জুড়ে পরী আর প্রজাপতি ফুল্ল মায়াজালে
বেঁধেছিলো সম্পূর্ণ শরীরে—
দ্যুতিময় বল্লমের মতো তীক্ষ্ণ ভালোবাসা কতোবার আহা
এফোঁড় ওফোঁড় করে করতল, ছিন্নভিন্ন সমস্ত সরণি

ভয়ানক একরোখা হয়ে, লাল চোখে; নিষ্ঠাবান
মাকড়শা হয়ে কতো আকন্দফুলের ঝোপে, পুঁতিগন্ধময়
নর্দমায় এবং কুৎসিত
তামাটে মাটির খাঁজে নেশাখোর উদ্যান রক্ষক হ'য়ে
বুনেছি হৃদয়বীজ—
আলভারেজ যেন আমি মৃত্যুভূমে হেঁটেছি হাজার মাইল---

নক্ষত্র, তোমার জন্যে জেব্রাক্রসিংয়ের কাছাকাছি একা একা
ঢেলেছি কান্নার রেণু; মুঠো মুঠো ভুল আর যোজন যোজন
ঘৃণা অভিশাপ—
দীর্ঘশ্বাস জমা রেখে আনন্দবীমার করনিক সুখাবেশে
নতজানু হয়েছে অনেকবার, কতোবার? হিসেবে লিখিনি আমি
কেবল তোমারই জন্যে বেলেল্লা বন্ধুর হাতে সঁপেছি সম্ভ্রম।

এতো স্পর্ধা যার সেই আকাশের কাছে আজ বিনীত প্রার্থনা
তোমার ঝরোকা থেকে কতো আর চুঁয়ে পড়বে রক্তমেঘ—
কতোবার কান্নার কনকচাঁপা ঝরে পড়বে ফণিমনসায়, বলো!

নৈঃশব্দ্যপর্যায়

রাজীব আহসান চৌধুরী

একটিও কথা নেই; কাজ হলো নৈঃশব্দ্য চয়ন—
যদি বলো, বলা যায়;—এমন প্রবাসী আমি।
কোনোদিন কোনোখানে নিরন্বতা বলা যাবে নাকি!
অন্বেষায় দিন যায়, যদি বলি, বলবো কি,
'এমন আধার নেই, কোথায় যে রাখি---'?
দ্যুতি, দ্যুতি--বিভা, বিভা--প্রাণস্পন্দ, কথা---

হে নৈঃশব্দ্য ও শব্দপর্যায়ের মৌল কণা!
হে অণু-পরমাণুর লীলা ও রহস্য!
হে পরম সূত্র! আমাকে ধারণ করো তুমি,
পরিচয় ও লগ্নতা যেমন ধারণ করে পরস্পরকে।

ধাতুনিচয়ের মধ্যেও তো কেউ কেউ জানে,
পরস্পর লগ্ন হ'লে কথা বলে প্রাণ--
চুম্বক ও তরিৎ জানে
তার অর্থ দোলাচল, তার অর্থ
স্পন্দমান আবেশ, আবহ

গুণ্ঠন খুলি না ব'লে কে গুণ্ঠন খোলে?
অযোনিজ কৃষ্ণা জানে কলাবতীটি 'কে!'
'না, না!' ব'লে হয়তো রহস্য করে—?
এ রকম অনুধ্যানে ইন্দুমৌলি-বৈদগ্ধ্যের কথা মনে পড়ে---
ইলিশ হয়েছে রূপা, অপেক্ষায় নদী হ'লো সিল্ক,
মৃত্তিকাও মানুষের পুঞ্জিভূত আশা!
পাললিক শিলাগুলি শুধুই কি শিলা?

চোখেমুখে ফুলাভাস—
আলোরূপে, শক্তিরূপে, কল্যাণশ্রী শতরূপে
কোনোদিন বিকশিত—সার্থকতা ফুটে বেরুবে না?

স্বাতী নক্ষত্রের কোলে ফুটে আছো, নীরা!
সৌরলোক—বিশেষত আকাশে আকাশে
তারাগুলি এভাবেই বিকশিত, দীপ্যমান,
হয়তো বা শোভন হয়েছে।
নৈঃশব্দ্যপর্যায় থেকে একটি ঝিনুক ভাবে---
তুমি তার বিশ্রুতির মুক্তা হবে না?

বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আর্দ্রতা ও তাপ—
তারহেতু শস্যকণা বীজের অংকুর, চারাগাছ;—
তারহেতু পচনপ্রবণ হয় কোনো কোনো পুষ্প ও পরাগ—;
তথাপিও গাঢ় রস, গূঢ় রস, তমোরসে কি জানি কী দাহ!

আসবাসক্ত, আমি নৈঃশব্দ্যের মদ ভালোবাসি ব'লে
পাতন-প্রক্রিয়া জানি;—তুমিই তো সোনালি আধার!

কল্যাণব্যাপী

মাহবুব সাদিক

কল্যাণব্যাপী চলে মানুষের প্রাসাদ-নির্মাণ
কেউ কেউ বিশ্বাস প্রতীতি
রাখে, অনেকেই ডোবে
নিরালম্ব স্রোতে ;
কম্পাস হারিয়ে তারা জন্মান্ধের মতো
হাতড়ায় জল, একটি আলম্ব খোঁজে
একটি মাস্তুল
অবধারিতের ভুল তাহাদের পৌঁছে দেয়
পাতাল প্রণালী ;
যারা বিশ্বাস-প্রবণ তাদেরও ঝুলিতে ঢুকে
সামুদ্রিক জল
নুনের মতন ক্ষার তাদের রক্তের খাঁজে।
কলরোলে ছিদ্র করে
প্রতীতিতে বাসা বাঁধে কীট-বংশ, ক্রূর
ঝড়ের সমুদ্রে যেমন জাহাজেরা দোল খায়
তাদেরও ভেতর বাড়িরা
থাকে উথাল-পাথাল, বিশ্বাস বিশ্বাসহীনতায়-
এভাবেই জন্ম নেয় বৈজ্ঞানিক বিভা
কল্যাণব্যাপীর দিকে যাত্রা ক'রেও
বিশ্বাস-প্রবণ তারা
আকণ্ঠ ডুবতে থাকে নিরালম্ব স্রোতে॥

কবিতা

আলতাফ হোসেন

এই স্কাইস্ক্র্যাপারের মধ্যে আছে দশ হাজার কুঠুরী ঃ
এসো না তোমাকে আজ হাত ধ'রে নিয়ে যাই প্রত্যেক কামরায়
আমি নিজে পার হয়েছি চক্ষু মুদে, তবু চোখ
বাঁচাতে পারিনি, পাঁচশো কণিয়া—এই দু'চোখে এখন
পাঁচশোতম কর্ণিয়া লাগানো। এসো
এসো না তোমাকে আজ হাত ধ'রে নিয়ে যাই প্রত্যেক কামরায়—

এই হ'লো প্রথম কুঠ্রী ঃ

এই যে শিশুটি এর পাঁচ মাথা, সব ক'টিতেই
পচন ধরেছে, এর একটিতে গোখরার বাস, অন্যটিতে
চিকা গর্ত ক'রে থাকে, আর একটিতে এক প্রাচীন কোদাল
ব'সে গেছে আটি হয়ে। চতুর্থ মাথায় কিছু
বইপত্র, ঝাড়ুর শলাকা, প্লাস্টিকের গাড়ি—

কানের দু'পাশ দিয়ে কৃমির শরীরে আজ
গড়িয়ে চলেছে

পঞ্চম মাথায় এক চামেলির চারা

এই হ'লো প্রথম কুঠুরী

এই স্কাইস্ক্র্যাপারের মধ্যে আছে দশ হাজার কুঠুরী
এসো না তোমাকে আজ হাত ধ'রে নিয়ে যাই প্রত্যেক কামরায়

মা

মুহম্মদ নূরুল হুদা

স্মৃতি ও স্বপ্নের অববাহিকা জুড়ে কোলাহল উঠেছিলো কাল সারারাত
কাল সারারাত আমার অগস্ত্য যাত্রা তোমার শিথানে
কাল সারারাত তোমাকে মন্থন করে পান করেছি হন্তারক হলাহল
নারী কি রমণীর অনাবশ্যক আবরণ খসিয়ে, তার নগ্ন স্তনে মুখ রেখে
মগ্ন-স্বরে ডেকে উঠেছি 'মা'
কাল সারারাত আপন জনকের খড়্গতলে আমি ছিলাম নিঃশঙ্ক নচিকেতা ;

দেখলাম, পঁচিশ হাজার বর্গমাইল দীর্ঘ সেই লোকশ্রুত সাপের মতো
এক লোহিতাভ নদী
পেঁচিয়ে ধরেছে আমার বিজন-বৃহৎ স্বপ্ন-বিশ্ব
কাঁপছি আমি কাঁপছো তুমি কাঁপছে লক্ষ জীবনের অনুচ্চারিত শব্দাবলী ;
না, সীমানা-সীমান্তহীন কোনো সাগরে গিয়ে মেলেনি
সেই লোহিতাভ স্রোত
মানস-সরোবরের নভোনীল পরিধিতে সমর্পিত হয়নি তার সলিল-
শরীর ;

ইচ্ছে হয়, অধ্যাত্মবাদী ওঝার মতো তার দিকে ছুটে যাই
যেতে যেতে ভারী মজা পেয়ে যাই, শীত-সকালে ঘুম-ভাঙা কিশোরের মতো
ত্রস্তে পায়ে এসে দাঁড়াই সেই বৈতরণী তীরে ;
ঘুরছে তো ঘুরছেই, চলছে তো চলছেই
বাড়ে না কমে না তার জল
খল খল করে না সে জোয়ারে-হিন্দোলে
ভাঁটায় তার ভরন্ত শরীর পড়ে না ঢলে ;

সহসা তীব্র লয়ে বাজে বিষাণ ঈশানে
বসন্তপ্রাতে ফোটা ফোটা শিশিরের মতো টলমল করে আমার শরীর
হাওয়া লাগে, হাওয়া লাগে জীবনে-যৌবনে ; আর
সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে যে অঙ্গ সুবাসিত হয়েছিলো জীবনের প্রথম ওঙ্কারে
তার গন্ধ পেয়ে যাই আমি ;

মনে হয়, নদী যেনো নদী নেই, সে হয়ে উঠেছে শবে-বরাতের কার্ণিশ
তার বাঁকানো শরীর জুড়ে জ্বলছে সারি সারি লোবান ;
আর কী আশ্চর্য, সেই সব লোবান-মিছিল ছুটে আসছে আমার দিকে
বখতিয়ারের আঠারো অশ্বের মতো, শকহূন আর্য ও দ্রাবিড়ের
মার্-মার্ কাট্‌কাট্ ধ্বনির মতো, তিতুমীরের চির-উড্ডীন
বাঁশের ফলার মতো ;

"হঠ্ যাও হঠ্ যাও"
—কে তুমি আমার শোণিতস্রোতে সুবর্ণরেখার জলে
কলরোল তুলে আমাকে শাসাও
কে তুমি আমার পলিময় ব-দ্বীপ জুড়ে জননীর জননেন্দ্রিয় জুড়ে
হাউকাউ করো—
আমি বৃদ্ধ গৌড়রাজ নই, সর্বশেষ নবাব নই, আমি পালাবো না ;

আমার সৌধপ্রতিম অস্তিত্বের সমুখ দিয়ে ওরা চলেছে
নৌকাগুলো ছুটে চলেছে নিঃসঙ্গ আরোহী নিয়ে আলোর বেগে
যে ঘাটে তারা স্নান সারছে, মুখ লুকাচ্ছে অস্তগামী সূর্য
সেই অন্তিম অনন্তকে ভেদ করে ছুটে যাচ্ছে তারা, ছুটে যাচ্ছে ;

আমি চীৎকার করে ডাকলাম, 'কথা বলো, কথা বলো'
নিঃশব্দ দাড়গুলো দুলে উঠলো দ্বিগুণ বেগে ;
আমি চীৎকার করে ডাকলাম, 'তোমরা কারা ?'
হাওয়ায় লোবানের গন্ধ বাড়লো ;
আমি চীৎকার করে ডাকলাম, 'আমাকে নাও'

মুহূর্তে অদৃশ্য হলো নৌকাগুলো
স্তব্ধ হলো সচল নদী
জলের রঙ গেলো পাল্টে ;
আর খুব নীচু স্বরে খুব ধীরে লয়ে ঝাউকান্নার মতো
বেজে উঠলো ঝিঁঝির শানাই ;

দেখলাম, স্তব্ধ নদীর বুকে জেগে উঠেছে চর
চরে এক খড়ো কুটির
কুটির থেকে হাত বাড়িয়ে এলোচুলে বেরিয়ে আসছো তুমি
হে আমার বাহান্ন-বাহিত সন্তানহীনা বঙ্গজননী।

তবু চাই

সুরাইয়া খানম

ঝরে' পড়া ধাতব সভ্যতা সরে' পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায়—
পাণ্ডবের হাত ধরে, কৌরবের কুরুক্ষেত্রে গেছি ;
মাধুরী লুকিয়ে রেখে হৃদয়ের সমূহ গুহায়
হুঙ্কারে বলেছি ব্যাধ !—আমি বাঘ আমিই সহায় !

ক্ষয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি শিলাশ্রয়ে রেখে যাই ধুতুরা সন্ধানে
অমরতা দাবী করে মিছিলের ঠোঁটে চুমু খাই।

অজ্ঞান তখনও হাসে, হা হুতাশ বৈরী বাতাস শুধু ঠেলে ঠেলে ঢোকে
কঙ্কাল মেলায় কন্ঠ—সূর্যে ঝড় তোলপাড় ওঠে
সাবিক সমস্যাগুলি বুক পকেটের থেকে তুলে
একটি দেশলাই চেয়ে জলাভূমি হাঁতড়ে মরেছি !

অথচ চোখের কোলে লালনের ললিত আশ্বাস—
তবু চাই—তবু চাই অবিরল অবিশ্রান্ত চাই
শরীরে মরমে জাগা অনুভূত উত্তপ্ত আশ্রয়
যার অর্থ আজো বুঝি নাই—তবু চাই !

জন্মান্ধ প্রণাম

সানাউল হক খান

উপযোগিতার মাপকাঠি ভেঙে দিয়ে
চ'লে আসি তোমার সান্নিধ্যে পরিপূর্ণ,
রক্তে ও ধূলিতে মুখ দেখি ঃ কেঁদে কেঁদে হেসে উঠি,
বেড়ে যায় সহ্যসুখ এভাবেই—যা' কিছু নিয়তি- - - -
ফসলে দখল শিখি, দখলে মিনতি,
প্রয়োজনে প্রতিঘাত শিখি
প্রয়োজনে মিলিত বসতি,
মুখ থেকে মুছে ফেলি কালো জলরেখা
ভেঙে দেই মাপকাঠি উপযোগিতার।

যে হাত ছোঁয় না মাটি, সেই হাতে মন্ত্র দেই;
তোমার মমতা গুণে-গুণে ফসলের নিমন্ত্রণে
পরিপূর্ণ গ'ড়ে তুলি মায়াবী আদল,

ধরতে বলেছো তাই ধ'রে থাকি তোমার আঁচল- - -
পালাতে শিখিনি বলে শোকবরণের শোভা জাগে,
প্রতি
ফোটা
রক্ত- - -
প্রতিফোটা ঘাম,
জন্মান্ধ প্রণাম,
তোমাকে দিলাম। তোমাকে দিলাম॥

পাখি তুমি ভালো আছ?

জাহিদুল হক

আমার বাড়িতে বহু বই আছে
বইগুলো বিক্রি করে দেবো;
ঠাটারি বাজার থেকে দুধ মাছ মাংস
পুঁই শাক ধনে পাতা কিনে আনি,
বিকেলে মার্কেট থেকে কেবলই তোমার নামে
কিনে আনি মদির চামেলী,
আমি শুধু বইগুলো বিক্রি করে দেবো।
সহস্র পাতার মধ্যে কালো কালো অক্ষরের জ্ঞান
মানুষের অগাধ মনীষা
লিপিবদ্ধ আছে
    তোমার নামটি নেই,
আমি ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বেলে
সারারাত পড়ে পড়ে ক্লান্ত হয়ে উঠি
ঘুম নেই
পৃথিবীতে কোন ঘুম নেই।
আমার বাড়িতে মানুষের খোপে খোপে
বহু দুঃখ আছে
দুঃখগুলো বিক্রি করে দেবো,
ইলেকট্রিক বাল্বগুলো আজ আমি বিক্রি করে দেবো।
দারুণ বিরক্তিকর এই টেলিফোন
টেলিফোন করে করে কোনদিন তোমাকে পাই না;
তোমার খোঁপার মতো মিথিলার শিল্পকর্ম
তোমার চোখের মতো স্বপ্ন
    লুকিয়ে রাখবো ঘরে,

তোমার নখের আভা চোখের সম্মুখে রেখে
আমাকে দেখবো আমি
হে মহিলা!
আমার বাড়িতে বহু সুখ আছে
সুখগুলো বিক্রি করে দেবো।
ডাক টিকিটের মতো বহু যত্নে জমানো কৈশোর
আমার বুকের মধ্যে রেখে দেবো।
আমার টিনের ঘোড়া
রাজকুমারের সেই ধূ ধূ তেপান্তর
বসাকের বাল্যশিক্ষা
বর্ণমালা, প্রিয় বর্ণমালা,
তোমাদের সংরক্ষিত করবো কেবল।
আমি যেন কোনো এক জেলে
মশারির জাল ফেলে ফেলে
সারারাত অনেক স্বপ্নের মাছ ধরি,
তোমাদের কারো কাছে এই মাছ
কোনোদিন বিক্রি করবো না ;
বিক্রি করে দেবো এই মারণাস্ত্র নির্মাণের জ্ঞান
বিক্রি করে দেবো এই হিপোক্রেসি
বিক্রি করে দেবো আমি মানুষের মিথ্যাবাদী প্রেম।
আমার বাড়িতে বেদনার ঝোপ-ঝাড়ে
কয়েকটি পাখি আছে,
পাখিগুলো রেখে দেবো ;
পাখিকে শেখাবো গান, সারারাত বেদনা শেখাবো ;
পাখি, তুমি ভালো আছ ?
আমার না-পাওয়া পাখি
তুমি ভালো আছ ?

শিকার

হাবিবুল্লাহ সিরাজী

স্বীকার করা যায় না তবু এক শিকারী বনে থাকে
আর্যক্রিয়া সম্পাদনে মৎস্যকন্যার যে ভয়-ভীতি
পূর্ব শর্তে দিনরাত্রির আধাআধি ভাগ-বন্টন
স্বীকার করা যায় না কেবল শিকারী মেষ বনে এলে

মাথার ওপর শূন্য মাঠে গাভিন মেঘের শুভ্র লোমে
শীতের পোশাক বুনছে কবি
ফুলহাতা এক কলার উঁচু ফিট-সোয়েটার
মোজা-মাফলার
দস্তানা ও শাদা ট্রাউজার
বোনার কাজে তার ব্যবহার শিকার খোঁজার যোগ্য প্রতীক
স্বীকার করা যায় না তবু কবির শিকার বনে থাকে

বিড়াল নিয়ে এক প্রেমিকা শরীর ও মন ভুলেই ছিলো
চতুর্দিকে খাটো-নিচু লম্বা-মোটা হরেক রকম উটকো ইঁদুর
হল্লা করে কেল্লা জুড়ে বিড়াল-তার সাহসী লেজ
গুটিয়ে রাখে দেহের ভেতর অন্য চোখে বন্য ভাষা
শিকারী পা ঘুমটি মারে একলা হওয়ার নগ্ন ছাদে

ঘরে-বাইরে উপর-নিচে শিকার নিয়ে নবীন যে কাজ
কারুকর্ম তৈলচিত্র গান-সিনেমা নাচের নাটক
বন্ধ হলেও প্রবীণ কোনো টাক-শিকারী
আঙুল কেটে হরিণ খোঁজে সবুজ ঘাসে
তরুণ মাঠে
স্বীকার করা যায় না তবু শিকার নিয়েই আতশ বোমা
যুদ্ধ-বিজয় কবিকর্ম নারীর মনে সুঁই ফোটানো
সবকিছুতেই তীর তীরন্দাজ বাঘের চোখের আজব খেলা

মৃত্যু

অসীম সাহা

আমাকে ডাকছে রোজ ছায়ার মতোন তার কালো হাতছানি
আমার বুকের নীচে, বুকের খাঁচার নীচে, জীবন যেখানে নাচে
প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ সেখানে রাখছে হাত বরফ শীতল তার উষ্ণ আলিঙ্গন।

আড়ালে আড়ালে থাকে, আলো পেলে চকিতে লুকায় যেখানে
শব্দ আছে, ধ্বনির পাখিরা আছে, সেখানে সে সখের গোয়েন্দা
হয়ে খাপ পেতে থাকে, আমি তো আসামী নই, তবু কেন
আমার পেছনে তার এই ঘোরাফেরা, অন্তহীন এই লুকোচুরি।

জানি আমি, আমার পরিধি কতো, কতো এই বয়সের আয়ু
প্রতিটি মানুষ জানে, তবুও মানুষ চায় ভুলে যেতে বিষাদ-বেদনা
আমিও তো চাই, তবু কেন সে আমাকে কুয়াশা-নিবিড় কোনো
অরণ্যের দিকে শুধু টেনে নিয়ে যায়, বারবার মনে পড়ে ঃ
কতো যুগ পেরিয়ে এসেছি, আমাদের পিতা আর প্রপিতামহদের
হাঁটাচলা, কথাবলা, ভালোবাসাবাসি বহুকিছু লেগে আছে
আমার শরীরে, আমি তার ঘ্রাণ পাই নাকে, এভাবেই
আমার ভেতরে এক গহন গভীর পথ ক্রমাগত জন্ম নিতে থাকে।

কতোদিন ঘুমাতে পারি না, অবয়বহীন এক চিরচেনা দুঃখ এসে
আমাকে কেবলি শুধু প্রশ্নকাতর কোনো শিশু করে তোলে
আরো কতোদিন, কতোযুগ, কতোক্ষণ, কতোদূর কাল
পৃথিবী এগিয়ে যাবে, পাখিরা গাইবে গান, ফুটে রবে ফুল
আকাশে ভাসবে মেঘ, প্রবাহিত হবে আরো নদী,
শিশির পড়বে ঝরে, মানুষেরা বহুদূর এগোবে সমুখে
আমি থাকবো না, ঘুম ভেঙে যায়, ভিজে ওঠে চোখ।

নিদ্রাহীন কতোদিন জেগে রবো আমি, আরো কতোদিন
নিশীথ-প্রহরী এসে আমাকেও টেনে নেবে কাছে
উষ্ণ ঠোঁটে 'এসো হে মানুষ' বলে সীমাহীন খিলাবে চুম্বন

এ অসহ ব্যথাভার সইতে পারি না, মুক্তি চাই আমি,
স্বাভাবিক বলে যাকে মেনে নিতে হবে, সে কেন এমন করে
আমাকে স্মরণে আনে, আমাকে ব্যথার জালে জড়ায়-নিবিড়
আমি তাই সারাদিন সারারাত মনে-প্রাণে প্রার্থনা করি ঃ

হে মৃত্যু আসবে এসো, শুধু এই ভার থেকে মুক্তি চাই আমি
যতোদিন বেঁচে থাকি, জীবনকে আরো বেশী পূর্ণ হতে দাও।

যা আমার নয়, যা আমি বুঝি না

দাউদ হায়দার

বহুদিন পরে একটি বিকালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ডক্টরের
বাসভবনে গিয়েছিলাম। যাবার সময়
একটি রিক্সা আমার শরীরের সমস্ত ভার বহন করে চললো। হুড খোলা।

গত এক বছর পরে আমি ঢাকায় ফিরেছি। ইদানীং বারো-তের মাসের
মাথায় একবার করে স্বদেশে ফিরে আসি। আসতে একটি
জরুরী ভিসার প্রয়োজন, নইলে প্রবেশ নিষিদ্ধ !

ফিরলাম। ফিরেই আমার শৈশব-কৈশোরের ঢাকা শহরকে
একটি ন্যাংটো মহিলা ব'লে মনে হলো। রাস্তার দুই পাশের গাছগুলোকে
কে বা কাহারা যেন আমূল কেটে ফেলেছে। একদিন এই শহরে আমি
প্রচণ্ড রৌদ্রের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছায়ার কাছে আশ্রয় নিয়েছি।
গাছ আমাকে
বাতাস শান্তি ও স্নিগ্ধতা দিয়ে একটি অমল নিদ্রার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে।
অথচ আজ সে সবের কোন চিহ্ন নেই।
শহরের যে একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিলো, আমার চোখে
সে রকম কোন দৃশ্য ফুটে উঠলো না। কিন্তু আমিই এক সময়
বিশ্বের একটি অতি আধুনিক শহরের একজন কর্মকর্তাকে প্রশ্ন
করেছিলাম, "এইসব শ্যাল পিয়াল তরুতমাল ধ্বংস করে কি নগরের সৌন্দর্য
বৃদ্ধি করা যায়, নাকি নিয়ন বাতির চমকে প্রেম ও মাধুর্য বেড়ে ওঠে ?"

এবারও আমি এরকম একটি প্রশ্ন করলাম আমার ঢাকার শহর-
কর্তাকে। বললেন, "নগরে ইদানীং মশামাছির উপদ্রব। নাগরিকদের
এ থেকে উদ্ধার করতে হলে অবশ্যই প্রয়োজন হয়-----অত এব----!

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই জনৈক ডক্টর ভদ্রলোকের বাসবভন থেকে
বেরিয়ে আসবার আগে,
রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
নিয়ে আলোচনা করলাম।
এখন আমি শহীদ মিনারের দিকে একটি রিক্সার জন্যে এগুচ্ছি।
শহীদ মিনার দেখে আমার মনে পড়লো, এখানে একদিন
কয়েকজন যুবক প্রাণ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে রিক্সা এসে
দাঁড়াল। উঠলাম। উঠবার আগে আমার চোখে পড়ল, তীরচিহ্নে
অঙ্কিত হাজী ক্যাম্পের পথ-নির্দেশ এবং তার পাশে আরবীতে লেখা
একটি সাইনবোর্ড--
যা আমার কোনকালের ভাষা নয়, যা আমি
কক্‌খনো বুঝি না
তাই নিয়ে আমি খুব নিঃশব্দে রিকশায় চড়ে আমার গন্তব্যের দিকে
যাত্রা শুরু করলাম!

অপমৃতেরা

শিহাব সরকার

তুচ্ছ মানুষের জন্যে আছে খুব নিরাপদ ডার্জ, বিধুর গীতিকা
একা-মানুষ অগোচরে কী অমর কবিতা লিখে গেলো
তার পরিত্যক্ত উঠোনে ব'সে আরো আরো স্মৃতি রচনার সাথে
নিঃশব্দ তদন্ত করে বিধবা বৌ, অনাথ সন্তান, বন্ধু, প্রকাশকেরা
শক্তিহীন মানুষের চরম স্তম্ভ রচনা চলেছে
কোন্ সূর্যোদয় থেকে।

যেহেতু বেঁচে থাকা মূলতঃ পরোক্ষে মুছে যাওয়া প্রতিদিন
এই স্থির মফস্বলে ঝরাপাতায়
তুচ্ছ মানুষের নামে প্রচুর প্রচুর কিংবদন্তি অক্ষয় থাকে সহজে

কারো কারো ব্যর্থতার কথা সকলেই জানে, সকলেই জানে
এরা কোনো বিবর্ণ ছায়ামরিচীকা নয়
আমাদের পুরনো জামাগুলো কেনো
এখনি ছুঁড়ে ফেলবো না আগুনে
এই বিতর্কে এরা মুছে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে
কাঁটাতারে কীর্তি ও কল্পনাসহ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এই মানুষেরা কোনোদিন নারীর ভীষণ পাতালে নামেনি
বরং হৈ হৈ ক'রে একদিন সহসা
বিপুল বৃষ্টিতে উঠে এসেছে আমাদের মাটির বারান্দায়
কিছু প্রসিদ্ধ শৈশব, যৌবন আমাদের চারপাশে
এভাবে ডালপালা ছড়িয়েছে।

তুচ্ছ মানুষের স্মৃতিরচনার প্রয়োজনে অপমৃতেরা দলে দলে
আমাদের অবিরল শোকযাপনের ছুটি দিয়ে গেলো।

আমাদের মচুকুন্দ যেন প্রাণে বাঁচে

আবিদ আজাদ

আধো ভাঙা ঘুম আর আধো জাগা জাগরণের ভিতর এ' কোথায়
থামলো বিষণ্ণ ট্রেন? বাইরে কি বৃষ্টি নাকি? তবে লাল কেন?
প্রত্যেক যাত্রীর মুখ অন্ধকারে পেকে ওঠে জামরুল ফলের মতন।
বাজে হুইশিল,—প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, নয়নাভিরাম কই?

"ইস্টিশন নাকি—?" একজন আরেকজনের দিকে
হয়তো তাকিয়ে ছিলো মনে মনে যতোদূর তাকানো সম্ভব।
কণ্ঠে কণ্ঠে কাছে আসে "না, না, তা'হবে কি করে? ইস্টিশন হলে
হাবাগোবা চেহারার টালির ভবনগুলি কই?

এদেশের সবগুলি ইস্টিশন আমার মুখস্থ,
অজ পাড়াগাঁর কথা বলছেন?—মূর্খতাবশতঃ
টিকেট চেকার নেই, লাল আলো নেই—
এ রকম ইস্টিশনে শুধু মোরগফুলের গাছ
বছরের পর বছর নীরবে চাষাবাদ হয়ে গেছে

মাঝে মাঝে সচকিত চৈত্রফুল, ঘন্টা শুনে শুনে
অবুঝ করুণ চোখ তুলে তাকিয়েছে উৎকর্ণ হালের বলদ ঃ
কোমরে ঝুমকা ঘাস, ঝ'রে ঝ'রে পঁচে গেছে শিমুলের লাশ—
সবই আমার চেনা। আপনি সাহেব কবে থেকে
গ্রাম ছেড়েছেন? তিন বছরের বেশী? সে আর এমন কি অনেক
দিন হলো, যোগাযোগ ছিন্ন ছিলো? মনে-প্রাণে নাকি?"

ঠাট্টা নয়। একটি তরুণ-স্বর কখন জানে না
কেউ উঠে এসেছিলো কম্পার্টমেন্টের অন্ধকারে
আপাততঃ সকলেই জামরুল—কে জানে হয়তো সে-ই
বলে যাচ্ছে কথাগুলি—তারপর সন্ত্রাসের মত

নিশীথের আম্রকুঞ্জ ভরে গেলো শ্লোগানে- - -শ্লোগানে।
আউটার সিগন্যাল নয়, ঘনঘোর ভিতরের
অভিমানে নিয়ে চলে জব্বার ও বরকতে ঃ

তখন শুনলো সবে--ট্রেন থেমে গিয়েছিলো ইঞ্জিনের পাশে
ধুঁকে ধুঁকে--যেখানে মাঠের পরে মাঠ
ফাল্গুনের হাওয়া বমি করে গেছে হাজামজা পলাশ-টলাশ ঃ
কোন ইস্টিশন নয় রক্তজবা গাছের তলায়।

চব্বিশ বছর পরে--কুয়াশায় পাখার আওয়াজ
ফিরছে জখম ফেব্রুয়ারী ঃ
একটি চাষাড়ে কণ্ঠ মুখ হয়ে বলে ফেলে--"দেখবেন স্যার
আমাদের মচুকুন্দ যেন প্রাণে বাঁচে।

পাড়ি

আবুল হাসান শামসুদ্দিন

মনে পড়ে একদিন এই পথে
হেঁটে গেছি বারবার ভোরের নদীর কাছে,
সহজ ইচ্ছার মতো তার অবারিত স্রোতে
স্বপ্নের ফুলগুলি ভাসায়েছি কতো
অস্থির আঙ্গুলে। আকাশ-উপুড় করা
আর সুশীতল বুকে কৈশোরের বহু স্মৃতি
লাল-নীল মাছ হয়ে খেলা করে
যেন স্বপ্নের ভেতরে।

অথচ স্বপ্ন নয়—
সেইসব দিনগুলি আজো কথা কয়
শীতের সকালে কুয়াশার প্রান্তরে।
কৃষাণের কাস্তের মুখে
সোনালি সূর্যের হাসি ঝরে ঝরে পড়ে
শস্যের স্তূপে। মন্বন্তর প্রেত-ছায়া
দূরে সরে যায় বিলীন রাত্রির মতো
বিস্মৃতির প্রেক্ষাপটে।

কৃষাণের ঘামে রক্তে
পঙ্গপাল-মুক্ত উজ্জ্বল মৌসুম আসে
আঙিনায়। অশ্রুভেজা রাশি রাশি শস্যদামা
কৃষাণীর বিশীর্ণ চোখে নিয়ে আসে
আগামীর প্রত্যাশা
স্বপ্ন-সম্ভাবনা নবান্নের উৎসবের।

সেই দিন আর এই দিন
ইতিহাসের দুস্তর পাড়ি--
স্বপ্নের লাবণ্য ঝরে যায়
কংকাল-করোটি শুধু জেগে থাকে পথে পথে
কঠিন বাস্তব।
কত ঘোড়সওয়ার বর্গীর দল
ঝড়ের মতন লুটে নিয়ে গেছে
শেষ আশ্রয়। উদ্যত-ফনা কুটিল হিংসা
অসহায় জনে হেনেছে মারণ ছোবল।

তবু দেখো, দেখো, কী আশ্চর্য!
অনেক আশার ধ্বংসস্তূপে একটি লাল গোলাপ
জীবনের নতুন অর্থ আনে,
ফসলের মাঠের পরাজিত সৈনিক
আবার নতুন করে হাতিয়ার তোলে।

তার দৃপ্ত লাঙলের ফলায় হার মানছে
আগাছার জঙ্গল,
রক্ত-ভেজা ফসলের ক্ষেতে
আবার জেগে উঠছে সোনালি শস্যের
সবুজ ইশারা।

স্বায়ত্ত-শাসন

সলিমউল্লাহ খান

শাসন-ত্রাসন মানি কম, বেশী আপন মানুষ
প্রবীণ নিয়মে বেড়ে হয়ে আছি প্রবীণ পুরুষ
ভেঙেছি কালের বেড়া রাজ-দ্বার নিয়ম-ফ্যাসাদ
আদেশ নিষেধ রাখো, চাই নাতো রাজার প্রসাদ।

আকাশে লেগেছে চাঁদ আদিগন্ত শীতল মাথায়
তারার কল্কিতে জ্বেলে অগ্নিরাত ফুঁকেছি তৃষ্ণায়
কামুক-প্রবর নই সংসারে হিসাব-নিকাশ।
আনন্দ-বাজার ভুলে পেয়ে গেছি স্বায়ত্ত-আকাশ।

আজন্ম স্বায়ত্ত-শাসা পিতামহ পিতারও কালে
সময়কে নদী জানি চলেছেই আপনার তালে
হৃদয়কে লগ্ন জানি নিজের অনায়ত্তে চলে
আমাকে শাসাবে কে, সে আবার কোন প্রকৌশলে?

আপন নিয়মে চলি মানুষকে মানুষই বলি
সময়ে সময় গেঁথে নিজের বোতলে নিজে গলি
স্বায়ত্ত-শাসন চাই, যখন যেখানে খুঁজে পাই
সেখানেই রাখি তাপ আজন্ম-আমৃত্যু এ হাভাত

ভেঙ্গে গড়ে শব্দ খেয়ে উড়ায়েছি সর্ব মনস্তাপ।।

নশ্বর

মোস্তফা মীর

যদিও জীবন জানি নশ্বর, তবুও ভালবেসে
বন্ধনপ্রিয়তা শিখি জীবনের কাছে,
লোকালয়ে ফুলের বাগান করি
সৌন্দর্য চর্চার কাছে নত হই আহত পূজারী।

ফেলে আসি বসতির শেষ প্রান্তে
আবোল তাবোল কত প্রাকৃতিক চোখ ধুলো ও মাটিতে,
বৃষ্টির গন্ধের সাথে উবে গেছে তীব্র মনোযোগ
সকলি নশ্বর সকলি বিস্মৃতি চায় নিতান্ত নির্মম।

হাত ধরে তুলে আনে রাত তমসায় ঘেরা
'অন্ধ হলে আমি হব তোমার দোসর'
যে জন রক্তাক্ত হাতে বক্ষ ছুঁয়ে ভালবাসা দেয়
তার কাছে রবে কিছু ঋণ।

প্রত্যহ চোখের নীচে সময়ের মার্বেল গড়ায়
বিলাসী চতুর,
নদীর স্রোতের কাছে তবুও নির্ভুল জানি পাড়ের সীমানা
কত রেখে আসা তুলে আনা নয়
যেন অনন্তের ডাক শুনে প্রকৃতির নিয়ত ক্রন্দন।

রাখতে আসেনি কেউ সবটুকু নিয়ে চলে যাবে
নশ্বরতা, নশ্বরতা গ্রাস করে আলো ও আঁধার,
জন্ম যদি তুলে দিই তবুও কি ঋণমুক্ত চোখে
অন্ধতা ঘোচে না?

নশ্বর জীবন তবু ঋণী হতে চায়, তবু ভালবাসে।

জানতে কি পারবো না

আওলাদ হোসেন

জানতে কি পারবো না কোন কোন মানুষ আছে এ্যামনও
স্বপ্ন যারা দ্যাখেনি কোনদিন
নপুংশক বাস্তবের ভাষাহীন দাবীদার শুধু? ভোর হলে কাল

কৃষ্ণচূড়ার সুরে হয়ত গান গা'বে তারা
স্বপ্নের খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাওয়া পাখীর মতোন?

জানতে কি পারবো না কোন কোন মানুষ আছে এ্যাখোনও
খুঁজে খুঁজে ফিরবে সেই গান, স্বপ্নের হারানো গান
কবিতা কবিতা বলে অসহ্য স্মৃতির সেই দরিয়ার কাছে

রাজনীতি স্বেচ্ছাচার যাকে মালিন্য দিয়েছে

জানতে কি পারবো না কিছু কিছু মানুষ থাকা ভালো ঃ
সভ্যতার দু'একজন নগ্ন নফর
স্বপ্নের ভিতরে যাদের অশুদ্ধ সংগম ঘটে
লোকায়ত নারীর উপর

জানতে কি পারবো না?

আগুন

আফছারউদ্দিন খান

১

এই —
ঘরে কি কিছুই নেই ?
ভাণ্ডারে সঞ্চিত আগুন
আর বোশেখী বাতাস ?
দ্বিগুণ
কর। ছুটে যাক ক্ষিপ্ত আগুন
লেলিহান নিঃশ্বাস ॥

২

ক্ষমা—
আর কতকাল,
চোখের আগুন ছুঁয়েছে কপাল,
বুকে ক্ষিপ্ত আগুন জমা ॥

৩

অন্ধকার পথ,
জোনাকির আলো
করেই শপথ
গভীর রাতের কালোর বুকে
ক্ষুদ্ আলোর টিপ পরালো ॥

৪

চোখের ভাঁজে আগুন রেখে,
কারে দেখে
ডরাই তবে। একটু দ্বিধায়
আক্রোশে দাঁতে দাঁত রাখি,
নিশ্চুপ থাকি,
সেদিন আসবে কবে।
আছি অপেক্ষায়॥

৫

রাশি রাশি আগুনের স্তূপ
আর দীর্ঘ শোষণের কণা,
একত্রিত হয়ে তুলবে ফণা
শুধু সময়ের অপেক্ষায় নিশ্চুপ
এখন।
পাঞ্জা ধরে আছে মরণ
তবুও পণ.....।

রক্তাক্ত ফাল্গুন

সৈয়দ আজিজুল হক

বসন্ত আজ এসেছে দ্বারে
ফুল-সম্ভারে বনে-বনান্তরে
লেগেছে আগুন জ্বালা—
এমনি এক দাবদগ্ধ ফাল্গুনে
বাংলার অংগনে ওরা কয়জনে
পরেছে বিজয় মালা।

একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণ করি
গীত-অঞ্জলী কলকাকলী
কথার কলিতে গাঁথি—
পূত-পবিত্র করি এই চিত্ত মোর
এই রাংগা ফাল্গুনে বিরহ ব্যথার গানে
রক্তের আবীর মাখি।

তোমরা কি শুনেছো নিঝুম নিশিথে
অথবা নিভৃতে জননীর ক্রন্দন
তোমরা কি শুনেছ মাঠ-ঘাটে
প্রান্তরে উঠেছে রোদন।

আমাদের মণ্ডপে আজ মাতম মসিয়া
ভাষার অধিকার দিয়েছে যারা
তাদের স্মরণ করি আলোর ঝালরে
রচিতে তাদের নাম—
আজকের কবি জানায় সালাম।।

তেলাপোকা

শামসুল হক

বাবা টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন বাথরুম থেকে। বেশি মদ খেলে মানুষের অবস্থা যেমনটি হয়, তাঁর অবস্থাও তেমনি মনে হচ্ছিল। কিন্তু মদ? না, জীবনে তিনি মদ কখনও দেখেনও নি। যৌবনে তাঁকে দেখেছি তামাক খেতে। বাড়ির সাথেই ছিল ছোট্ট একটা জমি। সারা বছর পড়ে থাকত। শীতকাল এলেই বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন সেই জমি নিয়ে। চাষ করতেন, ঢেলা ভাঙতেন। মনের মত পরিপাটি হলে তামাক বুনতেন। কাক-ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতেন। অজু করে নামাজ পড়তেন। তারপর খালি পায়ে নামতেন ক্ষেতে। গাছের অবাঞ্ছিত পাতা ছেঁটে দিতেন, গোড়ার নরম মাটি পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে বসাতেন। কোথায় কোন্ গাছের কচিপাতা উঁকি দিচ্ছে, গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতেন। কারও কারও মাথায় দিতেন বাসি হুঁকোর পানি। প্রতিটি গাছের প্রতি তাঁর ছিল অপত্য দৃষ্টি। অমন দৃষ্টি বাবা তাঁর পুত্র-কন্যাদের দিকে কখনও দিয়েছেন কিনা মা-ই বলতে পারেন। ঐ ক্ষেত থেকে আসত বাবার সংবৎসরের আহার্য।

সেই তামাক খাওয়াও তিনি ছেড়ে দিলেন। একদিন তামাকে সুখটান দিতে গিয়ে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। খুব শ্বাসকষ্ট হয়েছিল। সারা শরীর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল ঘামের স্রোত। মাথায় পানি আর গায়ে পাখার বাতাস দিয়ে কোন মতে সুস্থ করা হয়েছিল। আর নয়। বাবা তওবা করলেন। তামাক খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলেন। ফরসি হুঁকোটা উপহার দিলেন তাঁরই স্কুলের এক শিক্ষক-বন্ধুকে।

বাবার আরও একটা নেশা ছিল। পান খাওয়া। তখন দাদী বেঁচে ছিলেন। তিনি হামান-দিস্তায় পান ছেঁচতেন। নিজে খেতেন, কিছু দিতেন ছেলেকে।

বাকিটা আমরা কাড়াকাড়ি করে খেতাম। বাবার সে নেশাও একদিন উঠে গেল। বিকেল বেলা। বাবা স্কুল থেকে ফিরলেন। যথারীতি নাশতা খেলেন। দাদী তাঁর হাতে পানও দিয়ে গেলেন। একটু পরেই গোঙানি। পান গিয়ে আটকে গেছে বাবার গলায়। বেশ কিছুক্ষণ মালিশের পর পানের পিণ্ড সরানো হল। এরপর পান আর তিনি স্পর্শ করেন নি কোনদিন।

এতসব নেশা ছেড়ে দিয়ে এই বয়সে বাবা ধরবেন মদ! আর ধরলেও মাতলামি করা তাঁর সাজে না। তাহলে? তাহলে তিনি অমন করছেন কেন? তাঁর নিজের ওপরই যেন নিয়ন্ত্রণ নেই। যেখানে তিনি পা রাখতে চাচ্ছেন, সেখানে না পড়ে এলোমেলোভাবে পড়ছে এখানে ওখানে। বাবা খড়বড় করে হেঁটে যাচ্ছিলেন আমার সম্মুখ দিয়ে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম।

বাবার এখন বয়স কত? তাঁর বড় ছেলের বয়স প্রায় চুয়ান্ন। তাঁর বিশ বছর বয়সেও যদি রমিজ ভাইয়ের জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর বয়স চুয়াত্তরের কম নয়।

বাবা—

ছুটে কাছে গেলাম। তিনি টাল সামলাতে না পেরে আমার ওপরই ঢলে পড়লেন। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। আশ্রয় পেয়ে তিনি নেতিয়ে পড়লেন। বাবা মোটাসোটা মানুষ। আমার পক্ষে একা তাঁর ভার সামলানো সম্ভব নয়। ভয় পেয়ে আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠলাম: ভাইজান, ভাইজান, বাবা জানি কেমন করছে।

আমার চীৎকারে বাড়ির সকলে ছুটে এল। সবাই জড়িয়ে ধরল তাঁকে: বাবা, অমন করছ কেন? তোমার কি হয়েছে, বাবা? কথা বল, বাবা। সকলে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

হঠাৎ কান্না। প্রতিবেশীরা দেখতে এল। ততক্ষণে বাবাকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে।

কেমন করে এমন হল?

বয়স তো আর কম হয়নি?

নানা জন নানান মন্তব্য করে যে-যার বাড়ি ফিরে গেল।

এতক্ষণে বাবার দিকে আমার নজর পড়ল। তিনি শুয়ে আছেন। মনে হচ্ছিল, তাঁর গালের বাঁ পাশটা কে যেন মুগুর মেরে বসিয়ে দিয়েছে। ঠোঁটের বাঁ দিকটা নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। মুখ থেকে অবাধে লালা

গড়াচ্ছে। লালায় লালায় দাড়ি ভিজে উঠেছে। বড় বীভৎস দেখাচ্ছে বাবাকে।

বাবার মুখে দাঁত আমি কখনও দেখিনি। দাঁত কখন পড়েছে তাও আমার মনে পড়ে না। দাঁত না থাকলে অনেকের গাল মুখের ভেতর সেঁদিয়ে যায়। বাবার কিন্তু তেমনটি হয়নি। তাঁর দাড়ি ভর্তি ভরাট মুখ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত।

এক আঘাতেই বাবার মুখের আদল একেবারে বদলে গিয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগের বাবা আর এখনকার বাবায় যেন মিল নেই। আমার এতদিনের বাবা মুহূর্তে হারিয়ে গেলেন আমার সম্মুখ থেকে। চোখ আবার ঝাপসা হয়ে এল।

বাবার বাঁ হাতটা অবশ হয়ে পড়ে আছে। যে হাতের ওপর তাঁর দীর্ঘ চুয়াত্তর বছরের কর্তৃত্ব, কে যেন হঠাৎ কেড়ে নিয়েছে তাঁর কাছ থেকে। হাতটার আনুগত্য যেন অন্যের কাছে বাঁধা। বাবাকে সে চেনে বলেই মনে হয় না। নিরুত্তাপ পড়ে আছে দেহের এক পাশে। এই হাত-পা—মানুষ যাদের এত যত্নে লালন করে, তারা তার মৃত্যুর পর তারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। বাবার হাতটা দেখে বহুদিন আগে শোনা হাফেজ মুন্সীর কথাটা মনে পড়ল। হাতটা কি তবে বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে?

ছেলেবেলার আরও একদিনের কথা মনে পড়ল। বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম আত্মীয় বাড়ি। ফিরে আসছি। বিকেল বেলা। সূর্যটা বাঁশ-বনের ওপর জ্বলছে। পথ লোকজনহীন। চারদিক নীরব। আমাদের মুখেও কোন কথা নেই। আজও মনে পড়ছে, বিকেলটা কেমন বিষণ্ণ মনে হয়েছিল আমার। সূর্যের আলোটাও ছিল মরা মাছের মত ফ্যাকাশে। নিঃশব্দে আমি অনুসরণ করছিলাম বাবাকে। সন্ধ্যা না হতেই রাত্রির নীরবতা নেমে এসেছিল আমাদের চারপাশে। আমরা হাঁটছিলাম। নিস্তব্ধতার গেলাপ মুড়ি দিয়ে।

আসতে আসতে পথে দেখি একটু দূরে কিছু লোকের জটলা। সকলের মাথায় টুপি। বাবাকে পাশ কাটিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল সেই দিকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কে মারা গেল রমজান?

নঈম মণ্ডল।

সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে লোকটা দ্রুত এগিয়ে গেল জটলার দিকে।

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। ·

বিড় বিড় করতে করতে বাবা এগুলেন সেইদিকে। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

নঈম চাচা বেশ কিছুদিন থেকে নানা রোগে ভুগছিল। চিকিৎসাও কম করেনি। শেষ দিকে পানি নেমেছিল সারা শরীরে। এই তো ক'দিন আগে বাবা গিয়েছিলেন তাকে দেখতে। বাবার হাত ধরে নঈম চাচার সে কী কান্না! বাবা তাকে কত প্রবোধ দিয়েছিলেন: মানুষের অসুখ হয়, আবার সেরেও ওঠে। তুইও সেরে উঠবি। কাঁদিস না।

নঈম চাচা বাবার অন্তরঙ্গ লোক। তার মৃত্যু বাবার মনে কি ক্রিয়া করে, তা দেখার জন্যে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। বাবাকে সব সময়ই দেখি, কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে তাঁর এমন অন্ধকার মুখ আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

জানাজা হয়ে গেল। লাশের দু'মাথায় দু'জনে ধরে কবরে নামিয়ে দিল। নঈম চাচাকে কোথায় কেমন করে রাখে আমি ঝুঁকে পড়ে আগ্রহ ভরে দেখছিলাম। বাবা আমাকে পেছনে হটিয়ে দিয়ে বললেন: ছেলেমানুষের এসব দেখতে নেই। তারপর হঠাৎ কাছে এসে সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। মুরগী যেমন ডানা দিয়ে তার বাচ্চাকে ঢেকে রাখে, তেমনি করে তিনিও আমাকে তাঁর দুই বাহু দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইলেন।

কবরে নামিয়ে লাশের মুখের কাপড় খুলে দেয়া হল। একটু পরেই বন্ধ করে দিচ্ছিল রমজান। বাবা বাধা দিলেন: থাক্ একটু! নঈমকে আর কোনদিন দেখতে পাব না। শেষবারের মত দেখে নি।

বাবার শেষের কথাগুলো স্বগতোক্তির মত শোনাল। ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললেন তিনি। চোখের পানি মোছার চেষ্টাও করলেন না।

নঈম চাচাকে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হল। হাত ধুয়ে একটু দূরে গিয়ে সকলে দাঁড়ালাম। হাত তুলে মোনাজাত করলাম। গোরের আজাব থেকে সে যেন অব্যাহতি পায়। কবরের বাস যেন তার পরম সুখের হয়।

সন্ধ্যার আগেই বাড়ি পৌঁছাতে হবে। বাবা হাঁটতে শুরু করলেন। আমি তাঁর পিছু নিলাম। হাঁটতে হাঁটতে কবরে শায়িত নঈম চাচার চেহারাটা চোখে ভেসে উঠল। চাচার কেমন লাগছে তার নতুন ঘরে? দাদীর

কাছে শুনেছিলাম, মুর্দাকে মাটি দিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুনকির-নকীর কবরে আসে। পুনর্জীবিত করে। নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। এতক্ষণে চাচার কাছে হয়ত মুনকির-নকীর এসে গেছে। পরীক্ষা করছে তাকে। মুনকির-নকীর কি ভাষায় কথা বলে? ওরা দেখতে কেমন? তাদের গা-ভর্তি নাকি বড় বড় কাঁটা, দাদীর মুখেই শোনা। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে মুনকির-নকীর প্রবল জোরে চেপে ধরে। মুর্দাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ছেড়ে দেয়। চাচা সব প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক দিতে পারছে কি? মুনকির-নকীর যদি চাচাকেও চেপে ধরে থাকে?

বাবা, নঈম চাচা মরল কি করে?

অনেকক্ষণ থেকে বাবাকে প্রশ্নটি করব করব করছিলাম। তাঁর চোখ মুখ দেখে সাহস হয়নি। অকস্মাৎ কথাটা ফস্ করে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

বাবা এতক্ষণ স্বাভাবিক গতিতে হাঁটছিলেন। প্রশ্ন শুনে তাঁর হাঁটার গতি বেড়ে গেল। আমার প্রশ্নটা যেন তাঁকে পেছন থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জীবনে আমি একটি মৃত্যুই দেখেছি। সেটি দাদীর। রাত্রি বেলা আমাকে আদর করে খাওয়ালেন। নিজের পাত থেকে মাছ তুলে দিলেন। সকালে উঠে দেখি দাদী মৃত্যু-শয্যায়। এমন অবাক-করা কাণ্ড আর আমি কখনও দেখিনি। মানুষ যেন হাওয়া-ভরা ফুটবল। জন্মাবার সময় যে হাওয়া নিয়ে সে পৃথিবীতে আসে, সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তা আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে। তারপর একদিন চুপসে গিয়ে পুরোপুরি খেলার অযোগ্য হয়ে পড়ে। অবাঞ্ছিত বস্তুর মত সংসার তাকে ফেলে দিয়ে অব্যাহতি পায়।

সামনে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে থম্‌কে দাঁড়ালাম। মনটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তার সাথে দৃষ্টিটাও। বাবা চলতে চলতে কখন দাঁড়িয়ে পড়েছেন টের পাইনি। ধাক্কা খেলাম তাঁরই সঙ্গে। বাবার মুখের দিকে তাকালাম। তাঁর দৃষ্টি তখন পাশের এক বিশাল আমগাছের মগডালে। ডালের ওপর বসে আছে একটা ঈগল। তার মুখে একটা শোল মাছ। থেকে থেকে গাছের ডালে আছাড় দিচ্ছে। ঈগলটার দিকে চেয়ে চেয়ে বাবা বললেন: আজরাইল মানুষকে এমনি করেই মারে।

বাবার কথা বুঝতে পারলাম না। তাঁর মুখের দিকে চেয়েই রইলাম।

মানুষ জন্মাবার পর থেকেই আজরাইল তার পিছু নেয়। আঘাতে আঘাতে তাকে কাহিল করে। শেষের আঘাতে সে নিঃসাড় হয়ে যায়। বাবা আপন মনে বিড় বিড় করেন। মাছটা কি মরতে চেয়েছিল? না কেউ কখনও চায়? বাগে পেয়েছে আছাড়ে আছাড়ে দুর্বল করে ফেলছে।

আজরাইল কি মানুষকে এমনি করে মারে? আজরাইল তো আলোর তৈরি। কোন এক বিশ্বকোষে পড়েছিলাম, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে নাকি জানে না, কার মৃত্যু কখন হয়। তবে? আলোর গতি কত? সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। আর পৃথিবীর পরিধি? পচিশ হাজার মাইল না? তাহলে আমরা যেমন বাস করছি সূর্যের আলোর মধ্যে, তেমনি করে হয়ত বাস করছি আজরাইলের আলোর মধ্যেও। আজরাইল কি এমন কোন আলো দিয়ে তৈরি, যা এখনও বৈজ্ঞানিকদের ধরাছোঁয়ার বাইরে? ঝড়ে যেমন দুর্বল নড়-বড়ে গাছ উপড়ে পড়ে, তেমনি করে হয়ত আজরাইলের আলো দুর্বল দেহে প্রবেশ করে মানুষকে মেরে যায়। ঝড় যেমন জানে না কোন্ গাছ উপড়ে গেল, তেমনি আজরাইলও হয়ত জানে না তার আলোর আঘাতে কোন্ মানুষ মরল, কার আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। আত্মা? আমাদের এই দেহের মধ্যে কেমন চমৎকার বাস করছে একেবারে অনাত্মীয় এই জিনিসটা। এ যেন এক সুখের পায়রা। দেহটি সুস্থ আছে তো সেও আছে। দেহ বাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ল তো সেও নেই। দেহের সুখের দিনে সে পরম সাথী, দুঃখের দিনে সে তার কেউ নয়। আত্মা নাকি অমর? মানুষের দেহটাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে সেও তো পাকাপাকি থাকতে পারে দেহের মধ্যে। আজরাইলের যে আলোর আঘাতে দেহের ধ্বংস হয়, বৈজ্ঞানিকরা পারে না সেই আলোর স্বরূপ আবিষ্কার করতে? সেই আলো প্রতিরোধ করতে? আহা, এমন কোন ব্যবস্থা হয় না?

হঠাৎ ঘ্যাড় ঘ্যাড় শব্দে আমার খেয়াল হল। বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম: কি অসুবিধা হচ্ছে, বাবা?

তিনি কি যেন বলার চেষ্টা করলেন। প্রাণপণ করেও কিছুই বলতে পারলেন না। হতাশায় উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন।

বাবার কন্ঠ ছিল গম্ভীর। তিনি কথা বলতেন কম। আমরা তাঁর পুত্র-কন্যারা কোন্ ছার। তাঁর সামনে গ্রামের লোকেরা পর্যন্ত গুছিয়ে কথা

বলতে পারত না। স্কুলের ছেলেরা তাঁকে মনে করত জ্যান্ত একটা বাঘ। তাঁর সেই জলদ-গম্ভীর কণ্ঠ গেল কোথায়? কে যেন তাঁর গলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে রেখেছে। কথা বলতে দিচ্ছে না। শাসাচ্ছে: অনেক বলেছ। আর নয়। সুযোগের আশায় বছরের পর বছর ওৎ পেতে থেকেছি। এ্যাদ্দিন দেহের উত্তাপে সব উপেক্ষা করেছ। এবার?

বাবা আপ্রাণ শক্তিতে গলার ভেতরের হাতটা সরাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন। বাঁ হাতটা তুলবার চেষ্টা করলেন। তাঁর মনের ইচ্ছা হাত পর্যন্ত সঞ্চারিত হল না। অক্ষমতার ব্যথায় বাবার দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

একদিন বাবা আমাকে পড়াচ্ছিলেন। একটা পড়া দেখিয়ে দিয়ে নিজেও অনুচ্চ স্বরে পড়তে লাগলেন। বাবার পড়াটা আমার ভাল লাগছিল। নিজের পড়া ভুলে গিয়ে তাই শুনছিলাম। এই বুঝি পড়ার নমুনা? বাঁ হাতের এক প্রচণ্ড চড় খেয়ে চৌকি থেকে সশব্দে পড়ে গেলাম মাটিতে। আবার ঐ বাঁ হাত দিয়েই কান ধরে টেনে তুললেন চৌকির ওপর। বাবার সেই বিশ্বস্ত হাতটা আজ কি করে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, ভাবতেই পারছিলাম না। হাতটা একগুঁয়ে ছেলের মত মাথা গুঁজে এমন পড়ে আছে যেন বাবার কোন কথাই সে আর শুনবে না। মনে হচ্ছে, হাতটাকে কে যেন মোচড় মেরে দেহের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সে-অংশের ভাল-মন্দের জন্যে তার কোন মাথা-ব্যথা নেই।

বাবার দিকে চাইতেই ইশারায় কাছে ডাকলেন। বাঁ হাতটা আমি তাঁর কোলের ওপর আস্তে তুলে রাখলাম। বাবা অসহায় দৃষ্টিতে তাঁর অক্ষম হাতটার দিকে চেয়ে রইলেন।

(দুই)

বাবার বড় দুই ছেলে—বগিজ আর তমিজ ভাই। ঢাকায় থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এল।

বাবা, বাবা, এখন কেমন আছ?

প্রায় আছাড় খেয়ে পড়ল তাঁর মুখের ওপর। তারা তাঁকে দেখতে পাবে, এমনটি আশা করেনি। বাবা ফ্যাল ফ্যাল চোখে পুত্রদের দিকে

চেয়ে রইলেন। পুঞ্জীভূত মেঘের মত তাঁর সব কথা মনের বদ্ধ আকাশে গুমরে মরতে লাগল।

ওরা এসেই কাছের শহরে লোক পাঠাল। ভাল ভাল খাবার আনালো। নিজের হাতে তুলে তুলে খাওয়াতে লাগল।

বাবার খাওয়ার পরিমাণ একটু বেশিই ছিল। তিনি একাই প্রায় আমাদের সাত ভাইয়ের খাবার খেয়ে ফেলতেন। মিষ্টি বেশি খেলে নাকি ডায়াবেটিস হয়। কিন্তু বাবাকে কড়া পাকের মিষ্টি ছাড়া কখনও খেতে দেখিনি। তরকারিতে যেমন ঝাল, তেমনি তেল খেতেন তিনি। এর একটু ব্যত্যয় হলে তিনি না খেয়েই উঠে পড়তেন। কোন বাড়ির দাওয়াতে তাঁকে ডাকা হলে তরকারিটাও তাঁকে দেখে দেঁয়ার অনুরোধ করা হত। সকলেই জানত তাঁর রুচির কথা। খাওয়া নিয়েই মার সঙ্গে লাগত তাঁর যত খিটিমিটি। বুড়ো হয়েছ, একটু রয়েসয়ে খাও। খাওয়ার সময় ছেলে মেয়েদের কথাও মনে থাকে না।

ছেলেমেয়েরা বেঁচে থাকবে। খাওয়ার দিন কি শেষ হল ওদের? আর কটা দিনই বা বাঁচব?

বাবা হাসতে হাসতে মায়ের কথার উত্তর দিতেন।

রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা যায় না। পাঁচ মাইল দূর থেকে সরকারী ডাক্তার আনা হল। বাবাকে দেখে ডাক্তার নিজেই ঘাবড়ে গেলেন। একদিন আড়ালে ডেকে বললেন: মফঃস্বলে না পাওয়া যায় ওষুধ, না দেয়া যাবে সেবা-যত্ন। আপনারা ঢাকায় থাকেন। ওখানে নিয়ে গিয়ে হাস-পাতালে ভর্তি করিয়ে দিন।

সরকারী ডাক্তারের কথায় আশা ছেড়ে দিলে চলে না। পাড়াপড়শীরাই বা বলবে কি। পাশের গ্রামের কবিমুল্লা ব্যাপারীকে ডাকা হল। সে কয়েকদিন আগেও এসেছিল আমাদের বাড়ি। একটা গরুর চিকিৎসার জন্যে। গরুটা ভাল হয়েছিল। গ্রাম্য চিকিৎসায় তার নাম-ডাক আছে। পাড়া-পড়শীরাও বলল: সরকারী ডাক্তার দিয়ে কি এসব রোগের চিকিৎসা হয়? করিমুল্লাকে আন, রোগ সারতে দেরী হবে না। তারপর করিমুল্লা কোথাকার কোন্ রোগীকে কেমন করে সারিয়ে তুলেছিল, উপস্থিত এক একজন এক এক কাহিনী বলতে লাগল। করিমুল্লার চিকিৎসায় কি কি জিনিসের দরকার, কেউ কেউ তারও ফিরিস্তি দিল। যে যা বলল, এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে তারও কিছু কিছু জোগাড় করা হল।

করিমুল্লা এসেই কয়েকটা কাকলাস মাছের মাথা চাইল। শরীরে বদ রক্ত জমেছে। বের করে দিতে হবে। আশায় আমাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বদরক্ত বের করে দিলেই বাবা সেরে উঠবেন। তাড়াতাড়ি দু' তিনটি মাছের মাথা তাঁর হাতে দিলাম। ব্যাপারী মাছের মুখের দাঁতগুলোর ধার পরীক্ষা করে বাবার অবশ পা-টার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

দেখলেন, কত বদরক্ত? রঙ দেখেন।

আমরাও দেখলাম। রক্তের রঙ যেমন হওয়া উচিত, তেমনটি যেন মনে হল না।

করিমুল্লা ব্যাপারী বাবার বাঁ-পাটা নিয়ে তার চিকিৎসার নানা কসরত চালাতে লাগল। মাছের দাঁতের আঘাতে আঘাতে পা-টা বিতিকিচ্ছি হতে লাগল।

দেখতে দেখতে ভাইদের ছুটিও ফুরিয়ে এল। ছুটি এক্সটেন্ট করবে কিনা, চিন্তা করল। নিজেদের সংসার আছে, পরিবার-পরিজন আছে। তাদের দেখাশুনোরও লোক নেই। নিজেদের দায়িত্বের কথা ভেবে ছুটি এক্সটেনশনের চিন্তা তাদের বাদ দিতে হল। তবে যাওয়ার সময় বার বার বলে গেল: বাবা একটু সুস্থ হলেই কিন্তু ঢাকায় নিয়ে আসিস।

ভাইরা চলে যাওয়ার কিছুদিন পর বাবার অবস্থা মোটামুটি ভাল মনে হল। অসুখের প্রাথমিক ধাক্কাটা তিনি সামলিয়ে নিয়েছেন। কথা বলতে গেলে এখনও জড়িয়ে যায়। ঢাকায় নিতে হলে এই-ই সময়। আগে অনেকবার তাঁকে বলেছিলাম: বড় ছেলেরা ঢাকায় থাকে, একবার ঢাকাটা অন্ততঃ দেখে এস। প্রতিবারই তিনি বলতেন: ছেলেপুলে নিয়ে ওরা সুখে আছে। ওদের সুখে বাগড়া দিতে চাই না। আর অত তাড়া কিসের? সময় কি আর ফুরিয়ে গেল? —সুস্থ থাকতে যাকে কোনদিন ঢাকায় নেয়া যায়নি, অসুস্থ হয়ে তাঁকেই আসতে হল ঢাকায়।

রমিজ ভাইয়ের বাসা দেখে বাবা মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন। বাড়ি বানিয়েছ, বেশ করেছ। তা একটু দেখেশুনে বানাতে পারনি? আমি কি মরে গেছি নাকি? আমাকে বললে বাড়ির প্ল্যানটা তো আমিই করে দিতে পারতাম।

বড় ভাইয়ের ছেলে টিটো যাচ্ছিল বাবার সম্মুখ দিয়ে। তাকে কাছে ডাকলেন: পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে আয় তো। তোর বাপের যা বুদ্ধি, একখানা বাড়ি বানিয়েছে বটে।

টিটো কাগজ-পেন্সিল এনে বাবার হাতে দিল। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে বাড়ির প্ল্যান আঁকলেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন: দেখ্‌তো কেমন হল?

বাবার কত সাধ ছিল, তাঁর বাড়িটাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবেন। প্রায়ই তিনি বলতেন: ছেলেরা একটু থিতিয়ে বসুক। ওরা টাকা পাঠালেই বাড়ির কাজে হাত দেব।

অবসর পেলেই তিনি আপন মনে বাড়ির প্ল্যান আঁকতেন। নেশায় পেয়ে বসেছিল তাঁকে। একদিন সেই প্ল্যান ফাইনালও হয়ে গিয়েছিল। ঠিক আজকের মত সে-প্ল্যানটিও আমার হাতে দিয়ে তৃপ্তির চোখে জিজ্ঞেস করেছিলেন: কেমন হবে বল্‌তো?

ছেলেরা তাদের সংসার বাঁচিয়ে বাপের কাছে টাকা পাঠাতে পারেনি। বাড়ির কাজেও তিনি হাত দিতে পারেন নি। সময় হলে টাকা নিশ্চয়ই পাঠাবে। ছেলেদের ওপর আশা তিনি ছাড়েন নি। সংগোপনে দীর্ঘদিন লালন করেছেন বাড়ির সেই প্ল্যানটি। হুবহু সেই প্ল্যানটি আজও তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন। প্রথম দিন যেমন বাবার কথার উত্তর দিতে পারিনি, আজও পারলাম না। বাবার জন্যে অসম্ভব মমতা বোধ করতে লাগলাম। বুক ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

সারাটা দিন বাবা মোটামুটি ভালই থাকেন। সূর্যের আলো তাঁকে অভয় দেয়। সারাদিন তিনি পড়ে পড়ে ঘুমান। কিন্তু দিনের বাবা আর রাতের বাবা যেন ভিন্ন পুরুষ। সন্ধ্যার আগমনে তিনি উস্‌খুস্‌ করতে থাকেন। রাত যতই বাড়ে, ততই তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। রাত্রিকে তাঁর যত ভয়। চোখের পাতা এক করতে পারেন না। চীৎকার করে ছেলেমেয়েদের ডাকতে থাকেন। কাছে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর চীৎকার চলতেই থাকে। রাত্রির অন্ধকারে আজরাইল কি হাজির হয় বাবার সামনে? লোক দেখলে আজরাইল কি পালিয়ে যায়? তিনি কি আজরাইলকে ভয় পান? জন্মাবার পর থেকেই মানুষ তো আজরাইল সম্বন্ধে কত কথাই শোনে। জেনে-শুনেও মানুষ তাকে ভয় পায় কেন? আজরাইলের চেহারা কেমন, বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করব? না, অসুস্থ মানুষকে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই।

অনেক তয়-তদবিরের পর বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো গেল। বাবার এক ছাত্রের গাড়িতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু

হাসপাতালেও রাখা দায় হল। যতই রাত হয়, বাবার চীৎকার ততই বাড়ে। কইরে রমিজ, তোর গাড়িটা নিয়ে আয়। আমি বাইরে যাব। ঐ একই কথা ঘুরে ফিরে বাজতে থাকে। রোগীরা বাবার চীৎকারে ঘুমুতে পারে না। ডাক্তারের কাছে নালিশ করে। একজন রোগীর জন্যে এতগুলো রোগীর অসুবিধা। ডাক্তার একদিন ডেকে বললেন: রোগী আপনার কে হন? বাড়িতে নিয়ে যান। যা চায়, খাওয়ান দাওয়ান। এ-রোগীর জন্যে আপাততঃ এই-ই একমাত্র চিকিৎসা।

বাবাকে আবার রমিজ ভাইয়ের বাসায় নেয়া হল। একদিন সকাল বেলা বড় ভাই বলল: বাবা, তুমি দিনে না ঘুমিয়ে রাতে তো ঘুমুতে পার। নিজেও ঘুমাও না, আর কাউকে ঘুমুতেও দাও না। আমাকে তো অফিস করতে হয়। এ-সময় অসুখ-বিসুখ করলে কেমন হবে?

কি, আমার জন্যে তোমাদের ঘুম হয় না? আমি তোর অসুখের কারণ? বেশ।

বড় ছেলের ওপর বাবার অভিমান হল। তার নাম আর তিনি ভুলেও মুখে আনেন না। বাবা যে ঢাকায় আছেন, তাও ভুলে যান। ছেলেদের বাদ দিয়ে গ্রামের তাঁর ভক্তদের ডাকেন। তাঁর সেই চীৎকার সইতে পারি না। কাছে যাই। তিনি তেড়ে ওঠেন: তোর অসুখ করবে না? যা শুয়ে থাক্‌গে। দাদীর কথা মনে পড়ে বাবার। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন:

> বিধবার পুত্র এক নামেতে গোপাল,
> তারে লয়ে জননীর দুঃখে কাটে কাল।
> পাঠালেন পাঠশালে করিয়া যতন,
> সূতা কাটি' ধান ভানি', যোগান বেতন।

সে এক দীর্ঘ কবিতা। আজ প্রায় তিরিশ বছর আগে পড়েছিলাম দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীতে। আমি ভুলেই গিয়েছি সে-কবিতা। বাবা কিন্তু ভোলেন নি। আমার পড়া শুনে শুনে তিনি যে কবে সেটি মুখস্থ করেছেন, জানতেই পারিনি। বাবার জীবনের সঙ্গে কবিতাটির আশ্চর্য মিল ছিল। তাই হয়ত কবিতাটি তাঁর এত প্রিয়। আর সেই জন্যেই তাঁর মনের মধ্যে অমন গেঁথে রয়েছে।

বাবাকে তমিজ ভাইয়ের বাসায় নিয়ে যাওয়া হল। সে-বাসায় নেমে

মহাচীৎকার শুরু করলেন তিনি। ভদ্রলোকের ছেলেরা থাকে কখনও এমন বাড়িতে? এ-সব বাড়িতে থাকার জন্যেই কি তোদের এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম? এর মধ্যে কত রাস্তার ফকির বাদশা হয়ে গেল। আর তোরা কিছুই হতে পারিস নি? ঐতো নফর সরদারের ছেলেটা। কি না নাম? সে নাকি ঢাকায় তিনতলা বাড়ি বানিয়েছে। গাড়ি করেছে দু' দু' খানা। আরও কত লাইসেন্স, পারমিট। গ্রামের কুঁড়েঘর ভেঙে দালান বানাবার জন্যে শুধু ইটই কাটিয়েছে কয়েক লাখ টাকার। অমন ছেলের বাপ হওয়াও পুণ্যের কথা।

বাবার কথা শুনে রীতিমত চমকে উঠি। তাহলে বাবা এতদিন যে-আদর্শ আঁকড়ে ছিলেন, তা শুধু লোক দেখানো? ছাত্রদের কাছে আজীবন যে আদর্শ প্রচার করেছেন, তা শুধু পেটের তাগিদেই? তার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ ছিল না? নিজের জীবনে যা করতে পারেননি, তা কি তিনি দেখতে চেয়েছিলেন সন্তানদের সাফল্যের মধ্যে? আর সেখানেও ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন? তাই কি নফর সর্দারের ছেলের আদর্শই তার পরম বলে মনে হচ্ছে? বাবার জীবনে এর চাইতে বড় পরাজয় আর হতে পারে না. তার প্রতি করুণায় মনটা বিষাক্ত হল।

(তিন)

নানান কাজে বাইরে যেতে হয়। বাবাকে সব সময় দেখাশুনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অথচ তাঁর সেবার জন্যে দরকার সার্বক্ষণিক লোকের। এ সমস্যা সাময়িকভাবে সমাধানের জন্যে বাড়ি থেকে এক ভাইপোকে আনতে হল। বাবা সারাক্ষণ শুয়ে বসে হাঁপিয়ে ওঠেন। বা হাতটা কেন তার কথা শুনে না এ নিয়ে তাঁর অভিযোগের অন্ত নেই। বাবা আগের মত হাঁটতে চান, যেখানে খুশি বেড়াতে চান। সাধ থাকলেও তাঁর যে সাধ্য নেই, বাবা বুঝতে চান না। শিশুর মত বায়না ধরেন। জেদ করেন। খেতে চান না। টুকু তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়ায়।

দাদু, এই দেখ কালশরের কই।

কোথায় পেলিরে?

বাবা উৎসাহিত বোধ করেন। দেখি, দেখি বেশ বড় তো।

ঝণ্ডু কী দিতে চায়? তোমার কথা বললাম তবেই না দিল।

বাবার প্রিয় খাদ্য কই মাছ। আর তা হতে হবে কালশরের। আমাদের বাড়ির পাশের এক বিল। কই মাছের জন্যে বিখ্যাত। খাওয়ার ব্যাপারে যতই অভিমান করুন, কালশরের কই হলে বাবার অভিমান ভাঙতে দেরী হয় না। আজও সকাল থেকে তিনি কিছুই খাচ্ছিলেন না। টুঙ্কু জানে তাঁর দাদুর দুর্বলতা। কালশরের কইয়ের কথা বলতেই তিনি বললেন, শুধু কি মাছই দেখাবি? ভাত নিয়ে আয়, দেখি তোর কালশরের কইয়ের স্বাদ কেমন। বাবা যে সুদূর কালশর থেকে ঢাকা শহরে অবস্থান করছেন, তা তিনি আন্দাজও করতে পারছেন না।

শুয়ে-বসে বাবার হাত-পায়ে খিল ধরে। টুঙ্কু কাছে আসতেই বলেন: একটা লাঠি দে তো।

কেন, লাঠি দিয়ে কি হবে?

একটু হেঁটে বেড়াই, দে না একটা লাঠি।

তোমার শরীর দুর্বল।

দে না, আগে কত বেড়িয়েছি। সেবার না তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম চিলমারী। ঝাড়া দশ মাইল, কোন কষ্ট হয়েছিল আমার? অষ্টমী থেকে যে খেলনা এনেছিলাম, তোর মনে আছে? খেলনাগুলো কই রে?

সাত আট বছর আগে বাবা টুঙ্কুকে নিয়ে গিয়েছিলেন চিলমারীর অষ্টমীতে। তাঁর কাছে সে-ঘটনা এই সেদিনের মনে হচ্ছে।

এই, লাঠি দিলি?

তোমার শরীর খারাপ তো।

না, আমি শুয়ে থাকব না।

ক্ষেপে গিয়ে বাবা তাঁর অক্ষমতার কথা ভুলে যান। বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করেন। তাল সামলাতে না পেরে হুড় মুড় করে পড়ে যান মাটিতে। টুঙ্কু তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে। বাবা গায়ে ব্যথা পান। শিশুর মত ফুপিয়ে কেঁদে ওঠেন।

বললাম, উঠো না। তবু তোমার জেদ। ব্যথা পেলে তো।

কেন আমার এমন হল? এ রোগ কি আমার সারবে না? আমি কি আর হাঁটতে পারব না রে, টুঙ্কু।

এই তো ভাল হয়ে উঠলে বলে। একটা রোগ হলে সারতে সময় লাগে না? আবার হাঁটতে পারবে।

টুক্কুর প্রবোধ শুনে বাবার মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আদিকাল থেকে মানুষ এমনি করে প্রবোধ দিয়ে আসছে অসহায় মানুষকে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে ছলনাও অনেক সময় কত মূল্যবান।

একটু পড়া তেল নিয়ে আয় না। বড় ভাল জিনিস এই পড়া তেল। মালিশ করলে ভারি আরাম লাগে।

টুক্কু একটা ছোট শিশিতে একটু তেল নিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে।

দাদু, এই যে পড়া তেল।

কোত্থেকে আনলি? এত তাড়াতাড়ি!

তাড়াতাড়ি কোথায়। সেই সাত সকালে আসমতকে পাঠিয়েছিলাম হাফেজ মুন্সির কাছে। মুন্সি সাহেবের পড়া তেলের কত নাম। তুমিও তো পসন্দ কর।

মালিশ কর তো। শরীরটা টন টন করছে।

মালিশ করতে করতে টুক্কু এক সময় জিজ্ঞেস করে: ভাল লাগছে, দাদু?

ব্যথাটা কম মনে হচ্ছে। এই পড়া তেল মালিশ করলেই সেরে উঠব রে। আবার আমি হাটতে পারব, তাই না?

হাঁ।

চল্, বেড়িয়ে আসি।

এখনই তো ব্যথা পেলে। ফের ব্যথা পাবে। ঘন ঘন ব্যথা পেলে সেরে উঠবে কেমন করে?

রাখ্ তোর সেরে ওঠা। একটা লাঠি আন্।

অবুঝ হয়ো না দাদু। চুপচাপ শুয়ে থাক।

গেলি। তুই আমাকে একটু ধরবি, দেখিস আমি কেমন টক্ টক্ করে হেটে বেড়াচ্ছি।

অগত্যা টুক্কু একটা লাঠি এনে দাদুর হাতে দিল। নিজে ধরল শক্ত করে।

চল।

ওরা ঘর থেকে বারান্দায় এল।

দেখতো কেমন হাটতে পারি। শরীরটা ভাল হয়ে নিক। প্রথম দিন এমন একটা দৌড় দেব।

বলতে বলতে থমকে দাঁড়ালেন বাবা। একটা মুরগী একটা তেলা-পোকার পেছনে পেছনে ছুটছে। ধরে একটা ঠোকর দিল। তেলাপোকাটা

ছাড়া পেয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পালাবার আগেই দিল আর এক ঠোকর। তেলাপোকাটা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। পর মুহূর্তে আস্ত তেলাপোকাটাকে গিলে ফেল্‌ল মুরগীটা।

শালা আজরাইল।

উত্তেজিত হয়ে বাবা ডান হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারলেন মুরগীটার দিকে। বাবার সমস্ত দেহের ভার টুঙ্কুর ওপর পড়ায় সে বেসামাল হয়ে পড়ল। মেজাজ-টাও ঠিক রাখতে পারল না।

লাঠিটা ছুঁড়ে ফেললে কেন? আর হাঁটতে হবে না। ঘরে চল।

কয়েকদিন পরে তমিজ ভাই বলল: বাবার বোধ হয় এখানে কষ্ট হচ্ছে। বড় ভাইয়ের খোলামেলা বাসা। ওখানে নিয়ে যা। কথাটা বড় ভাইকে জানালে তিনি বললেন: চিকিৎসায় যখন ফল হবে না, তখন আর ঢাকায় রেখে লাভ কি। বাবাকে বরং বাড়িই নিয়ে যা।

(চার)

বাবার ফেরত আসাটা বাড়ির কেউ পসন্দ করতে পারল না। ভালই যদি না হবে, তবে ঢাকা যাওয়া কেন? শুধু শুধু অর্থের অপচয়। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করল: ছেলেদের এত নাম-ডাক শুনি, বাপকে ফেরত পাঠাল এত তাড়াতাড়ি! দূরে থাকলেই বাপের জন্যে দরদ উথলে ওঠে।

বাবার দেখাশুনার জন্যে আজকাল আর তেমন কাউকে পাওয়া যায় না। সবাই যে-যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাবা এখন দিনে-রাতে চব্বিশ ঘন্টাই ছেলেদের কাছে ডাকেন। তাঁর চিৎকারে পাড়া-পড়শীদের দয়া হয়। কিছু ফাই-ফরমাশ খেটে চলে যায়। রাত্রিবেলা এত চ্যাঁচান, তবু কেউ টের পায় না।

বাবা বালিশ বুকে-চেপে চৌকি থেকে গড়িয়ে পড়েন। হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে যান। কপাটে মাথা কোটেন।

এ-অবস্থায় মা-ই বাবার যা কিছু সেবা করছিলেন। একদিন খাবার দিতে দেরী হয়েছিল। বাবা রেগে গিয়ে বললেন: নিজেরা হাঁড়ি হাঁড়ি গিলে তারপর সময় হল আমাকে দেওয়ার?

কত আর হাড় জ্বালাবে আমাদের? যত পার গেলো এখন। মা ভাতের থালিটা দুম করে রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন।

তুমি মেহেরজানের মেয়ে না ? প্রথম স্বামী মরার পর সে তো ধরেছিল আর একটা স্বামী। তারই মেয়ে তো তুমি।

মেহেরজান নানীর নাম। যৌবনে মারা যায় তাঁর প্রথম স্বামী। সেই স্বামীর প্রথম সন্তান মা। নানীকে সব সময় সম্মান করতে দেখেছি বাবাকে। দ্বিতীয় বিয়েটা হয়ত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি বাবা। সুস্থ থাকা-কালে তাঁর এই মনোভাব সঙ্গোপনে গোপন রেখেছিলেন। আজ তার কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ল তাঁর মনের এতদিনের ক্ষোভ।

দেখ, মা তুলে গাল দিও না বলছি, ভাল হবে না।

কেন, সত্য কথা বললে দোস্ত ব্যাজার, তাই না।

কি আমার সত্যবাদীরে—

বাবা মা'র কথায় রেগে গেলেন। বেশ, ভাতই আমি খাব না।

আহ্ মা, তুমিও অবুঝ হলে ? এস বাবা, আমিই তোমাকে খাইয়ে দি।

না, তোর মা আগে মাফ চাক্।

মা মাফ চাও।

মা মাফ চাইলেন। তারপর কাদতে কাঁদতে বললেন : কী লোকটা কেমন হয়ে গেল।

বাবা খেয়ে দেয়ে শুয়ে ছিলেন। খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে ছিলেন বাইরের দিকে। এক সময় অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল। আকাশে কালো মেঘের ছড়াছড়ি। মনের অন্ধকার বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে কোলাকুলি করছে। বাবা আবেশে চোখ বুজে ছিলেন। পাশের ঘরে আমার ছোট মেয়েটা কবিতা পড়ছিল :

> শ্রাবণের ধারা ঝরে ঝর ঝর,
> আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর

হঠাৎ বাবা চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলেন : এটা শ্রাবণ মাস।

না, ভাদ্র।

বাবা বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন : সারা দুনিয়া পানিতে ডুবে গেছে। কবর গেছে ভরে। আর সেই কবরে রেখে আসবে লাশ। কী বীভৎস। এই দেহ—যার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষ কত যত্নে লালন করে আর তাকে কিনা রেখে আসবে ঐ ছোট একটা নোংরা গর্তে। ভাসতে থাকবে কবরের পানিতে! না, না—

বাবা চৌকির ওপর এমনভাবে খড় বড় করে উঠলেন, মনে হল তিনি চলে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এমন জায়গায় যেখানে মৃত্যু বলে কোন বস্তু নেই।

একটু পরে বাবা শান্ত হলেন। আমাকে কাছে ডাকলেন। মিনতি করে বলতে লাগলেন: তোরা আমাকে পানির মধ্যে কবর দিস না রে। কলার ভেলার ওপর শুইয়ে দিয়ে মাটি দিস—বলতে বলতে বাবা আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

তাঁর চোখ দুটো জ্বলছে। ছোট চোখ অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে। বাবার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। বাবা উত্তেজিত। মোষের মত নিশ্বাস নিচ্ছেন তিনি। একটা কাচপোকা একটা তেলাপোকার মাথায় হুল ফুটিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার গর্তের দিকে। তেলাপোকাটা সুড় সুড় করে এগিয়ে যাচ্ছে মন্ত্রমুগ্ধের মত।

বাবা বালিশ বুকে-চেপে ধুপ করে মেঝেতে পড়লেন। আগুন-ভরা চোখে এগুতে লাগলেন কাচপোকাটার দিকে।

বাবা।

তাড়াতাড়ি তাঁকে গিয়ে ধরলাম।

ওঠ।

না, শালার কাচপোকার গুষ্টি নিপাত করব। তেলাপোকাটাকে কেমন করে গর্তে নেয় আমি দেখে নেব।

আচ্ছা, বিছানায় চল।

বাবা বিকারগ্রস্তের মত থর থর করে কাঁপছেন। আমার কথা তাঁর কানে গেল না। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন: ওরে শামসু, আজরাইল-টাকে ঠেকা।

শহীদ আবদুর রশীদের কবর

বশীর আল্‌হেলাল

"মুসাফির, মোছ্‌রে আঁখি-জল
ফিরে চল্‌ আপনাকে নিয়া,
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপনি ঝরিয়া।"
—কাজী নজরুল ইসলাম।

খুব তোড়জোড় চলছে। তোড়জোড় তো সেই কবে থেকে চলছে। রাজধানী যাওয়া হবে, তাব তোড়জোড়। প্রথম ঠিক হয়েছিল ২৬শে মার্চ উপলক্ষে যাবে, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তারপর ঠিক হযেছে ১৬ই ডিসেম্বর যাবে। কিন্তু না, যাব বললেই কি যাওয়া হয। এখন ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে যাওয়াব তোড়জোড় চলছে। তা, ক'মাস এইভাবে গেল, ভালোই হলো। ছেলেটা খানিক ডাঁটালো হলো। ওই রকম কচি বাচচাকে নিয়ে সফর করতে হয়তো কত ঝামেলা হতো। এখনি কি আর ঝামেলা হবে না।

১৬ই ডিসেম্বর না যাওয়ার কারণ ছিল তখন ভরা শীত। কচি ছেলেটাকে আর বুড়ি মানুষটাকে নিয়ে কোথায় ঘোবে, কোথায় থাকে তার ঠিক নেই। একটা দিন যেমন-তেমন করে কাটিয়ে দেয়া। গাছতলায়, কি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, কিংবা শুনেছে বাস-স্টপে সব রোদ-বৃষ্টিতে মাথা গোঁজার ছাউনি রয়েছে, যেখানে হোক, মাঝখানের একটা রাত কাটিয়ে দিয়ে চলে আসবে। সকাল হলে আর একবাব কবর জিয়ারত করে প্রাণ ভরে ফাতেহা পড়ে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরবে। তা ওই রকম শীতে কি রকম অসুবিধা হতো? ছেলেটাকে টানত, না বিছানা-কম্বল টানত?

এখন এই ফেব্রুয়ারীর শেষে আবহাওয়া বড় সুন্দর হয়ে আছে। শীত আছে, কিন্তু মিষ্টি শীত। সাবেরার হৃদয় বড় উতলা হয়ে উঠেছে। কী এক উত্তেজনা তার বুকে ধক্‌ ধক্‌ করে বাজে। যেমন বেজেছিল তার বিয়ের

বাসরে, স্বামী-সম্মিলনের আগে। মৃদু পায়ে বসন্ত নামছে পৃথিবীতে। বেলা চড়লে রোদে ওই বসন্ত প্রখর গন্ধ ছড়ায়। না, আর দেরি সয় না। সাবেরা এবার পাগলিনীর মতো ছুটে চলেছে রাজধানীতে। সেখানে এই নব-বসন্তে স্বামী তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সকাল দুপুর সন্ধ্যা ন্যাড়া বাঁশঝাড়ের মাথা ছুঁয়ে নব-ফাল্গুনের হাওয়া এসে গায়ে লাগে। তখন সাবেরা শাড়ির আঁচলে চোখ মোছে।

ওরা চারজনই যাচ্ছে। সে সাবেরা, কোলের বাচ্চা পলাশ, দেওর মুর্শেদ আর শাশুড়ী। এ যেন শুধু সেই অভিমানী স্বামীর জন্যে যাওয়া নয়, সেই বীর যোদ্ধা ছেলের জন্যে শুধু যাওয়া নয়, কিংবা বিরাট সেই গৌরবময় পুরুষ ভ্রাতার জন্যে কেবল যাওয়া নয়, এই অজ পল্লীতে সেই লোকটার কীর্তির মহিমা যতই হোক বোঝা যায়নি, জানা হয়নি, আমরা শুধোর ব্যাঙ কেবল হাউ-হাউ করে কেঁদেছি, আমি মুর্শেদ গাঁয়ের স্কুলে বিনা মাইনের ছাত্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, আমি সাবেরা সরকারের কাছে হাত পাতলে খয়রাতের টাকাগুলি পেয়েছি, শাশুড়ী বুক চাপড়ে বলেছেন, বউ-মা, ওই টাকা তুমি নিয়ো না, আমার রশীদ তো ওই টাকার জন্যে জান দেয়নি, সাবেরা তখন ঘোমটার নিচে বুক ফাটিয়ে পিঠ কাঁপিয়ে হা-হা করে কেঁদেছে। হ্যাঁ, সেই লোকটার কীর্তির মহিমা বোঝার জন্যেই তো রাজধানীতে চলেছে। বিরাট জায়গা সেই রাজধানী ঢাকা। সারা বিশ্বের তীর্থ। হাজার শহীদ সেখানে শুয়ে রয়েছে। উনসত্তরের শহীদ, সত্তরের শহীদ, একাত্তরের শহীদ, বাহান্নর শহীদ। পলাশের বাপ রশীদ সেই শহীদদেরই একজন। ওখানে মহা-নগরীর বুকে শুয়ে রয়েছে। রাজধানীর বুকে লোকে যত্ন করে কবর দিয়েছে। তাতে মর্মর-ফলকে সুন্দর করে লিখে দিয়েছে "শহীদ আবদুর রশীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা।" সেখানে লোকে ফুল দেয়, বাতি দেয়। শহীদ রশীদের মা বলেন, কেবল আমরাই দেখলাম না।

এবার তাই দেখতে চলেছেন সবাই।

যুদ্ধ শেষ হলে খবরের কাগজে শহীদ রশীদের কাহিনী ছাপা হয়েছিল। গাঁয়ের ছেলে গোলাম রব্বানী আর নেয়ামত ঢাকা থেকে এসেছিল। ওরা তো নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। কেবল বলেছে, হ্যাঁ, শহীদদের কত কবর চারদিকে। গোরস্তানে তো রয়েছেই। রয়েছে রাস্তার পাশে, ফুটপাথে, ট্রাফিক-দ্বীপে। সব বাঁধানো কবর। নাম লেখা রয়েছে।

শহীদ রশীদের মা যখন পরে ঢাকায় ছেলের কবর জিয়ারত করতে যাবেন মনস্থ করলেন তখন একদিন নেয়ামতকে ডাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ বাবা, তা আমার ছেলের কবর খুঁজে পাওয়া যাবে তো? অত বড় শহর তুমি নিজেও তো দেখো নি?

নেয়ামত বলেছে, দাদী-আম্মা, খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে খোঁজ করলে ওরা ঠিক বলে দিতে পারবে।

সেই ভরসাতেই ওঁরা যাচ্ছেন। একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহর সন্তপ্ত জনতার মেলা হয়ে ওঠে। কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে। কত লোক পাওয়া যাবে। শহীদ রশীদের কবর কোথায় এই খবর দিতে পারে এমন একটা লোকও কি আর পাওয়া যাবে না?

মা বললেন, বউ-মা, রশীদের কবরে সন্ধ্যা হলে চেরাগ দিতে হবে। তার কী ব্যবস্থা করছ? মুর্শেদকে একটা টাকা দিয়ে হাটে পাঠাও, ক'টা মাটির চেরাগ নিয়ে আসুক।

সাবেরা বলল, তাহলে তো আবার সরষের তেল নিয়ে যেতে হয় মা। আমি ভাবছি মোমবাতি দেব। একটু বেশি খরচ পড়বে। তা পড়ুক মা। আজকাল মোমবাতি দেয়।

মা বললেন, বেশ। তাহলে মোমবাতি আনিয়ে নাও।

মুর্শেদ বিরক্ত হয়ে বলল, ঢাকা শহরে তোমার মোমবাতির অভাব নাই।

সাবেরা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। মা ঘোলাটে চোখ-দুটি আকাশের দিকে তুলে কী খুঁজতে লাগলেন। তাঁর দুই কুঞ্চিত গাল বেয়েও দু'টি ধারা বয়ে যাচ্ছে। সাবেরা মনে মনে বলছে, আমার এই দেহ-মোমবাতি তোমার জন্যে পুড়েই চলেছে স্বামী। মা মনে মনে বলছেন, তুই একবার তোর সেই তের বছর বয়েসে রাগ করে বাড়ি থেকে তোর খালার বাড়ি পালিয়ে গিয়েছিলি। আমি সেবার তোর মান ভাঙাবার জন্যে নারকেলের নাড়ু বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবার নিয়ে যাচ্ছি মোমবাতি। তোর মান ভাঙবে রে খোকা?

শাপলা ছুটতে ছুটতে টলতে টলতে আসছে। ন্যাংটা, গায়ে গেঞ্জি। ধুলো মেখেছে। এসে দাঁড়িয়ে দু'জনকে দেখল। তারপর মায়ের পিঠে দুম্ দুম্ করে দুটো কিল বসাল, দাদীর পিঠেও দুটো কিল বসাল। আগে জিজ্ঞেস করত, কাঁদছ কেন? কিন্তু দু'জনে এত বেশি কাঁদে যে ওই জিজ্ঞাসা

আর সে করে না। পিঠে কিংবা গালে কিল-চড় মারে। বুড়ি দাদীকেও ক্ষমা করে না। কারণ ওই কান্না তার পছন্দ নয়। কাঁদতে দেখলেই বড্ড তার রাগ হয়। সে তখন তার চাচার তৈরি বাঁশের রাইফেলটি তুলে অমনি তার আব্বাকে যারা হত্যা করেছে তাদের লক্ষ্য করে ক্যাট্-ক্যাট্ করে গুলী ছুঁড়তে শুরু করে দেয়।

এই হচ্ছে তোড়জোড়। তোড়জোড় চলছে। ঢাকায় গিয়ে দুটো রাত একটা দিন যেখানে-সেখানে কাটিয়ে দেবে। না, হোটেলে ওঠার সাধ্য তাদের নেই। ছেলেটার চাকরিই বলতে গেলে সম্বল ছিল। চার-পাঁচ বিঘে জমি রয়েছে। সরকার মাসে একশ টাকা শহীদ-ভাতা দেন। একশ টাকা এখন একশ পয়সার সমান। ওই টাকা সাবেরা অন্য কাজে খরচ করে না। বলে, ওটা শাপলার টাকা, ওতে কেউ হাত দেবে না। ওই টাকা দিয়ে আমি শাপলাকে মানুষ করব। শাপলা আমার অনেক বড় হবে, অনেক বড় হবে।

একগাদা রুটি করে সঙ্গে নেবে, বাস্। কিছু আলু ভেজে নেবে। কেবল পলাশকে এটা-ওটা কিনে খাওয়াবে। বুড়ি মানুষটার ক'টা মাত্র দাঁত। শুকনো রুটি কি আর চিবোতে পারবেন? তিনি বলেন, বাপু, আমার জন্যে চিন্তা ক'রো না। ওখানে যতক্ষণ থাকব, আমার মুখে কি আর কিছু রুচবে?

এই হচ্ছে তোড়জোড়। তোড়জোড় চলছে।

শেষে ২০শে ফেব্রুয়ারী ওরা রওনা হলো। মুর্শেদ ওর এক সহপাঠীর কাছ থেকে এক প্লাসটিকের ব্যাগ ধার করে নিয়ে এসেছিল। তাতে দু-চারখানা গামছা-কাপড়, একটি ছোট বালিশ, ঘটি, টিনের গেলাস আর খাবারের পোঁটলা ভরে স্টেশনে গিয়ে উঠল। মা একখানা ঘি-রঙের পাটের চাদর আপাদমস্তক গায়ে জড়িয়ে সম্ভ্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সাবেরা পরেছে কালো চিকন-পাড় সাদা শাড়ি। সাবেরাকে ওর বিয়েতে ওর স্বামীর এক বন্ধু এক লাল-টুকটুকে হ্যাণ্ডব্যাগ উপহার দিয়েছিল। বিয়ের মাস-ছয় পরে, পলাশ তখন পেটে, ওই বন্ধুর বাড়িই ওরা দু'জন ট্রেনে চড়ে বেড়াতে গিয়েছিল, এই তো দুটো স্টেশন পর, মনে পড়ে, ওই টুক্টুকে হ্যাণ্ডব্যাগটি হাতে ঝুলিয়ে। ব্যাগটা এখনো আছে। আজ হাতে সেই ব্যাগ তো দূরের কথা, একগাছা করে চুড়িও নেই। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সাবেরা শাপলাকে বুকে চেপে ধরল। মনে মনে বলল, আমার তুই রয়েছিস শাপলা।

শাপলার খুব আনন্দ। ট্রেনে চড়বে। সে কোলে থাকতে চায় না। নামিয়ে দিলে ছুটোছুটি করে। চারদিকে ছেলেধরার উপদ্রব হয়েছে খুব। কখন হঠাৎ ট্রেন এসে পড়ে।

আর সবার আনন্দ নেই কিন্তু উত্তেজনা আছে। রাজধানীতে গিয়ে একদিন থেকে চলে আসা, এই ব্যাপারটা মুর্শেদের ভালো লাগছে না। ওখানে কত কি দেখার থাকবে! কত সভা, অনুষ্ঠান, কবিতার আসর। একদিনে তার কতটুকু দেখাশোনা যাবে। আর ঐ একটা দিন তো এই মেয়েমানুষ-দুটিকে নিয়ে ঘুরতেই কেটে যাবে।

মুর্শেদ আজকাল কবিতা লিখছে। হ্যাঁ, সে কবি হবে। আসলে বড় ভাইয়ের শাহাদতই তাকে কবি করেছে। দু'টি কবিতা সে নিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারী সকালবেলা বাংলা একাডেমীতে কবিতা-পাঠের আসর হয়। বলা যায় না যদি ওখানে কবিতা পড়ার সুযোগ জুটেই যায়।

মধ্যরাতের আগে ওরা কমলাপুর স্টেশনে নামল। স্টেশনের বিরাট উঁচু ঢেউ-খেলানো ছাদ। দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম সাদা আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে। সাবেরা মাথার উপরে এবং চারিদকে তাকিয়ে কেমন ভয় পেয়ে গেল। মা তাঁর বিহ্বল দৃষ্টি কোনো দিকে না পাঠিয়ে পায়ের কাছে ফেলে রাখলেন, ঘোমটা আরো টানলেন, ছেলের বাহু শক্ত করে ধরলেন। যেদিকে যান সেদিকেই যেন মানুষজনের গমগমানির আগুন গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। ঘুমন্ত শাপলাকে কাঁধে নিয়ে মুর্শেদ ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

কিন্তু মুর্শেদ কী পথ দেখাবে। সে নিজেই পথ চেনে না। তারও ভয় ধরে গেছে। এই প্রথম তার ঢাকায় আসা। যেন নতুন এক কিশোর মাঝি তার ছোট নাউটিকে নিয়ে হঠাৎ ছোট খাল থেকে ভাদ্র মাসের উত্তাল গাঙে পড়ে থ বনে গেছে। কোলাপ্‌সিব্‌ল গেটে টিকিটগুলো দিয়ে ওরা খোলা চাতালে একটি থাম ঘেঁষে দাঁড়াল। এখানে-ওখানে লোকে কাঁথামুড়ি দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। একদম খালি-গায়েও কুকুরের মতো গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে লোক। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। মা ভাবছেন, আহা, লোকগুলি ঠাণ্ডায় বড় কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু ওরা এখানে এইভাবে এই ঠাণ্ডা পাকা মেঝের শুয়ে রয়েছে কেন?

দেখতে দেখতে ট্রেনের লোকজন, কোলাহল কোন্‌দিকে চলে গেল। এখন প্রবল বায়ু সরে যাওয়ায় যেন নদীর ঢেউ মাথা নামিয়েছে। এখন

কেবল কিছু কুলু কুলু ধ্বনি। ছোট ছোট ছোঁড়ারা পান সিগারেট ফিরি করে বেড়াচ্ছে। মা বললেন, মুর্শেদ, ছেলেটাকে ঘাড়ে করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি ?

তখন ব্যাগ থেকে কাপড় বালিশ বের করে শক্ত ঠাণ্ডা মেঝেয় শয্যা রচনা করা হলো। তাতে শাপলাকে শোয়ানো হলো। সাবেরা বলল, মা, আপনাকে শীতে ধরেছে। আপনি শাপলার পাশে বসেন।

মা বসলেন। তাঁর সত্যি ঠাণ্ডা লেগেছে। এই ফেব্রুয়ারীর শেষে যে এত ঠাণ্ডা পড়তে পারে তিনি ভাবেন নি। রাজধানীর ঠাণ্ডা তিনি এই প্রথম দেখছেন। সাদা কাচের মতো ঝক্‌ঝকে আলো আর সাদা কাচের মতো ঝক্‌ঝকে ঠাণ্ডা। তাঁকে বুঝি এখনি মাটিতে ফেলে কেটেকুটে খান্ খান্ করে দেবে। আহা, আমার বাচ্চা এই ঢাকার মাটিতে কোথায় এই ঠাণ্ডায় শুয়ে রয়েছে।

মা বললেন, কিসের এত গন্ধ নাকে লাগে মুর্শেদ ? আমার গা বমি-বমি করে ?

মুর্শেদ বলল, চারদিকে সব ফকির গরীবের ভিড় দেখছ না ? হেগে-মুতে সব কি করে রেখেছে, আখ্-থু—!

ও-পাশে সরে গিয়ে সে থুতু ফেলে এল।

মা বললেন, মুর্শেদ, আমি ওজু করব। দেখ্ বাবা, কোথায় পানি পাওয়া যায়।

মুর্শেদ বলল, এখন তুমি নামাজ পড়তে বসবে ? এই তোমার নামাজ পড়ার সময় ? কাল কত হাঁটতে হবে, কত জায়গায় যেতে হবে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও মা।

মা বললেন, এখানে আমার ঘুম আসবে না, বাবা।

মুর্শেদ ঘটি নিয়ে পানির খোঁজে গেল। একটু পরেই পানি নিয়ে ফিরে এল। বলল, ওদিকে পায়খানা-টায়খানা আছে। দরকার হলে আমাকে ব'লো ভাবী। তবে সাংঘাতিক নোংরা।

মা ওজু করে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলেন, পশ্চিম কোন্‌টা ?

মুর্শেদ চারদিকে একচক্কর ঘুরে নিয়ে বলল, এই যে এই দিকে হবে বলে মনে হয়।

মা সন্দিগ্ধ মনে লম্বা করে গামছা বিছালেন। তাতে পা মুড়ে বসলেন। পরনের থানের খুঁট থেকে তসবিহ খুলে নিলেন। তারপর যাবতীয় দুর্গন্ধ, নোংরা যত মানুষের পায়ের আর নাকের শব্দ, দূরাগত ট্রেন-ইঞ্জিনের এবং মালগাড়ির শান্টিঙের শব্দ অগ্রাহ্য করে নামাজে এবং ওজিফায় মগ্ন হয়ে গেলেন। সাবেরা দেখতে দেখতে ছেলের পাশে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ল। মুর্শেদ কোন্‌দিকে কেমন সব পথ-ঘাট তাই দেখে-শুনে রাখার জন্যে স্টেশনের বাইরে পা বাড়াল।

তারপর এক সময়, তখন রাত বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছিল, ঠাণ্ডা বেড়েছে, ও-পাশের প্লাটফর্মে একটা একলা-ইঞ্জিন এসে চীৎকার জুড়ে দিয়েছিল, তাতে সাবেরার ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু পলাশ এখনো ঘুমোচ্ছে, তিনজনে জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে, তখন হঠাৎ দূরে কোথায় মিলিত অনেক মৃদু সুরেলা উচ্চারণ শোনা গেল। মুহূর্তে এরা উচ্চকিত হয়ে উঠল। এ যে সেই গান। কোন্‌দিকে ? মা বললেন, মুর্শেদ, ভোর হয়েছে নাকি ? এখানে এত আলো, কিছুই বোঝা যায় না। ওঠ্, চল্।

বলতে বলতে তিনি তাঁর বাঁকা পিঠ তুলে দাঁড়ালেন। সাবেরা ছেলেকে ঘাড়ে তুলে নিল। মুর্শেদ ব্যাগে গামছা ইত্যাদি গুটিয়ে নিয়ে ঘাড়ে ঝোলাল। মায়ের হাত ধরল। মা বললেন, আমার যে ফজরের নামাজ হলো না মুর্শেদ ?

মুর্শেদ সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল, মা, প্রভাত-ফেরী বেরিয়েছে।

সেই পরিচিত গান তখন আরো দূরে সরে গেছে : "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি ?" মুর্শেদের হাতে অশ্রুর গরম ফোঁটা ঝরে পড়ল। মা কাঁদছেন।

ওরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু প্রভাত-ফেরীটাকে কোথাও দেখা গেল না, তার গানও শোনা গেল না। মা চোখে বেশি দূর দেখতে পান না। তবু তিনি চোখ তুলে কপালের উপর হাত রেখে দেখার চেষ্টা করলেন। আকাশে আলো ফুটেছে। বড় সুন্দর হয়েছে পুব-আকাশের রূপ। যেন হাজার পায়রা পাখা মেলেছে ওখানে।

ওরা এগিয়ে গেল। এই রাস্তাটা আর এক রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে দেখা গেল বাঁয়ে প্রত্যুষের ধূসর অন্ধকার থেকে এক

মিছিল বেরিয়ে আসছে। কন্ঠে সেই মৃদু সুললিত গান। মিছিলের পায়ের দিকে তাকিয়ে মুর্শেদ বলে উঠল, ভাবী, মা, জুতো খোলো!

ওরা তাড়াতাড়ি পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে ব্যাগে পুরে মিছিলে সামিল হয়ে গেল।

কিন্তু মিছিল বড় দ্রুত চলছে। যেন প্রত্যুষের হাওয়া। ধরে রাখা মুশকিল। মা পিছিয়ে পড়ছেন। মুর্শেদ বিরক্ত হয়ে বলল, মা, অত আস্তে চললে চলবে কেন?

মা অসম্ভব চেষ্টায় জোরে পা ফেলার চেষ্টা করে বললেন, আমি যে পারি না রে?

মিছিল হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। মা একজনকে আঁকড়ে ধরে বললেন, বাবা, তুমি শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় জানো?

ছেলেটা তো আকাশ-পাতাল ভেবে বলল, শহীদ আবদুর রশীদ? কিসের শহীদ?

মুর্শেদ বলল, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ।

ছেলেটা বলল, নাম শুনিনি তো।

বলে সে মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে গেল। এরা পেছনে পড়ে রইল।

তখন দেখা গেল আর এক প্রভাত-ফেরী আসছে। তার সামনে দুই ফুটফুটে মেয়ের হাতে বিরাট এক ফুলের মালা। ওরা এই মিছিলেও সামিল হলো। মিছিল এত দ্রুত চলছে যে কারো সঙ্গে কথা বলাই দায়। মা খপ্ করে একজনের হাত ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, তুমি শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় জানো?

ছেলেটা তো অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে জিজ্ঞেস করল, কেন?

মা বললেন, আমি তার মা। এই যে এ তার ছেলে।

শাপলা তখন মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ঢাকা নগর দেখছে। ছেলেটা বলল, আমি বলতে পারব না।

ব'লে জোরে হাঁটা শুরু করল। কারণ তার মিছিল এগিয়ে গেছে।

রোদ উঠে গেছে। বড় মিষ্টি রোদ রাস্তায় এসে পড়েছে। কুয়াশাগুলি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে কিশোর-কিশোরী ফুল হাতে চলেছে। ছোট ছোট মিছিল চলছে। মায়ের ঠাণ্ডা আড়ষ্ট শরীরের বাঁধনগুলি

রোদের তাপে খুলে যেতে লাগল। তিনি তোবড়ানো গাল-দুটি তুলে যাকে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন, বাবা, শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় বলতে পারো?

কেউ বলতে পারে না।

ট্রাকে চড়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে একদল চলে গেল। মুর্শেদ ভাবল, ওই ট্রাকে যদি মা-কে তুলে দেয়া যেত। উনি যে হাঁটতে পারছেন না, আরো পারবেন না। সে একজনকে জিজ্ঞেস করল, শহীদ মিনার কদ্দুর এখান থেকে?

সে জানাল, বেশি দূর নয়, এক মাইল হবে।

এক মাইল হবে? মা তো অত পথ হাঁটতে পারবেন না। আর পারলেও যেভাবে হাঁটছেন, ক'ঘন্টা যে লেগে যাবে। সাবেরা বলল, মুর্শেদ, রিকশা করো।

মা বললেন, কেন, রিকশা কেন? আমরা কি দাওয়াত খেতে বেরিয়েছি। দেখছ না সবাই ফুল হাতে হাঁটছে? আমাদের হাতে একগোছা ফুলও নাই। শহীদ মিনারে গিয়ে কি দেব?

মুর্শেদ বলল, মা, তুমি তো হাঁটতে পারছ না। শহীদ মিনারে যেতে কত সময় লেগে যাবে ভেবে দেখো। সেখান থেকে আবার ভাইয়ার মাজার খুঁজতে বেরোতে হবে। শহীদ মিনারে দেখবে কত লোক। ওখানে ঠিক খোঁজ পাওয়া যাবে।

মা বললেন, তাহলে কর্, রিকশা কর্।

দুই রিকশা লাগল। একটাতে মা আর সাবেরা। অন্যটাতে শাপলাকে নিয়ে মুর্শেদ উঠল। তাতে শাপলার খুব আনন্দ হলো। সে হাততালি দিতে লাগল। মায়ের বুকও কেমন গর্বে ভরে উঠেছে, বিমল অশ্রুমাখা গর্বে। হাতে ফুল নিয়ে চলেছে পুরুষ-নারী শিশু-কিশোরী। চলেছে শহীদ মিনারে। শহীদদের কবরে ওরা ফুলের পাপড়ি আর চোখের পানি ফেলতে চলেছে। সেই সব শহীদের একজন তাঁর ছেলে। তিনি চলেছেন শহীদ-জননী।

শহীদ মিনারে পৌঁছে তো মা স্তম্ভিত। এত লোক! লোক গিজ্ গিজ্ করছে। গান হচ্ছে, শ্লোগান হচ্ছে। হাতে হাতে ফুল। ছেলের বাহু আঁকড়ে ধরে তিনি তাঁর বাঁকা পিঠ যদ্দূর সম্ভব সোজা করে শহীদ মিনারের দিকে তাকালেন। শহীদ মিনারের উচ্চ চূড়া মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মিনারের চাতালে লোক গিজ্ গিজ্ করছে। ওরা ওখানে কী করছে? ফুল দিচ্ছে? আমার ফুল নেই, কিন্তু পুত্র ছিল, আমি তাই দিয়েছি। আমার অশ্রু আছে, তাই দেব।

কিন্তু সিঁড়িগুলি ডিঙিয়ে ওখানে যে কেমন করে যাওয়া যাবে সেই পন্থা বের করতেই বহু সময় চলে গেল। যেদিক দিয়েই চেষ্টা করে, যাওয়া যায় না। মানুষের প্রাচীর পথ আগলে বসে রয়েছে। শেষে জানা গেল, লাইন রয়েছে, লাইনে দাঁড়াতে হবে। অনেক কষ্টে লাইনের লেজুড় খুঁজে পাওয়া গেল। সে আসলে ক্রুদ্ধ অজগরের লেজুড়, মাঝে-মাঝেই ঝাপটা মারছে। মা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন সাধ্য কী। মুর্শেদ কয়েকজনকে বলল, ইনি একজন শহীদের মা। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে, এঁকে একটু আগে যেতে দিন।

এক তরুণ জিজ্ঞেস করল, শহীদের নাম কি?

মুর্শেদ বলল, আবদুর রশীদ।

আবদুর রশীদ? নাম তো শুনিনি?

আর এক তরুণ বলল, অনেক ভেজাল শহীদ বেরিয়েছে বাজারে।

এত হুজ্জত দেখে মায়ের কোলে শাপলা কেঁদে উঠল। সে বলছে, চলো মা, বাড়ি যাই। ট্রেনে চড়ে বাড়ি যাই।

অতএব শহীদ মিনারে মায়ের অশ্রু দেয়া আর হলো না। অশ্রু তিনি যা দিলেন রাজপথে দিলেন, মানুষের পদতলে যা নিমেষে ধুলো হয়ে গেল।

অনেককে জিজ্ঞেস করা হলো শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় কারো জানা আছে কিনা। নতুন আজিমপুর গোরস্তানে মুক্তিযুদ্ধের অনেক শহীদের কবর আছে জানা গেল। আজ শোকার্থী পদচারীদের দিন। তাই ওখানে যেতে রিকশা পাওয়া গেল না। মুর্শেদ একবার ভেবেছিল মা-কে ঘাড়ে তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু যে-কাজ গ্রামে চলে সে-কাজ এই চৌকস শহরে চলে না। লোকে হাসবে। হয়তো ঈসপের গল্পের সেই বোকা বলেই ধরে নেবে তাকে। হয়তো বলবে, দেখো কাণ্ড, মা নেয় সন্তানকে বুকে, এ যে দেখি বড় রসের উলটো কাণ্ড। ইতিমধ্যে মুর্শেদের এই রাজধানী সম্পর্কে যেটুকু ধারণা হয়েছে সে হচ্ছে এই যে এখানকার মানুষের মেজাজ বড় নিষ্ঠুর। এরা কাঁদে যদি, ভালো করে কাঁদে না, হাসে যদি, ভালো করে হাসে না।

তবু মা গোরস্তানে পৌঁছুতে পারলেন। ইয়া আল্লাহ্! এমন আলীশান গোরস্তান। আল্লা তাঁর পৃথিবীতেই কি বেহেশত্ রচনা করে রেখে দিয়েছেন

নাকি ? তাঁর বুক ভরে গেল। গেটে ঢুকতে ডাইনেই শহীদদের এক সার কবর। সেখানে বেশ কিছু জিয়ারতকারী। একটি কামিনী গাছের নীচে ক'টি কম-বয়েসী ছেলে আর মেয়ে ভালো পোশাক-আশাক পরে দাঁড়িয়ে খুব গল্প লাগিয়েছে। ওদেব কেউ একজন এখানে এই শহীদদের সাথে শুয়ে রয়েছে। সেই একজন নাকি ডাঁসা পেয়ারা আর মুরগীর মাথা খেতে ভালো-বাসত। তারি সরস আলোচনা চলছে। ওদের পোশাকে একটা গন্ধ আছে, কিন্তু সেই গন্ধ গোরস্তানের পবিত্র গন্ধ নয়। মা মুর্শেদকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, এরা কি খ্রীস্টান ?

মুর্শেদ গলা নামিয়ে বলল, চুপ করো মা, চুপ করো। কী যে বলো তার ঠিক নেই।

শহীদদেব কয়েকটি কবর বাঁধানো, বেশির ভাগ এখনো বাঁধানো হয়নি। কিন্তু প্রত্যেকটিতে নাম লটকানো আছে। মা পায়ে-পায়ে এগিয়ে যান। কবরের গায়ে স্নেহে-আদরে হাত বুলিয়ে দেন। অশ্রু ফেলেন। মুর্শেদ শহীদের নাম পড়ে। এক-এক করে সব কবর জিয়ারত করা হলো। কিন্তু রশীদের নাম পাওয়া গেল না। মা কাঁদছেন, দোয়া-দরুদ পড়ছেন। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, তোমরা কি শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় জানো ?

কেউ কিছু বলতে পাবে না।

শাপলা কখনো মায়ের কোলে, কখনো চাচার কোলে। সে মাঝে-মাঝেই কাঁদছে। তার কিছুই ভালো লাগছে না। বলছে, চলো, বাড়ি যাই, ট্রেনে চড়ে বাড়ি যাই।

বাইবে এসে তাকে একটি লজেন্স কিনে দেয়া হলো। এবার রিকশা পাওয়া গেল। রিকশায় চড়ে ওরা বাংলা একাডেমীর গেটের কাছাকাছি নামল। এখানেও লোক থই-থই করছে। লোক যাচ্ছে, আসছে। বেশির ভাগ খালি-পা বলে শব্দ বাজছে কম। একুশের সঙ্কলন ফেরি করে বেড়াচ্ছে ছেলেরা, মেয়েরা। ভেতরে গম্-গম্ করে মাইক বাজছে। হ্যাঁ, কবিতা-পাঠ চলছে। মুর্শেদ তার বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখল, হ্যাঁ, কবিতা দু'টি আছে। সে চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু মা'কে নিয়ে হয়েছে ফ্যাসাদ। ভাইয়ার কবর যে খুঁজে পাওয়া যাবে না সে ব্যাপাবে এতক্ষণে সে নিশ্চিত হয়েছে, কিন্তু মা'কে সে-কথা বলা যায় না। মুর্শেদ এখানে গেটে দাঁড়িয়ে

ভেতরের সুসজ্জিত প্যাণ্ডেল দেখছে, মানুষের ঢল দেখছে, মনোরম কালো মঞ্চে মেদুর আলোকে কবিদের বসে থাকতে দেখছে, কবিতা-পাঠ দেখছে, ওদিকে মা যত লোক ধরে-ধরে জিজ্ঞেস করে ফিরছেন, বাবা, তোমরা কি শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় জানো ? মা'কে আর ভাবীকে দু'টি চেয়ারে এখন ওখানে বসিয়ে দিতে পারলে ওদের বিশ্রামও হতো, একটি কবিতা পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় কিনা তার ধান্দায় ওদিকে একটু ঘোরাও যেত।

কিন্তু দেখতে দেখতে ওদিকে ফুটপাথে মা'দের ঘিরে কিছু লোক জমে গেল। মুর্শেদ গিয়ে দেখে মা প্রায় বক্তৃতাই ফেঁদে বসেছেন। তিনি নিজেকে সাবেবাকে আর শাপলাকে জনতার কাছে পরিচিত করাচ্ছেন। জনতা আনন্দ পাচ্ছে। কারণ গ্রামের ওই বুড়ি মেয়েটার গল্প বিশ্বাস হয়, আবার সন্দেহও জাগে। হতেও পারে তার ছেলে বড় বীর ছিল। হতে পারে এরা লোক ঠকাতে বেরিয়েছে। লোকে আনন্দ পাচ্ছে। সত্যি, একুশে ফেব্রুয়ারী বড় বিরাট এক বিবিধ শোকের উৎসব হয়ে উঠেছে আজ।

মুর্শেদ তখন তার মা'দেরকে ওই ভিড়ের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এল। এক মাঝ-বয়েসী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে মুর্শেদের কানে ফিশ্ ফিশ্ করে বললেন, এই যে খোকা, এটা নাও।

তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে একটি দশ টাকার নোট। মুর্শেদ অবাক হয়ে বলল, কেন ?

ভদ্রলোক কাচুমাচু করে বললেন, শহীদ আবদুর রশীদ না কী বলছিলেন, তাঁর ওই ছেলেকে মিষ্টি কিনে দেবেন।

মুর্শেদ বলল, না, আমরা ভিখারী নই।

ভদ্রলোক তখন হতভম্ব হয়ে মাফ চেয়ে চলে গেলেন।

তখন একটি সাদা জমিনের কালো-পাড় শাড়ি পরা মেয়ে কোত্থেকে এসে মায়ের হাতে একগোছা লাল-সাদা ফুল গুঁজে দিল। উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে শেষে মায়ের দুই গাল বেয়ে অশ্রু নেমে এল।

লাভ হলো এইটুকুই যে কিছু জায়গার সন্ধান পাওয়া গেল যেখানে যেখানে শহীদদের কবর রয়েছে। এইসব জায়গা মীরপুর থেকে মালিবাগ চৌধুরী-পাড়া রামপুরা খিলগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত। শাপলাকে নিয়ে হলো মুশকিল।

সে আর কিছুতেই এভাবে ঘুরবে না। মুর্শেদ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁ রে, এত বড় রাজধানী তোর ভালো লাগছে না ?

না, রাজধানী তার ভালো লাগেনি। সে কেবল কাঁদছে আর বলছে, চলো, বাড়ি যাই। ট্রেনে চড়ে বাড়ি যাই।

রেসকোর্সের মাঠে গাছতলায় গিয়ে বসা হলো। রেসকোর্সের ঠাণ্ডা মাটি মায়ের পায়ে শান্তি দিল। তাঁর পায়ের তলায় ফোস্কা পড়ে গেছে। খাবারের পোঁটলা খুলে শাপলাকে খাওয়ানো হলো। মা বললেন, মুর্শেদ, তুইও খেয়ে নে বাবা। বউ-মা, তুমিও খেয়ে নাও।

মুর্শেদ খেলো। সাবেরাও না খাওয়ার মতো করে খেল। কিন্তু মা খেলেন না। বললেন, আমি রোজা রেখেছি। রশীদের কবরে আমি সারাদিন নামাজ-কালাম পড়ব। সূর্য ডুবলে মুখে পানি দেব।

আবার সন্ধান চলল। পদব্রজে, রিকশায়, বাসে সারা শহর ঘুরে বেড়ানো হলো। শহর তো নয়, একটা পৃথিবী। অনেক কবর দেখা হলো। কিন্তু রশীদের কবর পাওয়া গেল না। যে-সব কবরে নাম নেই সেগুলির কোনোটির জন্যেও কেউ বলল না সেটা রশীদের হতে পারে। শোনা গেল, শেরে-বাংলা নগরে এক মুক্তিযোদ্ধার কবর রয়েছে। সেখানে যাওয়া হলো। না, সে কবর রশীদের নয়। ওরা খবরের কাগজের অফিসগুলিতে গেল। কিন্তু সব ফাঁকা, আজ ছুটি ! থানায় গেল। থানা বলল, এ বাপু, আমাদের কাজ নয়, মিউনিসিপ্যালিটির কাজ।

মহাখালীতে এক কবর পাওয়া গিয়েছিল, তাতে লেখা ছিল শহীদ আবদুল মজিদ। কেউ বলতে পারল না কোথাকার লোক, কেমন দেখতে ছিল।

শাপলাকে আর বয়ে বেড়ানো যায় না। সে ঘাড়ে ঘুমিয়ে চলেছে। দুপুর গড়িয়ে চলল। বাংলাদেশ বেতারের সামনে বাসের স্টপের এক ছাউনিতে গিয়ে ওরা ভগ্ন-দেহে বসল। একটা কুকুর শুয়ে ছিল, বেচারা অনিচ্ছায় পালিয়ে গেল। মা গড়িয়ে পড়লেন। মনে হলো মূর্ছা গেছেন, দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। কিন্তু মুখে পানি দিতে গেলে তিনি জেগে উঠলেন, বাধা দিলেন। খানিক পরে উঠে ওজু করে জোহরের নামাজটিও পড়লেন।

রাস্তা কাঁপিয়ে বড় বড় বাস যাচ্ছে, ট্রাক যাচ্ছে, ছোট-ছোট সুন্দর সুন্দর গাড়িও যাচ্ছে। সাবেরা ভাবছিল, কেন এসেছিলাম ? এমন বোকামিও কি মানুষ করে ?

মুর্শেদ ভাবছে, ঢাকায় আমাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই সে-তো জানা কথাই। আমরা সারাদিনের যা হোক খাবারের সংস্থান করেই বেরিয়েছিলাম। তবু মনে মনে একটা আশা ছিল, বরং বাসনা ছিল : শহীদ পরিবার, মফস্বল থেকে ঢাকায় এসেছে, এসেছে একুশে ফেব্রুয়ারী, এসেছে শহীদের কবর খুঁজে পেতে, আশা ছিল, বরং বাসনা ছিল : কত লোক এসে বলবে, আসুন, আমাদের বাসায় দুপুরে চাট্টি খাবেন, আসুন, আমাদের বাসায় রাতটা থাকবেন। মুর্শেদ বলল, আমরা আমাদের কথা ভাবছি। কী পেলাম না তাই ভাবছি। কিন্তু সেই শহীদ পেয়েছে ? কিছুই কি পেয়েছে ? তার কবর ফুল পায়নি, মোমবাতি পায়নি। না পাক। কিন্তু তার স্বপ্ন কী পেয়েছে ? তার রক্ত কী পেয়েছে ?

সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। যিনি দশটা টাকা দিতে চেয়েছিলেন, সেই মেয়ের কথা মনে পড়ল যে মা'কে ফুল দিয়েছিল। না, এদিক-সেদিক ভালো লোকও সব আছে, যাদের বুকে কান্না আছে। কিন্তু কান্নাকে ফাটিয়ে তোলার সাধ্য কারো নেই।

শক্ত সিমেন্টে গামছার ওপর শাপলা ঘুমোচ্ছে।

মা নামাজ শেষ করে বললেন, মুর্শেদ, আমাকে সেইখানটায় নিয়ে চল্।

কোন্‌খানটায় ?

সেই যে যেখানে শহীদ আবদুল মজিদের কবর রয়েছে।

সেখানে গিয়ে কি করবে ?

ফাতেহা পড়ব।

কেন মা ?

ওটা আমার রশীদের কবরও হতে পারে। হয়তো ওরা নামের ভুল করেছে।

তাই বুঝি কেউ করে ?

মা বললেন, না, আমি ওখানে যাব। বাসে যাওয়া যাবে না মুর্শেদ ? রিকশায় চড়ে-চড়ে তো সব শেষ করে ফেললি। ক'টা মোমবাতি দেখ্ কোথায় পাওয়া যায়, কিনে নে।

শাপলাকে ঘাড়ে তুলে ওরা আবার যাত্রা করল।

বাড়ি তৈরি হওয়ার পর এক ফাঁকা জায়গায় একজনের শ্যাওলা-ধরা ভাঙা ইটের বিরাট স্তূপ পড়ে রয়েছে। তার পাশে কাঁটা-ন'টের গাছে ঘেরা

কবরটি। কবরটিকে কারা ওই ভাঙা ইট দিয়েই বাঁধিয়ে রেখে গেছে। একটি বাঁশ পুঁতে তাতে একটি ছোট টিনের নাম-ফলক ঝুলিয়ে রেখে গেছে। তাতে লেখা : শহীদ আবদুল মজিদ। মা কবরের পাশে ঘাসে পশ্চিমমুখী পা দুমড়ে বসে মাথায় ঘোমটা টেনে ফাতেহাখানি শুরু করলেন। সাবেরাকে বললেন, মা, তুমিও পড়ো।

কিন্তু সাবেরা শুনল না। সে ছেলেকে নিয়ে ওদিকে ঘুরতে গেল। মুর্শেদেরও এইসব ভালো লাগছে না। সে একপাশে ব্যাগটি নিয়ে বোকার মতো বসে রইল। কার না কার কবর। এখনি যদি লোকে এসে জিজ্ঞাসা শুরু করে সে কী বলবে?

কিন্তু মায়ের মনের ভাব ওরা বোঝে না। তিনি কখনো তসবিহ জপছেন কখনো কেরাআত পড়ছেন। দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। অশ্রুটাকে তিনি দমন করার চেষ্টা করছেন, কারণ এত শোক আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, তাঁর এবাদৎটুকু, এই প্রার্থনাটুকু যদি আল্লাহ্ গ্রহণ না করেন তাহলে লাভ কী হলো? কিন্তু তিনি দমন করতে পারছেন না। বারবার তাঁর ছেলের মুখ মনে পড়ছে। দুশমনের গুলী খেয়ে যখন সে পড়ে গেছে, রক্তে-ভেজা মাথাটা এপাশ-ওপাশ করছে, তখন নিশ্চয় এই মা হতভাগীর মুখ তার মনে পড়েছিল। তার কতদিন পরে আমি জেনেছি রশীদ, তুই আর নেই। বাবা রে, তোর কাছে আমি এসেছি, এই দেখ্, তোর কাছে আমি এসেছি। তুই এখন শান্তি পা বাবা।

রশীদ হয়তো এই কবরে নেই। থাকতেও তো পারে। যদি না থাকে, তার কোনো এক সাথী, সহযোদ্ধাই তো আছে। সেও আমার ছেলে। সেও গুলী খেয়ে তড়পাবার সময় তার মায়ের মুখ মনে করেছিল। ওরা সবাই আমার ছেলে। নিশ্চয় এখানে আমার এক ছেলে রয়েছে।

হ্যাঁ, লোকজন, ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা চলে গেছে। কারো খুব কৌতূহল নেই, স্পৃহা নেই। মানুষের জীবন থেকে ওই দুটো জিনিস উবে গেছে।

সন্ধ্যা হলে, আজান পড়লে মা মোমবাতিগুলি জ্বেলে দিলেন। কয়েক গণ্ডুষ পানি খেলেন। মগরেবের নামাজ পড়লেন। তারপর দীর্ঘ এক অশ্রুরুদ্ধ মোনাজাত সেরে বললেন, চল্ মুর্শেদ, এবার আমরা ফিরি।

স্টেশনে ফিরতে বেশ রাত হলো। দুর্গন্ধ কম এমন একটা জায়গা বেছে এক প্লাটফর্মে গিয়ে বসা হলো। শাপলা আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে

সামান্য শয্যা পেতে শুইয়ে দেয়া হলো। মা এবার একদলা সুজি দিয়ে একটি শক্ত রুটি অনেক কষ্টে চিবিয়ে চিবিয়ে খেলেন। কিন্তু কাঁদছেন। ঘোলাটে চোখে উজ্জ্বল আলোগুলোকে দেখছেন আর কাঁদছেন। তাঁর চোখের কোনাগুলি কেঁদে কেঁদে সাদা হয়ে গেছে। মুর্শেদ ঘটি ভরে পানি নিয়ে এল। মাকে পানি খাওয়াল। তারপর নিজে খেতে বসল। কিন্তু সাবেরা খেল না। তাকে খাওয়ানো গেল না।

খাওয়া সেরে মুর্শেদ একটু ঘুরতে গিয়েছিল। নিজে একটি পান খেল। ভাবল, ভাবীর জন্যে এক-খিলি নিয়ে যাই। পানের খিলিটি নিয়ে এসে দাঁড়াতে দেখল ভাবী নীরবে কাঁদছে, দুই গাল বেয়ে তার অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছে। মুর্শেদকে দেখে তার শরীর আক্ষেপে আন্দোলিত হতে লাগল।

মা শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। শাপলা ঘুমোচ্ছে। তার মুখে ঢাকার পথের ধুলোর একটি মলিন প্রলেপ। কিন্তু উল্টোদিকের প্লাটফর্মে হঠাৎ কোত্থেকে ফোঁশ্-ফোঁশ্ করতে করতে এক ইস্টিমের ইঞ্জিন এসে সিটি মারতে শুরু করলে শাপলার ঘুম ভেঙে গেল। সে তারস্বরে কেঁদে উঠল। মনে হলো তার গলা-চেরা কান্নার শব্দ ইঞ্জিনের চীৎকারকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে।

দিবানিদ্রা

রশীদ হায়দার

কাগজে খবরটি বেরিয়ে যাবার পর ইউনুসের একটা গাঢ় ঘুম হয়। অন্যান্য দিন সকাল সকাল তার ঘুম ভাঙে, প্রত্যেক দিনই সে শুয়ে শুয়ে শোনে পাশের বাসায় এনামুলের নানা ফ্যাসফেসে গলায় কোরান শরীফ পড়ছেন। অনেকদিন সে ভেবেছে, বুড়ো মানুষটার গলায় সুর নেই, কিন্তু সুরেলা করার চেষ্টা তিনি ছাড়েন না। পেটের মাঝখান থেকে, কখনো কখনো কন্ঠকে ভারী করে তিনি খাস আরবী ভাষাভাষীদের কায়দায় উচ্চারণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন ফাকে বাঙ্গালীর গলার বাতাসটা বেরিয়ে কেমন যেন হাড়ে মজ্জায় বেমানান হয়ে যায়। এটা নিয়ে ইউনুস অনেকবার হেসেছে আপন মনে। এনামুলের নানার কোরান শরীফ পড়া ছাড়াও সামনের বাসার আইয়ুব সাহেব সামনের বারান্দায় এসে গলার মধ্যে আঙুল দিয়ে খ্যাক খ্যাক করে কাশি তুলে মুখ ধোয়, এবং সেটা অনেকক্ষণ ধরে। এই পাড়ায় যখন ইউনুস আসে তখন আইয়ুব সাহেবের এমন কাণ্ড দেখে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং একবার ভেবেও যে গিয়ে বলবে, আপনার কি কোন সিভিক সেন্স নেই ? কথাটা বলা হয়নি, কারণ এনামুলের বাবার কাছে সে শুনেছে, বলে কোন লাভ নেই, ওটা সে বছরের পর বছর করে যাচ্ছে।

নিত্য দিনকার এই দুটো ঘটনার সাথে ইউনুসের ঘুম ভাঙার সম্পর্ক আছে, তাই এখন আর আদৌ খারাপ লাগে না। জেগে যাবার পর মিনিট দশ পনর চুপচাপ পড়ে থাকে, পাশে মাজেদা তখনো বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস তুলে ঘুমায়, ছোট মেয়েটা হয়তো পেশাবের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকলেও উঠে সে কাঁথা পাল্টায় না কিংবা মাজেদাকে বলে না, ওঠো তো, মিনু মুতের মধ্যে ডুবে আছে। এই দশ পনর মিনিট একটা ধোঁয়াটে অবস্থার মধ্যে বিচরণ করে। রাতের স্বপ্নগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে ভাবে, গুরুতর কোন স্বপ্ন নাড়া দিয়ে গেলে কী ফল হতে পারে ভেবে একটা সমাধানে পৌঁছায় কি পৌঁছায়

না। সেই সময় বিছানায় শুয়েই ইউনুস একটা সিগারেট ধরিয়ে মশারীর বাইরে মুখ রেখে ধোঁয়া ছাড়ে। এভাবে একবার মশারীতে আগুন ধরে গিয়েছিলো। তাও সে অভ্যাসটা ছাড়তে পারেনি।

সিগারেটটা মেঝেয় ডলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে ইউনুস। মাজেদা, তখনো ঘুমায়। আগে নিজে ওঠার সময় মাজেদাকেও ডাকতো, কিন্তু এখন জানে, ডাকলে মাজেদা বলবে,

সারারাত মিনুর জন্যে ভালো ঘুম হয় না, সকাল বেলাটাও ভালো করে ঘুমুতে দেবে না ?

কিন্তু আমার তো অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে।

চোখে ঘুম নিয়েই মাজেদা জবাব দেয়

রওশন তো নাস্তা পানি বানাচ্ছেই !

রান্নাঘরে তখন রওশনের ঘুটঘাট শব্দ চলছে। ইউনুস পায়খানা পেশাব সারে, দাড়ি কাটে, দাঁত মাজে, তারপর গোসলে ঢোকে। ততক্ষণে অনেক বেলা উঠে যায় আকাশে, মাটি দিয়ে একটা ভাপ উঠে সূর্যের আলোর সাথে মিশে যেতে থাকে, ঘাসের ডগা থেকে শিশিরেরা ঝবি ঝবি করছে। মাজেদাও উঠে যায় ততক্ষণে, এবং ততক্ষণে কাগজ এসে যায়।

আজ সমস্ত ঘটনাই নিয়মমাফিক ঘটলো, কিন্তু ইউনুস বিছানা ছেড়ে ওঠে না। রওশন দেরী দেখে দরোজার বাইরে এসে একবার ডাক দেয়,

খালু, আজ অফিসে যাবেন না ?

নারে।

আজ বন্ধ নাকি ?

না। তুই যা। কাগজ এলে ডাক দিস।

চোখে ঘুম ভাসিয়েই মাজেদা বলে,

কি হয়েছে ?

না। কিছু না। তুমি ঘুমোও।

আর কিছুক্ষণ ইউনুস মাজেদার পাল্টা কথা শোনার অপেক্ষা করে। কিন্তু যখনই বুঝতে পারে, মাজেদার নিঃশ্বাস ক্রমশ দীর্ঘ ও গভীর হচ্ছে, তখন সে গতকালটার কথা মনোযোগ দিয়ে ভাবতে থাকে। আজ সে স্বপ্ন মিলাতে চেষ্টা করেনি, মাঝে একবার রঙিন সাপের স্বপ্নটা মনে এসেই মিলিয়ে

গিয়েছিলো। শালার দিন একটা গেছে কাল। যেন প্রিন্স অব বাংলাদেশ। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের একজন।

নিউজ এডিটরের চকচকে চোখের মণি মনে পড়তেই ইউনুস মনে মনে একচোট হেসে নেয়। আরো ভাবে, সাপের পাঁচ পা তো এখনো দেখোইনি! বিশাল হলঘরের ঘেরা ঘরে নিউজ এডিটরের সামনে গিয়ে ইউনুসের খানিক-ক্ষণ পা কাঁপে। কাগজটি হাতে নিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে শুকনো গলায় বলে,

আমি একটা কাজে এসেছিলাম।

বলুন।

আমি কিছু টাকা পেয়েছি, তাই খবরটা কাগজে দিতে চাই।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে গোটা দৃশ্যটা সামনে মশারীর মতোই ভাসতে থাকে, নিউজ এডিটর প্রথমে ইউনুসের দিকে অনেকক্ষণ তাকাযনি; একবার হঠাৎ চোখ পড়ে গেলেও সেটা বিদ্যুতের মতোই অদৃশ্য হয়ে যায়। ইউনুস বার-দুয়েক ভেবেছে। দরকার নেই শালার নিউজ দেবার, টাকাগুলো যখন পেয়েছি তখন ওটা আমারই পাওনা। কোন শালা তো আর চাইতে আসবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা হয়ে যেতেই নিউজ এডিটর পিঠ সোজা করে বলেন,

টাকা! টাকা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছেন?

হ্যাঁ। স্টেডিয়ামের সামনে।

কখন?

এই তো আসতে। অফিস থেকে ফেরার পথে।

নিউজ এডিটর নিজেই একটা কাগজ টেনে শুনে শুনে লিখে নেন; ইউনুস আলি, ঠিকানা সাতশো কুড়ি উত্তর হাজিপাড়া। এই বিছানায় শুয়ে ইউনুসের মনে হতে থাকে, কী একটা আলো চকচকি খেলা করছিলো নিউজ এডিটরের চোখে, বার বার তিনি তাকাচ্ছেন তার দিকে, সে চোখে সেই প্রশ্নটাই যেন খেলে যায় ওই টাকাটা তো আমিও পেতে পারতাম। একটা অদ্ভুত মায়া জেগেছিলো ইউনুসের। মুখ ফসকে একবার টাকার অঙ্কটা বেরিয়ে গিয়েছিলো আর কি, কিন্তু দুরন্ত ঘোড়ার লাগাম টানার মতো টেনে সেটাকে বাগ মানায়। তখন তার ভীষণ হাল্কা লাগে।

আচ্ছা, আপনার নিউজটা কাল যাবে।

সহসা পাখির পালকের মতো নির্ভার মনে হয় ইউনুসের, নিজেকে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে হাজির হয়। কিন্তু কোথাও ক্লান্তি নেই ; সবাই যেন তার মতো ওজনহীন, বাতাস কেটে আপনা আপনিই চলে যাচ্ছে তারা।

কাগজ এলে বওশন ডাক দেয়,

খালু, কাগজ দিয়ে গেছে।

লাফ দিয়ে ওঠে ইউনুস। সে জানে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর নয়, সেজন্যে প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ না বুলিয়েই চলে যায় তৃতীয় পৃষ্ঠায়, সেখানে নেই। আছে চতুর্থ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলামের একেবারে নিচে। আঠারো পয়েন্ট টাইপে হেডিং দিয়েছে—পাওয়া গিয়াছে। তারপরেরগুলো সাধারণ টাইপেই। গতকাল দুপুরের দিকে স্টেডিয়ামের কাছে কিছু টাকা পাওয়া গিয়াছে। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া নিম্নঠিকানা হইতে টাকা সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে। মোঃ ইউনুস আলি। সাতশত কুড়ি, উত্তর হাজিপাড়া, ঢাকা।

ছোট্ট সাড়ে চার লাইনের সংবাদ। কিন্তু ইউনুসের মনে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যায়। বারবার সে নিজের নামটা পড়তে থাকে ; প্রথমবার মনে হয়েছিলো ইউনুসের জায়গায় ইউলুস হয়েছে, কিন্তু পরে বুঝতে পারে ঘুম ভেঙে যাবার পর সে চোখের পিচুটি ছাড়ায়নি। যখন আর কোন সন্দেহই থাকে না ছাপা নির্ভুল, তখন গোটা কাগজে ইউনুস আলি ইউনুস আলি ইউনুস আলি নাচানাচি করে বেড়ায় ; ছাপার অক্ষরে ছয়টি অক্ষরই যেন আজ কাগজের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, সমস্ত খবর ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতো আকাশে পরিচয়হীন হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দিক দিগন্তে মিশে গেল। নিজেকে ভালোবাসার এতো তীব্র আকর্ষণ ইউনুস এর আগে কোনদিন অনুভব করেনি, নিজের গায়েই হাত বুলিয়ে জিগেস করতে চায়, কিগো ভালো আছো ?

কখন যেন তৃপ্তিটা প্রশান্তি হয়ে যায়, কাশের গুচ্ছ দিয়ে বুকে পিঠে মোলায়েম স্পর্শে নতুন ঘুম নেচে নেচে এলো, ইউনুসের মনে হতে লাগলো আর লাগলো ঘুমটা কে যেন আবিষ্কার করলো, কী যেন তার নাম ! কাগজটা বুকের কাছে তেমনিই ধরা, কাছ ছাড়া হয়ে গেলেই যেন ঘুম পালিয়ে যাবার ভয়, বিছানার নিচে থেকে কে যেন ডাকছে আয় আয়। ইউনুসের অফিসের কথা মনে থাকে না, পাশে মাজেদা এবং মিনুর কথাও ভুলে গেছে, এমনকি ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখতে হয় সেটাও স্মরণপথ ছেড়ে প্রকৃতির আড়ালে আড়ালে

গা ঢাকা দিয়ে চলে যাচ্ছে, ইউনুস বাতাস আর বাতাসহীনতার মধ্যে একটা শূন্য হয়ে ভেসে রইলো।

মাজেদার ডাকে সে ধড়মড় করে উঠে বসে.

ডাকছো কেন?

উঠবে না? অফিস নেই?

আমি আজ অফিস যাবো না।

ইউনুসের কন্ঠে একটা গাঢ় গাম্ভীর্য ছিলো, যেটা লক্ষ্য করে মাজেদা আর কোন কথা বাড়ায় না। বিছানা ছেড়ে চলে যায় ইউনুস বুঝতে পারে। তারপর আবার সে চোখে পাতলা ঘুম নিয়ে শুয়ে থাকে।

নটা চল্লিশ মিনিটে ইউনুস উঠে পায়খানা হাত মুখ ধোয়া সেরে নাস্তার থালাটা নিয়ে যখন বসে, তখন মাজেদা প্রথম কথা বলে,

তোমার কি হয়েছে?

কৈ? কিছু না তো!

শরীর খারাপ করেছে?

না।

অফিস যাবে না?

একথার জবাব না দিয়ে ইউনুস মাজেদার চোখের গভীরে তাকায়। স্পষ্ট দেখতে পায় বাম চোখের এ প্রান্ত ও প্রান্ত জুড়ে একটা সুতোর মতো লাল রেখা, ডান চোখের কোণায় একটা তিল চোখ মেলে তাকেই দেখছে। ইউনুসের ঠোঁটটা তখন তিরতির করে কাঁপে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে, নাকের ডগাটা লাল হয়ে যায়। মাজেদা কোনদিন ইউনুসের এমন চেহারা দেখেনি। মনে তার যখন আনন্দ থৈ থৈ করে, তখন সে যেন ফিতেভরা হাফপ্যান্ট পরে লাফায়; আবার দুঃখ এলে মেঘের পরে মেঘ জমে মুখটা থমথমে হয়ে থাকে। কিন্তু এ কোন্ চেহারা! তখনই মাজেদার ভয় হয়।

তোমার কী হয়েছে?

হেসে ফেলে ইউনুস। মাজেদার আকুল প্রশ্নটা পলকা বাতাসের মতো স্পর্শ না করে চলে যায়, সে আপন মনে ভাজা আলুর খোসা ছাড়াতে থাকে। কোন দিকে তাকায় না সে, যেন আশে পাশে বাতাস ছাড়া আর কিছুই নেই। অসহিষ্ণু হয়ে যায় মাজেদা,

কী, কথা বলছো না কেন?

কি বলবো ?

তুমি অমন করছো কেন ?

যেন নিজেকে শুনিয়ে শুনিযেই জবাব দেয় ইউনুস,

আমি টাকা পেযেছি।

চিটকে ওঠে মাজেদার শরীর। নিজের বিশ্বাসের গোড়ায় যেন সহসা ঘূণ ধরে যায়, একটা চোরাবালি মুহূর্তে হয়ে ওঠে পাথরের ভিত্, তাদের ভাগ্যটা খেয়ালী বাতাসের লীলাখেলা নয় আর, তার এপিঠে ওপিঠে একটা স্পষ্ট আলোর রেখা আছে। প্রবল আগ্রহে হাঁসের মতো গলা বাড়িয়ে আনে মাজেদা,

কোথায় ? কিসেব টাকা ? কতো টাকা ?

মাজেদার তিন তিনটি প্রশ্নের সাথে সাথে ইউনুসের মাথাটা ফাৎনার মতো ওঠে আর নামে। সে কোন্ প্রশ্নটার জবাব আগে দেবে বুঝতে পাবে না, ঘটনা মিলিয়ে মিলিয়ে জবাব দিতে গেলে তিনটি ছাড়াও অপ্রশ্নের জবাব দেয়া হয়ে যায় কিনা, অথবা তিনটে থেকে একটা বাদ পড়লো ভাবতে ভাবতে ইউনুস আবার নিজের কাছেই জবাব দেয়,

সে বলা যাবে না।

কেন ?

কেন-র জবাবও দেয়া যাবে না।

ঠিক সেই সময় মাজেদার চোখে পানি এসে গিয়েছিলো।

তাড়াতাড়ি সে আঁচল দিয়ে চোখ চাপে। খুব নির্বিকারভাবে ইউনুস মাজেদার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত কন্ঠে বলে,

বলা অসুবিধে আছে।

তখনো মাজেদা অপরিচিতা হয়ে আছে। নিঃশব্দে চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়, পানির গ্লাস সরিয়ে রাখে, রওশনকে নাস্তার থালা সরিয়ে রাখতে বলে।

এমন সময় দরোজায় কড়া নড়ে।

যেন এই সময়ের মধ্যেই দরোজায় অপরিচিত হাতে কড়া নড়বে, আগে থেকেই জানতো ইউনুস, তাই তার গা তোলার মধ্যে কোন তাড়া দেখা যায় না। ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দেয়. কাপের গা বেয়ে চায়ের ফোঁটা গড়িয়ে পড়া দেখে। ব্যস্ত হয় মাজেদা,

কে যেন এসেছে।

হয়তো কোন লোক'। আসতে দাও।

গিয়ে দেখোই না।

জবাব না দিয়ে বড় করে একটা চুমুক দেয়।

বাইরে গিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলার পর ফিরে আসে ইউনুস। তার চোখে তখন কী একটা তন্ময়তা, আনন্দের আলোকচ্ছটা লুকোচুরি খেলে যায়, পায়ের ছন্দ যেন সারা শরীরেও মাতামাতি করছে। তার কন্ঠে তখন সুর ছিলো, সুরের প্রকাশ ছিলো না, বিজযের গৌরব ছিলো মনে, বাইরে তার পবিচিতি নেই। এই হঠাৎ-খুশিময চেহারার আবর্তে পড়ে মাজেদা খানিকক্ষণ দ্বিধা মেখে পরে সহজ হযে বলে,

কে এসেছিলো ?

ঘরে যেতে যেতে ইউনুস জবাব দেয়।

কাল স্টেডিয়ামের কাছে যে টাকা পেয়েছি, তার খবব আজ কাগজে বেরিয়েছে। এক লোক সেই টাকাব খোঁজেই এসেছিলো। বিবরণে মেলেনি।

মাজেদা সহসা বুঝতে পারে না, অভিমান না আনন্দ তাকে জড়িয়ে ধবেছে। দুটো যুক্তিই দুইপাশ থেকে সাপেব মতো ফণা তুলে থাকে, কাকে অবদমিত করবে জানা নেই তার। স্বামী, প্রত্যেকটি দিন যে অবারিত কবে দেয় নিজেকে ; অফিসের নানান ঘটনা, বন্ধুদের আডডাব খবরাখবর, আশপাশের জানা শোনা কাহিনী ; কিছুই, কিছুই বাদ দেয না ইউনুস, কিন্তু আজ এমন একটি ঘটনা যা তাদের পরিবর্তিত করতে পারে অন্য মানুষে, তার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ কবেনি তার অকপট স্বামী, তখনই মাজেদা অভিমানে স্থবির হযে মেঝেয় বসে পড়ে। ইউনুস তখন আবার শুয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়ছে, গোল গোল হয়ে উঠে যায় ধোঁয়া, সমস্ত মনোযোগ সেদিকেই, মাজেদার অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে যায় তার কাছে। আবার দরোজায় কড়া।

নাহ্, শালারা জ্বালাবে দেখছি।

ধীরপায়ে উঠে যায় ইউনুস। মাজেদা তখনো মেঝেয় বসে।

এবারে ইউনুসের ঘরে আসতে অনেক সময় লেগে যায়। দ্বিতীয় লোককে বিদায় করতে না করতেই তৃতীয়জন আসে, চতুর্থ, পঞ্চমজন আসে। একটা অটল গাম্ভীর্য নিযে সে কথা বলে যায় সকলের সাথে, মানুষের প্রতিটি প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করার সাথে সাথে মুখের চেহারা, রঙ, আকৃতি কেমন

ভাবে পাল্টে যায় মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে এবং সকলের কাছেই নিস্তরঙ্গ গলায় বলে,

না, আপনার বিবরণ মিলছে না।

সারাদিনে আরো অনেক লোক এসেছিলো। ইউনুস মনে করতে পারে না, কবে তার বাসায় এতো লোক সমাগম হয়. মিনুর আকিকায় নিজেদের আত্মীয়স্বজনেই বাড়িটা ভরে উঠলেও এতো আনাগোনা ছিলো না, যেন সারাদিনের তীর্থক্ষেত্র এই সাতশো কুড়ি উত্তর হাজীপাড়া। লোকগুলো বিবরণ শেষ করে চরম উৎকন্ঠায় তাকিয়ে থাকে ইউনুসের মুখের দিকে, এই বুঝি ইউনুস বললো হ্যাঁ আপনার বিবরণ মিলেছে। কিন্তু না, মেলে না, কিছুতেই সঠিক বিবরণের সাথে খাপ খায় না, ইউনুস বলে, আপনার বিবরণ মিলছে না।

সারাদিনের সাক্ষাৎকারে ক্লান্ত হয়ে ইউনুস সন্ধ্যার পর পরই শুয়ে পড়ে। তখন সন্ধি হয় মাজেদার সঙ্গে। দুপুরে ভাত খেতে বসে অভিমানটাকে দুই হাতে ঠেলে কথাটা তুলেছিলো মাজেদা।

বলো না, কতো টাকা পেয়েছো ?

মাজেদা, তুমি রাগ করো না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আজ টাকার পরিমাণটা কাউকেই বলবো না।

আমাকেও অবিশ্বাস ?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। কথাটা কোন প্রকারে বাইরে গেলেই আমি টাকা না দিয়ে পারবো না। আজকের দিনটার মতো ধৈর্য ধরোই না।

দিন তো গেছেই !

এখনো লোক আসতে পারে।

কথাটি বলে ইউনুস মাজেদার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিটমিট করে হাসে। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ; কতক্ষণ জানা নেই মাজেদার, সময়ের পরিমাপ করতে গিয়ে সে আপন মনে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছে, হঠাৎ চোখ পড়ে ইউনুসের দিকে।

কি ? হাসো কেন ?

হাসছি নাকি ? ও। ভাবছিলাম, টাকাটা অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিলো।

হেসে ফেলে মাজেদা।

হুঁ, অনেক আগেই লোকের তোমার জন্যে টাকা ফেলে রাখা উচিত ছিলো।

না তা নয়। আমার হাতের রেখায় আছে, হঠাৎ একবারে অনেক টাকা পাবো। তাই বলছিলাম।

তখন দু'জন একসঙ্গে লটারীর টিকেটের কথা ভাবতে থাকে। জনৈক ভাগ্যরেখা বিশারদ জোর দিয়ে বললো,

আপনার হাত বলছে, আপনি হঠাৎ অনেক টাকা পাবেন।

কি ভাবে?

সেটা সঠিক বলা যায় না। হতে পারে, জুয়া খেলায়, লটারী বা রাস্তায় পড়ে পেলেন।

জুয়া ইউনুস কোনদিনই খেলে না। একবার, একবারই মাত্র বন্ধুদের সাথে কাচচু খেলে বারো টাকা হেরে যাবার পর মন খারাপ করে সারাদিন কারো সাথে কথা বলেনি। তারপর থেকে পয়সা দিয়ে তাস খেলার কথা উঠলেই ইউনুস বলে,

পয়সা দিয়ে আমি খেলবো না।

জানে হাতের রেখায় জুয়ার টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিরাট, কিন্তু আশঙ্কাটাও সে উড়িয়ে দিতে পারেনা, যে টাকা না পেলে নিজের সব টাকাই জলে যাবে। বাকি থাকে লটারী ও রাস্তা। ইউনুস বহুদিন কাগজে রাস্তায় টাকা প্রাপ্তির সংবাদ পড়েছে। যখনই সংবাদটা পড়া হয়ে যায়, মনে মনে হেঁটে গিয়ে সে দাঁড়ায় সেখানে। রাস্তা দিয়ে অসংখ্য লোক যাতায়াত করছে, কিন্তু কেবল তারই চোখে পড়ে কাগজের একটা মোড়ক কিম্বা কাপড়ের ছোট্ট একটা পুটুলী অথবা ফোলা মানিব্যাগ। সবার অলক্ষ্যে ইউনুস তুলে নেয় জিনিসটি, তখনই খুলতে সাহস পায় না, যদি কেউ দেখে ফেলে, চারপাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে সে নির্জন কোন জায়গায় গিয়ে খুলে দেখে, ভাঁজে ভাঁজে টাকারা শুয়ে আছে। দেশের বড় বড় তিনটি লটারীর খেলাতেও টিকেট কেনে ইউনুস, দেশের লোক জানে ইউনুস আলি নামে কোন লোক প্রথম হয়নি; আর ইউনুসের আত্মীয়স্বজন জানে, সে প্রথম কেন কোন পুরস্কারই পায়নি। ইউনুসের হাতের রেখার খবর মাজেদার জানা ছিলো বলে ইউনুসের নামে কেনা টিকেটটি সে হৃৎপিণ্ডের মতো যত্নে লুকিয়ে রাখে। তিনবারের খেলায় শেষেরবারে ইউনুসের ঘ সিরিজের প্রথম চারটি সংখ্যা কেবল মিলেছিলো।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নম্বর মিলিয়ে যাচ্ছে ইউনুস, তিনটি পর্যন্ত মিলতেই তার হাত পা শির শির করতে থাকে, বুঝতে পারে তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেছে, মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল জলরেখা বয়ে যায়। তখনই সে শুকনো গলায় ডাক দেয় মাজেদাকে। শেষ পর্যন্ত সংখ্যা মেলেনি জেনেও ইউনুস প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাগ্যবানের জায়গায় নিজেকে স্থাপন করে আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে থাকে। ঘোরটা থাকে সারাদিন।

টাকার সন্ধানে সর্বশেষ লোকটি আসে রাত পোনে দশটায়। বিবরণ মেলে না বলে বিষণ্ন মুখে যখন লোকটি চলে যায়, তখন ইউনুসের মুখটা একটা উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।

কি বিবরণ মিললো ?

ব্যাগ্র কন্ঠে জিগেস করে মাজেদা ইউনুসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইউনুস প্রথমে ঘড়ি দেখে রাতের হিসেব নেয়, তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিস্তব্ধ পাড়ার গভীরতা মেপে সহসা ধ্যানী হয়ে বিছানায় বসে পড়ে শান্তকন্ঠে জবাব দেয়,

মেলেনি। কোনদিন মিলবেও না।

চমকে ওঠে মাজেদা।

কেন, মিলবে না কেন ? যার টাকা হারিয়েছে সে হয়তো আজগের কাগজ পড়েনি। কাল পরশু যে-কোনদিন আসতে পারে।

না, তাও আসবে না।

কেন ?

আমি যে কতো টাকা পেয়েছি, মানুষ কল্পনায়ই আনতে পারবে না।

ব্যাকুলতাটা খান খান হয়ে ভেঙে যায়, মাজেদা বুঝতে পারে না সে কি উচ্চারণ করলো, ইউনুস অস্পষ্ট ধ্বনিতরঙ্গে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে,

বাতি নিভিয়ে দাও।

অন্যদিন লাইট অফ করে দেবার আগে মাজেদা লন্ঠন জ্বালিয়ে ঘরে রাখে, কিন্তু আজ সবই ওলটপালট এলোমেলো হয়ে আছে; বাতি নিভে যাবার পর ঘরে এমন একটা নিরেট অন্ধকারের দেয়াল তৈরী হয়ে যায় যে ইউনুস নিজের হাতটাও দেখতে পায় না। হাতড়ে হাতড়ে স্পর্শ করে মাজেদার শরীর, মাথা থেকে মুখ হয়ে বুক, পেট, তলপেট পর্যন্ত যেতেই বিড়বিড় করে

বলে মাজেদা,

ঘরে বাতি নেই যে!

কথা বলো না, রাজকন্যে আসবে না।

কে আসবে না?

মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে শব্দ করে ইউনুস মাজেদাকে থামায়।

মাজেদা তুমি কল্পনা করতে পারো কতো টাকা পেয়েছি?

কি করে বলবো!

তাই।

ইউনুস তখনো মাজেদার শরীর স্পর্শ করে আছে, তিরতির করে কাঁপছে মাজেদার শরীর; ইউনুসের চোখে গুপ্তধনের চোরা দরোজা হাট করে খুলে গেল, হীরা চুনী পান্না জহরত মণি মুক্তার আলোয় অন্ধ হয়ে গেল সে।

আমি চলেছি রাজপথ দিয়ে, অগণিত লোক, কিন্তু কি আশ্চর্য কারো ছায়া পড়ে না মাটিতে, বাতাসে পা ফেলে ফেলে তারা যেন সব উড়ে যাচ্ছে। প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি, এ আমি কোথায় এলাম; রূপকথার গল্পে শুনেছি রাস্তার পাশে বাড়িঘর সোনার পাথর দিয়ে বানানো; গাছে গাছে অমূল্য রত্নরাজির ফল ধরে থাকে, পাখিরা দিনে রাতে সুখের গান গায়, কান্না কেমন তা তারা শোনেনি বা দেখেনি। মাজেদা, শুনছো তো?

বলো।

রাজপথের মাঝে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম। একটু আগেই যাদের ভাসমান ছায়া দেখেছি তাদের সহসা মাটিতে দেখতে পাই। অপরিচিত জায়গায় এসে পড়েছি বলে প্রথমে ভয় ভয় করছিলো কিন্তু আস্তে আস্তে পরিচিত লোকজনের দেখা পেতে থাকি; এনামুলের নানা চলেছেন লাঠি ভর দিয়ে, আইয়ুব সাহেব ধীর পায়ে; আমি তো একবার ডেকেও উঠলাম, যখন দেখি আমাদের গ্রামের সাহেব আলী, নবু নাপিত, ইয়াজদ্দি ঘরামী, নসু চোর, আমার ছেলেবেলার বন্ধু যবু, বাদল, তারা, মনু, রবি, সব—সব চলেছে যে যার গন্তব্যে। সবাই কি একসাথে বধির হয়ে যায়, আমি ডেকে ডেকে ফিরি—আমাকে তোমরা সাথে করে নিয়ে যাও, আমার ভীষণ ভয় করছে, একটা লোক এগিয়ে এসো কাছে। আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে; কোথায় যেন দেখেছি, কোথায় যেন এই চেহারা চোখে পড়েছে ভাবতে ভাবতে আকস্মিকভাবে চোখে আলো লাগলো: হ্যাঁ হ্যাঁ, একে

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইতে সোনার পোশাক গায়ে মণি-মুক্তা খচিত মুকুট মাথায় ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছি। সে হাসলো আমার দিকে চেয়ে। তার কন্ঠে মধুরতম সঙ্গীতের অনুরণন ছিলো। বললো,

কাকে ডাকছো ?

ওই তো, আমার পরিচিত লোকজনদের।

সে মৃদু হাসে,

রূপকথার দেশে সবাই, যে যার সুখের সন্ধানে যায়।

তাই বলে আমার ডাক শুনবে না ? সবাই তো সামনে দিয়ে গেল।

রাক্ষসের ভয়ে কেউ কথা বলে না। কখন যে আকাশ ফুঁড়ে মাটি ভেদ করে বিশাল বিশাল দাঁত বের করে সামনে এসে হাজির হবে কে জানে। ভয়ে তোমার ডাকে সাড়া দেয় না।

মাজেদা, আমার তখন ভয় ধরে গেল। আমার গা ঘেঁষে বসো তুমি। শুনছো ?

বলো।

আমি সেই ছবির পুরুষকে জিগেস করি,

আমি তাহলে কি করবো এখন ?

সোজা চলে যাও। সহসা সুখ মিললেও মিলতে পারে।

অবাক হয়ে দেখি সামনে কোন লোক নেই। আর তারপরেই মাজেদা, তোমাকে বলেছিলাম, অকল্পনীয় সে টাকার পরিমাণ, আমার সামনে স্তূপাকার হয়ে আছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সে টাকায় রাজপথ সোনা দিয়ে বাঁধানো যায়, সারা দেশ আলোয় আলোয় ভরে দেয়া যায়, মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যায়, তবুও সে টাকার বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না। আমি তক্ষুনি ভাগ্য-বিশারদের কথানুসারে হাতের রেখা দেখেছিলাম; সহসাই চোখ পড়ে, আরে, তাইতো, রেখা তো আরো গভীর হয়েছে, আমি খেয়ালই করিনি। আবার চীৎকার করে বলতে গিয়েছিলাম, আমাদের হাতের রেখায় নিটোল বিশ্বাস স্থাপন করে ভাগ্য অন্বেষণ করতে যাওয়া উচিত, সুখ খুঁজে ফেরা কর্তব্য।

করেছিলে ?

না। আমি জানি আমার হাতের চেয়ে আর কারো রেখা হয়তো গভীর-তর, তাহলে তার ভাগ্যেই এই বিপুল ঐশ্বর্য চলে যাবে, আমি দ্রুত পায় গিয়ে টাকাগুলো তুলে নিলাম।

ইউনুস বুঝতে পারে, তার মুখে একটা চুমুর স্পর্শ ; ছোট্ট একটা শব্দ হয় ; সেই শব্দেই যেন ভবিষ্যতের মসৃণ পথের সিংহদ্বার খুলে গেলো সশব্দে ; সে মাজেদা মিনুকে হাত ধরে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। দূরে প্রকৃতির গায়ে হেলান দিয়ে তাদের সুরম্য অট্টালিকা অপেক্ষা করে আছে তাদেরই জন্যে ; দ্বারে প্রহরী দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়েই মাথা নুইয়ে থাকে, প্রাসাদের শীর্ষ থেকে তোপধ্বনি হয়, ফুল বাগানে অজস্র ফুল দুলে দুলে খুশি প্রকাশ করে।

ইউনুস নিশ্চিত হয়, মাজেদা তখনো চুমুটা প্রত্যাহার করে নেয়নি, মুখ ঘুরিয়ে সেও দুই হাতে মাজেদার মুখটা ধরেই চমকে ওঠে,

তুমি কাঁদছো ?

জড়িয়ে জড়িয়ে জবাব দেয় মাজেদা,

সুখ কি চিরস্থায়ী হয় ?

অনেকক্ষণ ওরা বসে থাকে। রাতের গভীরতা আরো বাড়ে, জানালার বাইরে জোনাকী জ্বলে, শি শি শব্দ তুলে মাঝে মাঝে বাতাস ডেকে যায়, ঘাসে ঘাসে শিশির জমে, দূরে পেটা ঘন্টার শব্দ ভেসে আসে। ইউনুস বুঝতে পারে, মাজেদা ঘুমে অচেতন, চোখের পাতায় হাত দিয়ে টের পায় পাতা দুটো কাঁপছে, বুঝতে পারে মাজেদা স্বপ্ন দেখছে।

তখন, হঁ্যা তখনই ইউনুস সভয়ে লক্ষ্য করে ঘরে মানুষ। চীৎকার করার আগেই চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে যায় তার ; চোখের সামনে চকচকে ছোরা দুলছে। হিসহিস করে মানুষটি বলে,

কোথায় টাকা ?

কোন টাকা ?

কাগজে খবর দেখলাম !

আকুল কন্ঠে, ইউনুস জবাব দেয়,

কাগজে খবর দিয়ে সুখ পেতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করো ভাই, ওটা মিথ্যে খবর। আমি বড়ো নিঃস্ব।

সমুদ্র সম্ভোগ

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

বেশি কিছু না-ভেবেই আমরা যাবো ঠিক করেছি।

মাত্র তিনদিন আগে লিলির সঙ্গে দেখা, বিয়ে বাড়িতে, কনে দেখা আলোও নিভে গেছে তখন, তখন মাথার উপর আকাশ ছিলো কিনা ভেবে দেখিনি—মনে থাকার কথাও নয়। সেই দেখা থেকে পরিচয় হলো, পরিচয় গাঢ় হওয়ার জন্য আমাদের দু'জনের একসঙ্গে বেড়ানো বা নিরিবিলি আশ্রয় দরকার। দু'দিন খুব একান্ত একা হতে পারিনি, তবু দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে কিছু সময় একা হতে পেরেছিলাম। ঠিক তখনই আশরাফ নামক আমার পরিচিত লোকটি বোকার মতো কিছুক্ষণ বক বক করে সেই সময়টা মাটি করে চলে গেলো।

পরিচয়ের সূত্রপাতে যে অস্থিরতা ও ঔৎসুক্য থাকে তার তীব্রতায় আমরা দু'জনই আচ্ছন্ন—সামান্য স্থিরতা তখনও আসেনি, এসব ব্যাপারে স্থিরতা আদৌ আসে কিনা আমার জানা নেই।

এসময়, এমনি এক আগুন সময়ে ঠিক করলাম আমরা সমুদ্রে যাবো।

দুপুর এগারোটার দিকে আমরা ফৌজদার হাট সৈকতে পৌঁছলাম। তীরের পশ্চিম দিক জুড়ে বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত হয়ে আছে। কূলের উত্তরদিকে এক নাগাড়ে আধ মাইল জুড়ে বালিয়াড়ি, তারপর সমুদ্র কূলের দিকে বেঁকে গেছে বলে তীর দেখা যায় না। দক্ষিণ দিকে বালিয়াড়ি বহুদূর এঁকেবেঁকে গেছে। বালিয়াড়ি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ভাটির সময় বেলাভূমি অনেক বড় হয়, তবে সমুদ্রের দিকে জেগে ওঠা চর থাকে কাদায় থিকথিকে—হাঁটু অব্দি দেবে যায়।

লিলি খুশীতে চকচক করে সমুদ্রের দিকে তাকালো। এই তার প্রথম সমুদ্র দর্শন। জোয়ার আসছে, দিনে রাতে দুবার জোয়ার। জেলেরা নৌকো নিয়ে মাছ আনতে চলছে। অঘ্রাণের শেষ। খুব গভীর সমুদ্রে তারা এখনও যাওয়া শুরু করেনি, দিন কয়েকের মধ্যেই করবে। জাল নিয়ে গভীর সমুদ্রে যাবে,

সঙ্গে থাকবে অনেক লটবহর। এক এক খেপে কয়েকদিন জাল পাহারায় থাকবে জেলেরা, পালা করে জাল পাহারা দেবে, কূল থেকে মাছ আনতে যাবে প্রতিদিন—জোয় জোয়[১] বেশি মাছ ধরা পরবে। রাঙাবালি, সোনাদিয়া দ্বীপে এখন মাছ ধরার ভর উৎসব। মাছ ধরে শুঁটকি বানাচ্ছে—লইট্যা ঘইল্যা ছুরি কোরাল, ফাইস্যা চিংড়ি রূপচাঁদা কত রকম শুঁটকি যে হবে।

বালিয়াড়িতে নেমে লিলি অবাক। সমুদ্র দেখে, বালিয়াড়িতে লাল-লাল থোপ-থোপ কাঁকড়া দেখে—আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো। আমি জানি লাল কাঁকড়া বেলাভূমিতে রোদ লুটছে। কাঁকড়ার মাথার উপর চোখ দু'টো সিকি ইঞ্চি উপরে বসা, এজন্যে একসঙ্গে চারদিকে দেখতে পায় তারা। লিলি তো অবাক। গর্তের মুখে বা কাছাকাছি তারা বসে আছে। আছে এগিয়ে যেতেই টুপটুপ চুপচুপ গর্তে লুকিয়ে পড়ে। লিলি চেষ্টা করছে একটা কাঁকড়া ধরতে; খুব ভালো লাগছে আমার। কিন্তু কাঁকড়াগুলো ভারী চতুর। লিলি দৌড়ে চেষ্টা করছে, বাতাসের তোড়ে তার চুল রিবুন শাড়ি কথা কেঁপে-কেঁপে উড়ছে। শেষ রাতের জোয়ারে ভেজা বালির মধ্যে গর্ত, সেই গর্তের মুখে কাকড়াগুলো স্বচ্ছ ও টলটল চোখে শরীরের লাল রঙ মেলে তাকিয়ে আছে। আমাদের পেছনে ফেলে আসা গর্তের মুখে আবার উঁকি মারছে তারা। গাঙচিল উড়ছে জেলেদের পাড়ার দিকে। লিলি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে.........মাঝে মাঝে, আচমকা।

সামনেই জেলে গ্রাম। ওখানে গাঙচিলের আড্ডা। শুকনো মাছ বালিয়াড়িতে পড়ে থাকা পোটকা, কুচো চিংড়ি ও ঠোঁট লম্বা মাছ—যেসব মাছ মানুষে খায় না বা মাছের ঝুড়ি থেকে বেছেবুছে ফেলে দিয়েছে, যেসব মাছ টুকরি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, গাঙচিল সেসব তুলে খাচ্ছে। ওখানে আবার কাক'ও জুটেছে। কাকের সঙ্গে গাঙচিল যুদ্ধে পারছে না বুঝি। দূরে বসে আছে গাঙচিল, সুযোগ পেলে ছুটো যায়—সমুদ্রের যোদ্ধা সৈনিক রাজকুমার এই গাঙচিল কিন্তু কূলের পাখিদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

কিছু পাখি জোয়ারের ঢেউয়ে ভেসে-ওঠা মাছ ধরছে, ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে। কিংবা ক্রমে জোয়ারের জলে ডুবে যাওয়া কাদায় যেসব মাছ তিরতির বেরিয়ে আসে সেখানে ভিড় করছে কাদা খোঁচা, জলপিপি। দুটো

১. **জোয়-জোয় ঃ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার জোয়ারের সময়।**

কোঁচ বক জুটেছে, কয়েকটি টিটিভও। আর অদ্ভুত ধরনের গাঙচষা পাখি। নিচের ঠোঁটটি জলের মধ্যে ইঞ্চি দু'য়েক ডুবিয়ে উপরের ঠোঁট জলের উপর হা করে তুলে একদিক থেকে অন্যদিকে উড়ে যাচ্ছে। জলের সমতলের ইঞ্চি তিনেক উপরে দিয়ে ভারী দক্ষতায় উড়ে যাচ্ছে—ভারী অবাক কাণ্ড। আমি গাঙচষা পাখির দিকে তাকিয়ে আছি—এই পাখি আমি আগে দেখিনি, বইয়ে পড়েছি। লিলি আমার পাশে এসে বাহুতে হাত রাখলে। বললাম : দ্যাখো দ্যাখো, কেমন কৌশলে ঠোঁট বাগিয়ে মাছ ধরছে। লিলি বললে : কি পাখি!

গাঙচষার নিচের ঠোঁটটি লম্বা, উপরের ঠোঁট একটু বেঁটে। ছোটো ছোটো মাছ তাতে আটকে গেলে অমনি উপরের ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে। উপরের চঞ্চুই কেবল নাড়তে পারে। এ ব্যাপারে তার নিপুণতা এত বেশি যে, এত ক্ষিপ্র যে কোনো মাছ তার ঠোঁট থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। চঞ্চুতে লাগার সঙ্গে সঙ্গে উপরে উড়তে উড়তে গিলে পেটে চালান দেয়।

লিলি বললে : চলো জেলেদের নৌকার দিকে যাই। আবার আমাদের চোখে সেই অদ্ভুত লাল রঙের কাঁকড়াগুলো এলো। লিলি একটা কাঁকড়া ও গর্ত দূর থেকে লক্ষ্য করে গর্তের কাছে গিয়ে বসলো। আমাকে ডাকলে পেছন ফিরে। হাতের ব্যাগটা আমাকে দিলে যেন অনেক দায় দায়িত্ব তুলে দিচ্ছে তেমনি.........আবার একটু তাচ্ছিল্যও আছে বুঝি। কাঁকড়ার গর্ত খুঁড়তে তার শাড়িতে বালি ছড়িয়ে পড়লো। হাতের সুন্দর রূপোর ব্রেসলেট চুড়িতে বালি লেগেছে দুই হাঁটু গেড়ে বসে বালি তুলতে তুলতে বললে : এ্যাই, আর কদ্দূর কতদূর।

আমি তার কাণ্ডকাজ দেখছি, আর তার সুন্দর ভঙ্গি, উড়ুক্কু চুলে ঢাকা মুখ, এলোমেলো শাড়ি—লিলিকে ভালোবাসতে আমার আর দ্বিধা রইলো না। আমি হাঁটু ফেলে বসে খদ্দরের ঝোলা আর লিলির হাত ব্যাগটা বালিতে রেখে কাঁকড়ার গর্ত খুঁড়তে শুরু করলাম। গর্ত খুঁড়তে আমাদের মাথায় ঠোকাঠুকি লাগলো। লিলি বললে : এ্যাই শিঙ উঠবে।—আমরা চোখে চোখে চেয়ে হাসি ও অনুরাগের অনিন্দ্য উৎসব পালন করলাম। কিন্তু কাঁকড়াটা গেলো কোথায়? আমার বাহু গর্তের মধ্যে চালান হয়ে গেছে—আর কতদূর। লিলি বললে : পারলে না তো, একটা কাঁকড়া ধরতে পারলে না, কেমন......

ঝুঁকে পড়ে আরও গর্ত খুঁড়ে আরও হাত ঢুকিয়ে কাঁকড়াটার নাগাল পেলাম। যেন পাইনি তেমন করে বললাম : ধরতে পারলে কি দেবে বলো। লিলি জিভ বের করে বললে : কচু, না........না..........

লিলির রক্তিম জিভের ডগায় কয়েকটা দাগ। দেখে বললাম : ঠিক আছে, তাই হবে।

লিলি বাল্যকালে দুধ খেতে চাইতো না বলে খুব মার খেতো। একবার বাবার উপর রাগ করে বাটিভরা গরম দুধ খেতে গিয়ে চিরকালের জন্য এই কালসিটে দাগ পড়ে গেছে। আমার খুব একটা বিশ্বাস হয়নি, আবার অবিশ্বাসও করতে পারিনি। তবে লিলি খুব সুন্দর করে গল্পটা বলেছে। তার কথা ঠিক অবিশ্বাস করা যায় না—আসলে মানুষের অনেককিছুই বোঝা যায় না, তাছাড়া মানুষ নিজের চারদিকে একটা রহস্যময় খোলস গড়ে তোলে, নিজের সব কথা পুরোপুরি বলে না কখনও—নিজের চারিদকে আড়াল রচনা করা মানুষের স্বভাব। লিলিও তাই করে থাকতে পারে। আবার এতসব যুক্তিও তার গোলাপি রক্তিম জিবের দিকে তাকিয়ে ভুলে যাচ্ছি—তাড়াতাড়ি কাঁকড়াটা বের করে লিলির ডান হাতের খোলা তালুতে চেপে ধরলাম। জানি কাঁকড়াটা ধরতে ভয় পাবে সে। লিলি চীৎকার করে উঠলো, আমার হাত থেকে হাত সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো। আমি তাকেও ছাড়লাম না, কাঁকড়াও নয়। সময় হাল্কা মন্থর গতিতে ডুবে গেলো; জোয়ারের তোড়ে ঢেউ, এবং বাতাস গাঙচিল পালতোলা নৌকো উপচে পড়ছে, নীল আকাশ ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে........নীল বঙ্গোপসাগর গাঙচিলের কক্‌ কক্‌ ক্রক্‌ ডাক মন্থর হয়ে পড়লো........জোয়ারের চাপে বঙ্গোপসাগর ধীরে ধীরে ফুসছে।

লিলির হাতের তালুতে বালি শুদ্ধ লাল কাঁকড়া, আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা চোখ দেখে যাচ্ছে—ধীরে ধীরে, লিলি খুশিতে তাকিয়ে আছে। আমি বলি এবার দাও তোমার প্রতিশ্রুতি, সেই সত্য........।

লিলি আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। একটু দূরে জেলেদের নৌকো, দু'একটা পাল তুলে এগিয়ে গেছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে আরও, যুদ্ধের সময় ডোবা ভাঙা জাহাজ কেটে তুলছে তাদের কোম্পানীর শ্রমিকরা, গাঙচিল আর জলপিপির মধ্যে প্রতিযোগিতা—জোয়ারের চাপে সময় বইতে শুরু করেছে। একটা গাঙচিল আমাদের মাথার উপর আকাশ দখল করে নিলো, আমরা অবাক হয়ে একসঙ্গে তাকিয়ে দেখলাম : কী সুন্দর ধবধবে পেলব বুক। এমন

মধুর উষ্ণ সুন্দর রম্য বুক আমরা আগে দেখিনি, আমরা ঘুরে ঘুরে উড়ে আসা গাঙচিল দেখছি—গাঙচিল হয়ে গেলাম.......তুমি-আমি যদি গাঙচিল হতাম। চোখ ফিরিয়ে এনে লিলির দিকে চেয়ে, লিলির সুচারু ওষ্ঠ ও চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম: সমুদ্রে যাবে, জেলেদের নৌকোয় করে সমুদ্রে যাবে, গাঙচিল হবে?

গাঙচিল আমাদের একা করে চলে গেলো।

আমরা পাশাপাশি হেঁটে জেলেদের পাড়ার আঁশটে গন্ধের আওতায় এলাম। ফালি-ফালি করে কেটে মাছ শুকানো হচ্ছে সেখানে, মাটিতে চাটাই বিছিয়ে ছোটো মাছ শুকানো হচ্ছে। শুকাতে দেওয়া ছোটো মাছ শুকানো হচ্ছে। শুকাতে দেওয়া জাল বালিয়াড়িতে। শুকনো মাছ ও জাল থেকে গন্ধ বইছে, সমুদ্রের নোনা গন্ধ আর জেলে পাড়ার গন্ধ মিশে একরকম তীব্র সৌরভ বইছে........ঠিক সৌরভ বলা যায় না, মেছো গন্ধের ধারটা কখনও-কখনও বেশি হয়ে যায় শুধু।

যুবক রবিজল আমাদের নিতে রাজি হলো। জাল থেকে মাছ আনতে যাচ্ছে সে। তার নৌকো তৈরী। দাঁড় ও পাল নৌকোয় গোটানো, পাটাতন নেই, একটা হাত পাঁচেক লম্বা তক্তা নৌকোর তলায় পাতা, পাছার দিকে টিনের একটা কলসি নৌকোর বাঁকে বাঁধা, জল ছেঁচার একটা থালা একদিকে পড়ে আছে, হুকো আর আগুনের পাত্র হালের দিকে, ডোরা[২] বাঁশ একটা একটা মাথাল পড়ে আছে, বড়ো ছোটো মিলিয়ে রশির বাণ্ডিল, আর মাছ নেওয়ার জন্য দুটো খাঁচা।

রবিজল হালে বসেছে, বাঁশি ও তোতা দাঁড়ে। দুলতে-দুলতে, দাঁড়ের শব্দ তুলে নৌকো চলছে। সমুদ্র বেশি কথা যেন আমাদের বলতে দেবে না—আসলে সমুদ্রের বিস্তার ও সর্বগ্রাসী সত্তা সবকিছুকে চুপ করে থাকতে বলে, কোনো কথা কোনো গল্প সেখানে জমে ওঠে না। সমুদ্রের ধাটলার কাছে সবকিছু তুচ্ছ।

২. **ডোরা ঃ জালের ফাৎনার সঙ্গে বাঁধবার জন্য হাত চারেক লম্বা বাশ। জাল পুরোপুরি ডুবে থাকে, শুধু ডোরার বাঁশ দেখেই জালের নিশানা ঠিক করতে হয়। ডেরো টেনে ফাৎনা থেকে মাছ তোলা হয়।**

দুলকি চালে নৌকো চলে। বালক বয়সের কথা মনে পড়ে, দোলনায় দোলার ছবি ভেসে ওঠে, শিশুকালের স্মৃতিটুকু হয়ে ওঠি। ঠিক স্মৃতি তো কারও থাকে না—শিশুবয়সের দোলনা-চড়া দৃশ্য কল্পনা করা যায় মাত্র।

জেলে নৌকোর ঐশ্বর্য কিংবা গঠন আলাদা। দু'দিকের মাথা বেশ উঁচু, কাছাও উঁচু, লম্বায় খুব একটা বেশি নয়—পেট শরীরের নৌকোর চেহারা গোলগাল ও বেঢপ। নৌকো থেকে মাঝে মাঝে লাফিয়ে ওঠা মেছো গন্ধ লিলিকে একটু কাঁপিয়ে দিচ্ছে বুঝি, কিন্তু সমুদ্রের ঐশ্বর্যের কাছে সবকিছু শিশু, বাতাসের ঘায়ে গন্ধটা মাঝে মাঝে হটেও যায়। তখন লিলির প্রাণময়তা বেড়ে যায়, অনেককিছু জিগ্যেসও করি। কিন্তু লিলি নিজের সম্পর্কে বলা থেকে খুব নিরাপদে কেটে যায়।

আমরা বসেছি নৌকোর তলার বাঁকের উপর পাতা তক্তায়। নৌকোর কাছা উঁচু বলে তক্তাটা তুলে দুই কাছার উপর আড়াআড়ি বসিয়ে দিলাম। কিন্তু অসুবিধেটা হয়েছে লিলিকে নিয়ে। তক্তা কাছায় তোলার পরও নতুন সমস্যা। লিলির পা নৌকোর তলায় ঠেকা রাখতে পারছে না, পায়ের নাগালে ভালো করে আসছে না। কাজেই দুজনে তক্তার দুই প্রান্তে নৌকোর কাছার দিকে বসলাম—দু'জনে একদিকে বসলে নৌকো কাৎ হয়ে যায়। এভাবে দূরে সরে যেতেই আমি দমে গেলাম। লিলি বিষয়টা উপভোগ করতে আমার দিকে তাকিয়ে যেন আপসোস করলো। বাঁশি একটা গান ধরলে :

গাঙরে, আমি তোর সোয়ামী হতে চাই
আমি তোর রাজা হতে..........

নৌকো যখন কূলের কাছাকাছি ঢেউয়ের এলোপাথারি মারের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো—পাল তোলার সময় হলো। পালে বাতাস লাগার জন্য এভাবে উল্টো এদিকে আসতে হয়। এবার সমুদ্রের দিকে নৌকো পাড়ি দেবে।

তোতা এবার হাল ধরলো। রবিজল ও বাঁশি শর[৩] তুলছে। বোরা বাঁশের মাস্তুলটা সোজা দাঁড় করিয়ে দিলো প্রথম। মাস্তুলের মাথায় ঘিলা[৪] পালের সঙ্গে আড়াআড়ি করে বাঁধা বাঁশের রশি সেই ঘিলার ভেতর দিয়ে চালিয়ে টান দিতেই সর সর করে পাল উঠলো। তারপর পালের নিচের

৩. শর : পাল
৪. ঘিলা : কপিকলের চাকা। যার ভেতর দিয়ে দড়ি অবাধে চলাচল করতে পারে।

দুই প্রান্তের সঙ্গে বাঁধা দড়ি হালের দিকে একসঙ্গে টেনে ধরতেই পাল হাওয়ায় ভরে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোতে একটা ঝাঁকুনি, তারপর তর তর করে চারকোণা পালের নৌকো ছুটলো। দাঁড়ের আর দরকার নেই, কাজেই দাঁড়ের সেই ঝাঁকুনিও নেই। আমি দাঁড় টানার জায়গায় গিয়ে বসলাম। লিলি বসলো নৌকোর মাথায়। নৌকোর মাথা শুখ চালু, পায়ে ঠেকা না দিয়ে বসা যায় না। লিলি তার পা আমার বসার জায়গায় ঠেস দিলো। তার সুন্দর পা দুটো আমার দিকে দিয়েছে বলে ক্ষমা চেয়ে নিলে। বললাম: দেহি পদপল্লব..........

লিলি আমার কথা শেষ করতে দিলো না, বললে: এ্যাই, ভালো হবে না বলছি, অমন কথা মুখে এনো না।

একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক......।

তোমাদের বঙ্কিমচন্দ্রকে এজন্যে আমার একদম সহ্য হয় না।

লিলির গোড়ালির দিকে পা একটু মোটা। এটা একটু অস্বাভাবিক। কিন্তু তার গৌর পা, ছিপছিপে পায়ের পাতা, লম্বা আঙুল, এবং রঙ এমন মানানসই যে আমি সেদিকে না তাকিয়ে পারছি না। লিলি লজ্জা পেলেও আত্মতুষ্টিতে ধমকে বললে: এ্যাই এমন করে দেখো না।

আমি প্রায় গুন গুন করে গেয়ে উঠলাম: সখি অতুল পদতল বাতুল শতদল। জানি না কি লাগিয়া পরশে ধরাতল........

লিলি আরও লাল হয়ে বললে: তাহলে এখান থেকে উঠতে হয়।

কিন্তু নৌকোর মাথায় বসতে ভারী আনন্দ। সমুদ্রের বিশাল বিস্তৃতি ও ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের ফেনা তখন আমাদের চুপ করিয়ে দিলো। সমুদ্র এভাবে শাসন করতেও জানে।

ঢেউয়ের দীর্ঘ লয়ে নৌকো নাচছে। আমি ভাবছি লিলি হয়তো আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না, বমি করতে পারে। তাছাড়া পা টান-টান করে ঠেস দিতে হয় বলে শাড়িতে পা ঢাকা সম্ভব হচ্ছে না। সুন্দর পদযুগল তেমনি বেরিয়ে শোভা বাড়াচ্ছে।

রবিজন, বাঁশি ও তোতা নৌকোর হালের দিকে। হুকো সাজিয়ে অনুচ্চ কথা বলছে। গভীর সমুদ্রে ট্রলারে মাছ ধরার কথা, বেপরোয়াভাবে বড়ো-ছোটো মাছ মারা ট্রলারের হিমাগারে জায়গা হয় না বলে বড়ো মাছ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া, ফেলে দেওয়া মরা মাছের লোভে হাঙর আসার কথা,

হাঙর মুক্ত এলাকায় হাঙরের উৎপাত সমস্যা চারদিকে। এসব কথা, আমাদের কথা কখনও আমাদের ছাপিয়ে নয়, নয় সমুদ্রকে ছাপিয়ে। রবিজলরা-তো আর গভীর সমুদ্রে যেতে পারে না, তাই তাদের জালে মাছ কমে যাচ্ছে। মাছের আবার ধাব আছে, মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে চলে। এখন ট্রলার বেপরোয়া মাছ ধরছে তাই তাদের পাতা জালের দিকে মাছ আসা কমে গেছে, বড় বড় মাছ কমে গেছে—তাদেব সমস্যাটা কেউই ভাবে না। এভাবে তারাও এক সময় চুপ হয়ে গেলো।

ক্ষণে-ক্ষণে সমুদ্র সকলকে বোবা করে দিচ্ছে--সমুদ্রের অপার বিস্তার আমাদের সকলকে মূক করে দিলো। আমি লিলিব দিকে তাকিয়ে সময় গুনছি, ভালোবাসছি...... ।

অল্প দূরে জালের কাছে নৌকোগুলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে উঁকি দেয়। তারা আগে পৌঁছেছে, কেউ কেউ আগ থেকে বসে আছে, জাল পাহারা দিচ্ছে। ডোরা ভেসে উঠলে জাল তুলতে হবে। জোয়ার স্থির হলে ডোরা দেখা যাবে। ডোরা থাকে ফাৎনার সঙ্গে আটকানো, ডোবা ধরে টান দিলে ফাৎনা উঠে আসবে, তারপর মুখ খুলে মাছ বের করে নেওয়া, মাছ নিয়ে কূলে আসা, বেপারীবা তখন হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়বে—ডাঙায় সব সময় মহাজন নামক মাছরাঙা ওৎ পেতে আছে—মহাজন তার নাম।

সমুদ্রের জল এখানে আরও বেশি নীল। লিলি মাথা নিচু করে জল নিতে চেষ্টা করছে না। অথচ খুব ইচ্ছে জল ছোঁয়। তার শরীরও গুলুচ্ছে বোধ করি।

তার পর ধবে বললাম : চেষ্টা করো, নাও, মাথায় দাও!

লিলি প্রায় তেড়ে উঠে বললে : এরকম করলে খুব খারাপ হবে কিন্তু তুমি আমাব পা ছুইছো কেন? আমার পাপ হবে যে!

মেয়েদের এইসব আনুগত্য বেশি-বেশি মনে হয়। তবু ভালো লাগে। তাছাড়া ভালোবাসা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়েই লিলি পাপপুণ্যের কথা তুলছে। অবাক তো!

কূল থেকে মাইল দুয়েক দূরে আমরা। ঢেউয়ের আঘাত এখানে কূলের কাছাকাছি এলাকার মতো নয়। বড়ো বড়ো বিলম্বিত হয়ে ঢেউ আসে বলে নৌকোর দুলুনি কম, অথচ মাদকতায় ভরা। ধীরে সুস্থে একটা ঢেউয়ের মাথায় নৌকো ওঠে তারপর চমৎকার ভঙ্গি করে বিলম্বিত দীর্ঘ ঢেউয়ের সঙ্গে

নৌকোর মাথা নামে, পেছনটা তখন ঢেউয়ের শীর্ষে থাকে। তাড়াহুড়া নেই অথচ ঢেউয়ের মাদক আমেজ সারা শরীর মন ধীর লয়ে দুলিয়ে দেয়। ঢেউয়ের ফণাগুলো আস্তে আস্তে ভেঙে সরসর শব্দ তোলে, ফেনা ও বুদ্বুদ ছড়ায়, অবার ঢেউ ওঠে আবার সফেদ ফেনারাশি। নোনা গন্ধ অনেক নিবিড় এখানে, অথচ তবুও অনুভবে আসে কি আসে না—ঐশ্বর্যের অবধি নেই। নোনা স্বাদে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে স্নায়ু ও শিরা, একপায়ে দাঁড়িয়ে যায় সমস্ত অনুভূতি।

লিলি সূর্যের দিকে তাকায়, দূরে তাকায়—দিগবলয় আর কূল দুই-ই রহস্যময়। মানুষও রহস্যময়। রবিজল ও বাঁশি গান গায়-তো আরও অচেনা হয়ে ওঠে। আকাশ দেখতে দেখতে, হেলে পড়া সূর্য দেখতে দেখতে লিলি সমুদ্রের দিকে তাকায়, হঠাৎ ভড়কে যায়; বলে আমার ভয় করে যদি টুপ করে পড়ে যাই?

তুমি তো সাঁতার জানো, ভয় কি!

সমুদ্রের বুকে বসে সাঁতার জানি কথাই ভুলে গেছি। বিশ্বাস করতে পারিছ না সাঁতার কেটে পাঁচ মিনিটও বেঁচে থাকতে পারবো।

শুধু এইজন্যে?

মনে হচ্ছে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যাবো, তলিয়ে যাবো।

মরতে তোমার ভয় করে!

হ্যাঁ। না, এখানে মরলে কোনো দুঃখ থাকবে না। এই মৃত্যু লোভনীয়।—লিলি কথা গুলিয়ে ফেলে।

পারবে মরতে?

তুমি কি পরীক্ষা করছো? নাকি প্রসঙ্গক্রমে বলছো?

শৈবলিনীও বলেছিলো, প্রতিজ্ঞা করেছিলো ডুবে মরবে। কিন্তু প্রতাপকে ফেলে সাঁতার কেটে পালিয়ে এসেছিলো।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলো না আর। বঙ্কিম পুরুষদের বারবার জিতিয়ে দিয়েছেন। শৈবলিনীকে, বলা যায় মেয়েদেরই তিনি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি মেয়েদের অমন করে এঁকেছেন।

তুমি পারবে বলছো? মরতে পারবে?

পাগল নাকি! কার জন্যে মরবো?

ভরা কাটাল। মাত্র গত পরশু পূর্ণিমা গেছে। তাই একটু চাঁদে পেলে কি আসে যায়।

এই দিনের আলোয়? সূর্য দেখো। ঘড়িতে এখন তিনটে মাত্র। সূর্য দপদপ করছে।

চাঁদের কাজ চাঁদ অদৃশ্য থেকেও করে।

মরবো কেন: লিলি কৌতুক করে বললে।

আমরা কেউ এভাবে মরবো না জানি। তবু জানতে চাইছি।

তুমি কি অদৃশ্যবাদী, হতাশায় ভুগছো?

নৌকো অনেকদূরে এগিয়ে এসেছে। একটা জেলে নৌকো খুব কাছাকাছি এসে গেছে। দুটো গাঙচিল ঢেউয়ে ভাসছে। নীল আকাশ সমুদ্রের নীলারঞ্জন ছায়া মেখে নিয়েছে নিজের গায়ে। লিলির পায়ের গোড়ালির গুরুভার মসৃণ পেলবতা আমাকে মগ্ন করে রাখে। ঢেউয়ের তোড়ে লিলি কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে—সে হয়তো মা-বাবার কথা ভাবছে, অথবা ভালোবাসা, অথবা বালিকা বয়সের কথা—কে জানে কি ভাবছে! নৌকোর মাথায় শুয়ে লিলি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

রবিজল গান গাইছে, সেই গান:

গাঙরে আমি তোর সোয়ামী হবো
আমি তোর রাজা হতে চাই।
আমার জীবন মরণ......

বাতাস ঠেলে দিচ্ছে পাল, পালের গায়ে বাতাস ঢুকে ঠাসা বুকের মতো উপচে উঠছে।

জালের কাছে আসলো নৌকো। একটা নৌকো জালের গোছের[৫] সঙ্গে বাঁশ। নৌকোর উপর দুটো বাঁকা দিয়ে চাদর টাঙিয়ে ছায়া তৈরী করে দু'জন জেলে শুয়ে আছে। রবিজলকে দেখে অভিবাদন জানালো। তখন রবিজল শর নামাতে ব্যস্ত। এসব কাজে সে এত দক্ষ যে প্রায় চোখের পলকে পাল গুটিয়ে নিলো। থৈ থৈ করছে সমুদ্র, গাঙচিল দুটো কোথায় উড়ে গেছে, দূরে আরও দুটো নৌকো ভাসছে। কথা হচ্ছে ডোরা কখন ভাসবে, জোয়ারের বেগ আর কতক্ষণ আছে। ওদিকে বাহির সমুদ্রের দিকে

৫. গোছ: সমুদ্রের মাটিতে পোতা গাছের গুড়ি। তার সঙ্গে জাল আটকে থাকে।

চার জনের একটা ছিপ নৌকো চলে যাচ্ছে, তারা বড়শি ফেলে হোন্দরা[৬] মাছ ধরেছে, দামী মাছ, এক ফুটের মতো লম্বা হয়, বিকোয় ভালো, সোনা রঙের হোন্দরা মাছ—আজকাল এই মাছ জালে খুব একটা পড়ে না, গভীর জল থেকে এদিকে আসে না।

রবিজল নৌকো বাঁধলো ঐ নৌকোর সঙ্গে নানা রশিতে। তারা জাল পাহারা দেয়, আজকাল সমুদ্র থেকে জাল চুরি হয়, চুরি করতে গিয়ে মারামারি হয় সমুদ্রের বুকে, শত্রুরা জাল কেটে দেয়—জল আর মানুষের সংগ্রাম।

'কুউ কুউ' ডাকলে গাংচিল আসে? অবাক-তো !

লিলি জোর দিয়ে বললে: অসম্ভব, হতেই পারে না। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

রবিজল হেসে হেসে বললে: ডাকেন, ডেকে দেখেন।

লিলি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো। আমি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে দুলে তাকে ডাকতে বললাম।

লিলি হাত দুটো গোল করে ওষ্ঠের চারদিকে রেখে দীর্ঘ শব্দ করে ডাক দিল কু-উ-উ....। ডাকটা শেষ করতে পারলো না, শব্দ করে হেসে উঠলো।

রবিজল আবার বললে: ডাকেন।

বাঁশি ও তোতা লিলির দিকে তাকিয়ে আছে; আমিও। লিলি আমাকে ডাকতে বললো। অবশেষে আমরা প্রায় একসঙ্গে ডাক দিলাম: কু-উ-উ......

লিলিকে শুরু করিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে গেলাম। লিলি ডেকে চললো। আমরা সকলে সেই শব্দের মোহনীয়তায় কেঁপে উঠলাম। ঢেউয়ের শীর্ষে-শীর্ষে ভেঙে-পড়া ফেনারাশি, আরও দূরের তিনটি নৌকো, আমাদের দোদুল নৌকো, নীল আকাশ, মোহনীয় সূর্যের আলো, বাতাসের মধুর প্রলেপ—শব্দের ভারে আমি কাঁপতে লাগলাম। যে সমুদ্র সকলকে নীরব হতে বলে, চুপ করে রাখে সেই সমুদ্র লিলির ডাকে খান খান হতে থাকে, মাতাল হয়। সমস্ত পরিবেশটি গমগম করতে থাকে। লিলিও যেন আর থামতে চায় না। তার ডাক ক্রমশঃ মধুর হয়ে ছোটো হতে থাকে, আচ্ছন্ন করে তোলে চারদিক —লিলিও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে ডাকতে থাকে।

চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। লিলির উড়ু উড়ু চুল আরও উড়াল, ভালোবাসার অনুভূতি আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু বাজে........সবকিছু অন্যরকম

৬. হোন্দরা মাছ: সামুদ্রিক মাছ। সোনালি রঙ তার।

মনে হয়, সমুদ্র যেন আর সমুদ্র নয়, রবিজল বাঁশি তোতার সঙ্গে আমার সখ্যতা জমে উঠে, ওরা আমার বালক বয়সের সঙ্গীর মতো আমাকে নিয়ে লুকোচুরি শুরু করে, লিলি যেন স্বপ্নে স্বপ্নে ভেসে যায়, সমুদ্র একবার সমুদ্রের মতো আবার সীমাহীন আকাশের মতো কাঁপতে থাকে—চারিদিকে সঙ্গীতের এক মোহনীয় পরিবেশ গড়ে ওঠে। তখন দুটো গাংচিল কোথা থেকে ছুটে এলো মাথার উপর। আমরা বুঝতেই পারলাম না, আমাকে অনুভব করতে দিলো না। তারা কোথা থেকে এলো। লিলি মগ্নস্রোতে ডাকছে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। গাঙচিল দুটো কক্ কক্ করে ওঠে। রবিজল তার কর্কশ গলায় ডাক দিলো কু-উ-উ........। তার দীর্ঘ উঁচু কর্কশ ডাকে এক ঝাঁক গাঙ-চিল উড়ে আসছে কূলের দিক থেকে। গুণে দেখলাম নয়টি গাঙচিল আমাদের মাথার উপর উড়ছে। শব্দ করছে। তাদের ধবধবে সাদা উষ্ণ বুক আমাকে মোহনীয়তায় ডুবিয়ে একাকার করে দেয়। লিলি আমার হাত ধরে চুপি চুপি বললে: এ্যাই, ওরা আমাকে দোষ দেবে না তো—আমার ভারী ভয় করছে।

ভয়ের কি আছে বলে, অথবা তার হাত ধরে আশ্বাস দিলাম।

রবিজল নৌকো থেকে একটা পচা মাছ তুলে ছুঁড়ে দিলো। অমনি একটা গাঙচিল কাৎ হয়ে ছোঁ মেরে মাছটি ধরে আবার উঠে গেলো। নিখুঁত সেই ছোঁ মারার ভঙ্গী ও দক্ষতা। পাখায় একটু ঝাপটা তুলে ঠোঁট দিয়ে ধরে আর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাঙচিল ভাসতে লাগলো। তার শ্বেত বক্ষ, পাখার চঞ্চল গতি, ছোঁ মারার ভঙ্গী আমাদের মগ্ন করে দিলো, চুপ করে থাকতে বললো।

গাঙচিল উড়ছে। ওরা থাকে দূর লাদাখের উঁচু হ্রদে, হ্রদের জলে পাতা ও খড় বিছিয়ে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফোটায়। শীতের শুরুতে দক্ষিণে চলে আসে, সমুদ্রের ধারে শীতটা কাটিয়ে যায়। আবার গরমের শুরুতে ফিরে যায় নিজেদের বাসভূমিতে। রবিজল বলে ওরা ডিম পাড়ে দূর দ্বীপে। সেই দ্বীপ কাদাময়, মানুষের বসতি নেই সেখানে, সেখানে জেলেরা বর্ষার শেষে মাছ ধরতে যায়, সেখানে কাদার উপর, বালির চড়ায় ওরা ডিম পাড়ে, মানুষ তাদের ডিম দেখতে পায় না, ওরা মানুষের কাছ থেকে ডিম লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসে। রবিজল এরকম অনেককিছু বলে-ওরা সমুদ্রের প্রাণ, ওদের মারতে নেই। জেলেরা গাঙচিলের মৃতদেহ পেলে

মাটির নিচে পুঁতে ফেলে—রবিজল তার জীবনে কখনও কোনো গাঙচিল মরতে দেখেনি। মরার সময় হলে ওরা কোথায় যে উড়ে যায় কেউ জানে না। ডিমও সে কোনোদিন দেখেনি। শুনেছে ডিমগুলো সবুজাভ সাদা, কখনও ফিকে হলদে রঙের ওপর লালচে ও বাদামী ছোপ থাকে, থাকে বিচিত্র ডোরাকাটা দাগ। এই পাখি ও পাখির ডিম কোনোদিন তারা খাবে না, কোনোদিন মারবে না—কোনোদিন নয়।

গাঙচিলের শ্বেত শুভ্র বক্ষ দেখতে দেখতে আমরা নিজেদের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। ডোরা তখন ভেসে উঠেছে, জাল তোলার সময় হয়েছে। আমি লিলির দিকে তাকিয়ে, তার খোলা চুল, চিবুক, ওষ্ঠ, বুকের ওঠানামা দেখতে দেখতে গাঙচিলের ডানার প্রথম বড়ো কালো পালকটির শেষ প্রান্তের দিকে আছে সাদা রঙের ছোপ আর বুক ধবধবে সাদা, মাথার রং ধূসরাৎ সাদা, কানের পেছনে একটা চন্দ্রকলার মতো বাঁকা কালো দাগ, পিঠের ওপরের দিকটা ধূসর—লিলির থেকে রবিজলের দিকে তাকালাম। রবিজল ডোরা টেনে জালের ফাৎনা ধরেছে, ফাৎনা তুলে নিয়েছে নৌকোয়, ফাৎনার মুখের রশির গিঁট খুলে মাছ ঢেলে নিচ্ছে খাঁচায়। রবিজল এসব কাজে এত ক্ষিপ্র যে ভাবা যায় না। তার মুখে একটিও কথা নেই। সমুদ্রের অপার বিস্তার তাদের চুপি চুপি কাজ করতে শিখিয়েছে।

খাঁচায় মাছ—সাদা, লাল, ধূসর, লালচে রঙের নানা জাতের মাছ। লিলি ও আমি উঠে খাঁচার উপর ঝুঁকে পড়লাম। এমন তো আগে কোনোদিন দেখিনি......তুলতুলে লটে মাছ, নানা জাতের ছোটো চিংড়ি, ফাইস্যা, দুটো হোন্দরা, রিক্সা, ট্যাংরা, ফাতরা কত জাতের মাছ। লিলি একটা জ্যান্ত মাছ ধরে নৌকোর তলায় জলে ছেড়ে দিলো। জলের স্পর্শে কী সুন্দর ভাসছে, তার রূপোলি তুলতুলে শরীর থেকে কাঁপাকাঁপা শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছে। একটা মরা ফুলে-উঠা বড় ট্যাংরা মাছ তুলে মাথার উপর ঘূর্ণ্যমান গাঙচিলের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। রবিজল বললে ও-মাছ মায়না[৭] পাখি খাবে না। কেন? সত্যিই তো। গাঙচিল মাছটি তুলে নিয়ে আমার ছেড়ে দিলো। সমুদ্রে পড়তেই আর একটি পাখি আবার তুলে নিলো, তুলে কিছুদূর ওঠেই আবার ফেলে দিলো। আসলে ঐ ট্যাংরার কানের দুপাশের কাঁটা দুটো সোজা

৭. মায়না : গাঙচিলের স্থানীয় নাম।

খাড়া হয়ে আছে। তাই গিলতে পারবে না বলে ফেলে দিলো। রবিজলের কথায় যতবার অবিশ্বাস করেছি ততবার ঠকলাম। যদি মাছের কাঁটা দুটো স্বাভাবিকভাবে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকতো। তবে ঠিক গিলে খেতো। এখন ট্যাংরা আর কাঁটা তারা হজম করতে পারে।

লিলি আরও দুটো জ্যান্ত মাছ নৌকোর খোলে ছেড়ে দিয়েছে, আপন মনে তাদের ছুটে চলা দেখছে। লাল চিংড়ি মাছ কী যে সুন্দর! ইতিমধ্যে রবিজল আর একটা জাল থেকে মাছ তুলেছে। সেই জাল থেকে উঠেছে একটা জালো সাপ, সারা গায়ে কালো-সাদা ডোরা কাটা দাগ, অনেকটা ঢোবা সাপের মতো। সাপ দেখে লিলি আঁৎকে উঠলো। রবিজল সাপের লেজ ধরে ছুঁড়ে মারলো দূরে—লিলি আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বিষাক্ত পোটকা মাছ উঠেছে। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি জীবিত ও মৃত মাছের দিকে। লিলি ধীরে ধীরে বিমর্ষ হয়ে চুপ হয়ে গেলো। তোতা, বাঁশি, রবিজলও এখন চুপচাপ। আমরা জানি না কেন হঠাৎ চুপ করে গেলাম—সমুদ্রই-তো কথা। এতক্ষণ যাহোক বলেছি, এবার আমিও চুপে গেলাম। গাঙচিলও এখন আর আমাদের বিষয় নয়, ওরা মারামারি করছে, যেন কেড়ে খাচ্ছে একে অন্যের থেকে। আমরা সকলেই একে-একে চুপসে গেলাম, সূর্যও অনেক হেলে পড়েছে, জলে ভাটির টান বেড়েছে, বাতাসও আগের মতো উত্তাল নয় —কিন্তু সমুদ্র কখনও একেবারে হাওয়াশূন্য হয় না। লিলি চুপচাপ সেই দুটো লটে মাছ নিয়ে খেলছে, উদাস ও মগ্ন হয়েছে বঙ্গোপসাগর, চরাচর চুপি চুপি কী যেন বলতে চাইছে। রবিজল পাল খুলছে এবার। দু'একবার ময়না পাখিদের ডাকলো লিলি। ঢেউয়ের শব্দের কাছে, বঙ্গোপসাগরের চুপ করে থাকতে বলা উঁচানো তর্জনীর নিচে লিলি পাখিদের ডাকছে, পাখিরা লিলির ডাকের আওতায় ডুবে আমাদের সঙ্গে ছুটছে। সমগ্র বঙ্গোপ-সাগর জুড়ে লিলির মৃদু ডাক, গাঙচিলের শব্দ—সমস্ত চরাচর জুড়ে তারা নিজেদের অধিকার বিস্তার করছে—সমুদ্র কী তা দেবে কোনোদিন! আমরা সকলেই সমুদ্রের শাসন মেনে চুপ—লিলির ডাকের কাছেও আমি চুপচাপ, একেবারে চুপচাপ।

কূলে আসতেই কুপি বাতি ও লন্ঠনের আলোয় মহাজন-বেপারীরা মাছের খাঁচার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমরা ধীরে ধীরে সেই আলোর আওতা পেরিয়ে ঠাণ্ডা বালিতে পা ফেলে অন্ধকারে ডুব দিয়েছি। আজ দুই

ঘড়ির অন্ধকার, চাঁদ উঠবে আরও কিছুক্ষণ পর। দূরে সমুদ্রের তীরে যেখানে বাঁধানো রাস্তা শেষ হয়েছে, যেখানে সমুদ্র-বিলাসীরা গাড়ি থেকে নামে, সেখানে চা আর ঝিনুকের দোকানের বাতি জ্বলছে টিমটিম! ভ্রমণ বিলাসীরা সবাই ফিরে গেছে, সমুদ্র থেকে আসছে শরশর সাঁই সাঁই আওয়াজ। লিলি চুপচাপ, চুপচাপ আমরা ফিরছি। পায়ের নিচে জল সরে যাওয়া ঠাসা বালির মসৃণ ধার। রবিজল, তোতা ও বাঁশি এতক্ষণ হয়তো ঘরে ফিরে গেছে, অথবা মাছ বিক্রি করছে বেপারীর কাছে, দরদস্তুর হচ্ছে, গাঙচিলের ডাক নেই, কাকদের কোলাহল নেই, শুধু সমুদ্র তার নিজস্ব ভাষায় শরশর গান গেয়ে যাচ্ছে, পেছনে মাছ বেচা-কেনার কথা। ছোটো ছেলেমেয়েরা ঝুরি নিয়ে মাছ চেয়ে নিচ্ছে, খাঁচা থেকে পড়ে-যাওয়া মাছ তুলে নিচ্ছে, কেউ কেউ মাছ বাছার নামে চুরি করে দু'একটা তুলে নিচ্ছে না একথা বলা যায় না, বেপারী টাকা গুণে দিচ্ছে.........সবকিছু উপর সমুদ্রের ঢেউয়ের সরাৎ সবাৎ শব্দের অভিঘাত, ভাঙা জাহাজটি ভৌতিক ছবির মতো অন্ধকারে ডুবে আছে, বাতি জ্বলছে পাড়ার ভেতর, টানা সুরে কে একজন ডাকছে তার ছেলেকে, পাড়ার কোনো দজ্জাল মেয়ে যেন ঝগড়া করছে, আমাদের সমস্ত কথা যেন ফুরিয়ে গেছে, বিশাল অন্ধকারে সমুদ্রে ঠিক সমুদ্রের মতো পড়ে হাসলাচ্ছে।

লিলি হাঁটতে হাঁটতে ডাকলে, থেমে দাঁড়ালো—আমার উঠতি পা গেলো থমকে। তার ডাক আমার বুকের ভেতরের তল স্পর্শ করে, হৃদয়ের আমূল কাঁপিয়ে, সমস্ত স্নায়ুকে একপায়ে দণ্ডবৎ করে......আমি আচমকা থেমে গেলাম। লিলিও দাঁড়িয়ে আছে। অনন্ত নক্ষত্র আকাশটা আরও নীল করে তুললে। না কালো নয়: রাত্রির আকাশও নীল, গাঢ় নীল বলে কালো মনে হয়। ঐ নীলের গভীরে, নক্ষত্রের ভেতরে, সমুদ্রের গর্জনে, বেপারী ও জেলেদের বেচাকেনার শব্দের গভীরে ডুবে আমি দাঁড়িয়ে আছি। লিলি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা একে অপরকে কিছু বলবো বলে চুপ করে আছি, যেন আকাশও কিছু বলবে বলে মাথার উপর ঝুঁকে আছে, সমুদ্রের শব্দের মধ্যেও কী যেন একটা কথা লুকিয়ে আছে, আছে তারাদের মধ্যেও—লিলি কি যেন বলবে বলে আমার বাহুতে হাত রাখলো, সমুদ্রের সঙ্গে কি যেন চুপচাপ বলে নিলো, অন্ধকারের অন্ধকার থেকে কি যেন তুলে আনলো। ভাঙা জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ—শব্দের মধ্যে ডুবে, ডুবিয়ে আমাকে দণ্ডবৎ করে লিলি তার মুখ এগিয়ে দিলো, অথবা শুধু দাঁড়ালো।

ধীরে ধীরে, প্রথমে শিরশির কেঁপে, তারপর উন্মত্ত আবেগে বুকে টেনে নিয়ে অন্ধকার সমুদ্রের গর্জনের মতো লিলিকে চুম্বন করলাম, চুম্বনের সময় তীব্র বাসনা কোমল বেদনায় লুটিয়ে পড়ে আমার নিশ্বাস বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম ; আমাদের দু'জনের হাঁফ ধরে গেলো—এমন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আগে হয়নি, আগে কখনও এমন সুন্দর ওষ্ঠে আমার ঠোঁট জিহ্বা দাঁত নিবিড়তা ও বন্ধুত্ব পায়নি। ভালোবাসা আমাকে ডাক দিলে, ভালোবাসা আমার সমস্ত-কিছু দুমড়ে মুচড়ে পিষে দিলে, বুকের ভেতর নিনাদ শুরু হলো, সমুদ্রের গভীর মর্মস্পর্শী নিনাদ—শুরু হলো।

চুম্বনের অনিন্দ্য উৎসবের বিরতিতে আমি তার পরিচয়, তার কাছ থেকে কথা আদায় করতে চেষ্টা করলাম। আমি জানি কথা আদায় করার কোনো অর্থ হয় না, জানি ভাগ্যকে অতিক্রম করা যায় না—বাইরের খোলস ধরে টানাটানি করছি শুধু। লিলিও সেদিকে গেলো না। শুধু বললে : আমার পরিচয় কী খুব জরুরী, আমার চেয়ে আমার পরিচয় তোমার কাছে বড়ো হলো!

লিলির কথায় আমি কেঁপে উঠলাম। আজ সারাদিন একবারও তার পরিচয় জানতে চাইনি, নৌকোয় বসে প্রসঙ্গটা তুলবো ভেবেছিলাম কিন্তু তুলিনি। গত দু'দিন জানতে চেয়ে হার মেনেছি। কিন্তু এবার আমার মধ্যে ভয় ঢুকলো, তার এই রহস্যময়তা একবার পীড়াদায়ক আর একবার শোকাবহ হয়ে আমাকে জাপটে ধরলো। আমি শুধু ভাবছি, ভয় করছে আগামীকাল যদি অন্যকিছু ঘটে, যদি আর আমার কাছে লিলি না আসে, যদি এমন করে না আসে, যদি দেখা না হয়? আমি প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করছি ওকে কতো ভালোবাসি। চুমুতে চুমুতে ঢেকে অনুরাগে বেদনায় জ্বালায় কান্নায় মমতায় বোঝাতে চেষ্টা করছি কতো ভালোবাসি—আমার প্রেম, আমার জীবন, স্বপ্ন........হৃদয়ের মর্মমূল থেকে ছেঁকে এনে বোঝাতে চেষ্টা করছি, আমার সমস্ত আনুগত্য দিয়ে প্রকাশ করতে চাইছি........ কিন্তু কেন। এত বোঝানো, কেন এত চেষ্টা, কেন প্রমাণ দেখানোর এমন প্রয়াস—কেন লিলি বোঝে না আমার আর্তি আকুলতা, আমার হৃদয়, কেন লিলি বোঝে না বেঁচে থাকার মতো ভালোবাসা এত প্রয়োজনীয় ও মহার্ঘ।

পরদিন সকাল। এক রাতে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ সেই বেদনা আবার আমার বুকের মধ্যে সত্যকার বেদনা হয়ে বাসা বাঁধলো। হারানোর

ভয় তীক্ষ্ণ হুল হয়ে বুকের ভেতর বেজে ওঠলো।—কী করি এখন, কী করা যায়! কিন্তু তার কাছে যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। লিলি চলে গেছে, কেউ বললো না সে কোথায় গেছে, লিলির বাবা আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলো না। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে বাড়ির চাকরের হাত দিয়ে শুধু একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলো। চিঠি পেয়ে আমি এক নিঃশ্বাসে পড়লাম। একটা সাদা অত্যন্ত সাধারণ কাগজের টুকরোয় লেখা:
"তুমি আমাকে ভালবাসতে চাও জানি। কিন্তু তুমি জানোনা যে আসলে তুমি আমাকে ভালোবাসো না—সেটা আমি টের পেয়েছি গত সন্ধ্যেয় বালিয়াড়ির অন্ধকারে যখন উন্মত্তের মতো বলছিলে 'ভালোবাসি', তুমি যখন কাঁদছিলে আবেগে থর থর কাঁপছিলে তখন তোমার মনের মধ্যে আমাকে ভালো না বাসার ছবিই ফুটে ওঠেছে। কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালোবাসার, আমার অন্তরের প্রেমকে তুচ্ছ করে শেষ করতে পারি না। আমি জানি আমার গ্লানি আজ আমাকে চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আমার ছেলেমানুষী ভালোবাসা, স্বপ্ন, সাধ আহলাদ গত সন্ধ্যেয় তোমার চুমুতে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। তবুও আজ আমি প্রার্থনা করছি আমাকে ত্যাগ করার শক্তি হোক তোমার, আমাকে ভোলার শক্তি হোক তোমার, এবং তুমি সম্পূর্ণ মোহ মুক্ত হয়ে নতুন করে জীবন গড়ে তোলো—সুখী, সুন্দর ও সুস্থ জীবন তোমার হবে বলে বিশ্বাস করি--আমার সকল শুভ কামনা তোমার জন্য তোলা রইলো। বিদায়।"

এক নিঃশ্বাসে চিঠি পড়ে শেষ করলাম। শেষ করে আবার পড়লাম—কোথাও আশ্বাসের বাণী আছে কিনা খুঁজতে চেষ্টা করলাম। ব্যর্থ হয়ে ধীরে ধীরে ভোরের ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। সামনে পড়লো চিনবুক রেস্তোরাঁ, বুকের ভেতর দুমড়ে মুচড়ে উঠলো। মাত্র গত পরশু এই রেস্তোরাঁয় আমরা খেয়েছি, মাত্র দু'দিনের মধ্যে সবকিছু স্মৃতি হয়ে উঠলো, লিলিও হয়ে গেলো স্মৃতি!—সেদিন থেকে জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

গত তিনদিনের কথা ভাবতে ভাবতে মনে হলো আমার বয়স এক লাফে এক যুগ বেড়ে গেছে—দীর্ঘ বারো বছর বয়স এক মুহূর্তে পেরিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সমুদ্র থেকে আসা দমকা হাওয়া আমাকে আরও বুড়িয়ে দিতে লাগলো।

জানুয়ারী, ১৯৭৭

হিজল-দাগায় ভরা

সেলিনা হোসেন

আয়াত আলীর হিনজালি বুকটা এখন টাটকা বাতাসের জন্যে উন্মুখ। ঘরের বাইরে এসে ও প্রাণভরে শ্বাস নিল। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলো আসলে শ্বাস নেয়াটা তেমন জরুরী ছিল না। মাথাটা মাঝে মাঝে এ ধরনের ঝাঝিবুঝিতে মেতে ওঠে। আয়াত আলীর কাছে তখন সেটা এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। পিঠের ওপরেব কাপড়ের বোঁচকাটা একবার ডান হাতে নিল তারপর বাম হাতে। তবু'ও পা নড়াতে পারল না। ডাকাবুকা আয়াত আলীর বুকের মধ্যে ভয়ের আওয়াজ বানুনির ঢোল হয়েছে। একবার মেতে উঠলে আর কিছুতেই থামতে চায় না। তবু'ও দৃষ্টিটা বিতিবিতি ঘোরে। অল্প সময়ে ধুতুরার ফুলের মত হলুদ বিষে আক্রান্ত হয় ও।

এক পা গিয়ে আবার দাঁড়ায়। পেছনে তাকায় দু'বার। খড়ের চালাটা যেন ফাঁস-লাগিয়ে ঝুলে থাকা মোহসীনের চোখের মত। ঠিকরে বেরুতে যাবার আগে দম ফুরিয়েছে। আয়াত আলীর বুকের ভেতরের শব্দটা এখন মৃদু লয়ে দ্রিম দ্রিম করছে। একটু পরে বাঁশপাতারি হয়ে যাবে। ও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। সামনে তাকায়। দেখে বেগবতী নদীর মত আঁধার ছুটছে। সে আঁধারের কোন দিশপাশ নেই। ডানে তাকিয়ে পেলো করমচার ঝোপ। বামে ছফদরের প্রায় ভেঙে-পড়া ঘরের একাংশ। নিত্য-দিনের দেখা পরিচিত দৃশ্য কেমন পাংশুটে দেখায়। তাই উপাশতিয়াশ টাকরায় ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ তোলে। ও জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটে। এখন উপাশতিয়াশের সঙ্গে আশনাই করলেই জাপটে ধরবে। ঠিক এ মুহূর্তে সেটা আয়াত আলীর কাম্য নয়। ফলে আবার স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় ও। বুকের সেই শব্দটা হাওয়া। ভাঁটফুলের গন্ধে অন্তরেব বিষ মুছে যেতে চায়। কিন্তু নিঃশেষ হয় না। আসলে সে বিষ নিজের ওপরে নিজের একপেশে রাগ। কিন্তু সেটারও থিতু নেই। পবক্ষণে সে বিষ গিয়ে

গড়ায় পারিপার্শ্বিক মানুষের ওপর। ঘরগেরস্থালি, এমন কি গাছগাছালির ওপরও। আয়াত আলী কিছুক্ষণ হতবাকের মত দাঁড়িয়ে থাকে। এ ধরনের মৌনভাব মাঝে মাঝে ওকে দার্শনিক করে। তখন ও জীবন জগৎ সংসার নিয়ে এমন সব কিছু ভাবে যা ওকে অস্থির করে তোলে। পরক্ষণে কাঁদায়। ওর মনে হয় বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে পারলেই সব শান্তি। সব দুখ ঘুচে যায় ধানের শীষের পরাগ রেণু মুখে মাখলে। তখন মৈলকা অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু আজও নতুন কিছু ভেবে ওঠার আগেই লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের পিঁড়ায় এসে ওঠে। আগুনের মালসা ঘেঁটে এক টুকরো আধো-নেভা কয়লা খুঁচিয়ে বের করে। তারপর বিড়ি ধরায়।

ও ভেবে দেখল সকাল হতে এখনো অনেকটা বাকী। নইলে ঐ মেনিমুখো আকাশটা অন্তত আরো একটু তাজা হোত। কিযে বিশ্রি লাগে এই সময়টা। সকাল হয় হয় করেও হয় না। অনেক রাতে এ সময় ঘুম ভেঙে যায়। তারপর পিঁড়ায় বসে আঁধার দেখে আয়াত আলী। আঁধার দেখে আর বিড়ি টানে। আজ মনে হয় এই সময়টার মত নিদারুণ বর্ণহীন অজানার পথে পা বাড়াচ্ছে ও। তখুনি জোরালো শ্বাস উঠে আসে বুকের পাঁজর বেয়ে। ধুৎ! মন ছোট করলেই ছোট হয়। এখানে থেকেই বা কি হবে। জমিতে ধান নেই। মাঠে কাজ নেই। এখন আয়াত আলীর জন্য ঘরের মায়া অর্থহীন। লাবালুবি গরম ভাত তার লমশমি যৌবন নিয়ে আয়াত আলীর কাছ থেকে অনেকদূরে সরে গেছে। ভাবতে ভাবতে ওর মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। বিন্নাফুলি ধানের গোছা নিয়ে ও কতদিন প্রতিজ্ঞা করেছে একে ছেড়ে কোথাও যাবে না। এখন ওর দার্শনিক মস্তিষ্কে কোন প্রতিজ্ঞা নেই। টুকরো টুকরো স্মৃতি হাঁকরা বাতাসের মত এদিক ওদিক বয়। রিড়াকুড়া জীবনে স্মৃতিটা চমৎকার খেলোয়াড়। নেশার মত ভুলিয়ে রাখে। বাইশ জোড়া পায়ের মাঝে গোলাকার পিচ্ছিল বস্তু যেন। ফাঁকে ফাঁকে দৌড়য়।

দু'দিন আগে ছফদর এ চিন্তাটা ঢুকিয়েছে ওর মাথায়। সেই থেকে ও একটানা ভেবে চলেছে। আজ সকালে মন স্থির করেও এগুতে পারেনি। মনে হয় আরো একটু সময় দরকার। আবার ভাবে সময় নিয়েই বা কি হবে। সময় মানেই তো ছিনালী মাগীর নক্‌কি-নক্‌কি। বাগে পেলে হাড় মাংস এক করে ছাড়ে। পেটে আগুন রেখে বুকের মায়া বাড়িয়ে তোলে।

এ ধরনের ফাঁকিবাজির সঙ্গে পাল্লা দেয়া আয়াত আলীর কম্ম নয়। অর্থহীন মায়া। অগোছালো ঘরদোর, হাঁড়িকুঁড়ি, ছেড়া কাঁথা, বালিশ চাটাই ইত্যাদি আলুথালু নারী হয়ে বেহায়ার মত পড়ে আছে। ওগুলোর জন্য আয়াত আলীর কোন দরদ নেই। তবু কিসের মায়া? ও নিজেকে প্রশ্ন করে। বুঝতে পারে না। মনে হয় সেই একটা টান যা জন্ম জন্মান্তরের। সে টান কোন সমস্যার সমাধান দেয় না। কেবলই জটিল কবে তোলে মনের অন্ধি-সন্ধি। দাঁতাল জন্তুর মত অনিশ্চিত ভবিষ্যত কামড়ে ধরে। ভাবতে ভাবতে আয়াত আলী ছাতলা ধরা দাঁতের সারি এক টুকরো সরু কাঠি দিয়ে অকারণে খোঁচায়। দাঁতের ফাঁকে কিছু নেই। তবুও খুঁচিয়ে আনন্দ পায়। আয়াত আলী জানে শুধু আমানি খেলে দাঁতের ফাঁকে কিছু আটকায় না। পান্তাভাতের পানিটুকু ওর হলুদ ময়লা দাঁতের গা বেয়ে নেমে গেছে কেবল। ঘরের চালে সন্‌চড়া পাখি কিচকিচ করে। আয়াত আলী হাত উঠিয়ে তাড়াতে চায়। কিন্তু পবক্ষণে হাত নামিয়ে নেয়। থাক্। ওটা প্রাণভরে ডাকুক। মাঝে মাঝে আয়াত আলীব প্রাণটাও কেবল পুকপুক্ ডাকতে চায়।

আকাশে অগস্ত্য নক্ষত্র জ্বলজ্বল কবে। ও জানে অগস্ত্য নক্ষত্রেব উদয়ে শরৎ ঋতু শুরু হয়। বাবা ওকে এটা শিখিয়েছিল। অনেক নক্ষত্রের নাম জানত ওর বাবা। আয়াত আলীকে নক্ষত্রের নাম শেখানো ছিল তার নেশা। কিন্তু সব নক্ষত্রের নাম মনে রাখতে পারেনি ও। নক্ষত্র খোঁজার চাইতে মাঝরাতে শাম্‌কুকড়ার ডাক শুনতে ভাল লাগত ওর বেশি। ঘুম জড়ানো চোখে দূরের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে ওর ভয় করতো। মনে হোত বাবা বুঝি নেই কোথাও। বাবা বাবা করে ও গলা ফাটিয়ে ডাকছে তবু কেউ সাড়া দিচ্ছে না। সেই সাঁইসিট পরিবেশ কালো বাতাস হয়ে আয়াত আলীর মাথার মধ্য দিয়ে বইছে। অথচ পাকা ধানের ম ম গন্ধ ওর সমগ্র অনুভূতি শলমলা করে দিচ্ছে। এখন আয়াত আলী শূন্যমনে অগস্ত্য নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৈশোর যৌবনের সোঁদালো গন্ধময় দিনগুলো লাফাতে লাফাতে স্মৃতির মাঠে এসে টান টান হয়ে দাঁড়ায়। এখন ভরা আশ্বিন। তখন ভরা আশ্বিনে বাতাসের গন্ধ বদলে যেতো। এক একজন সম্পন্ন মানুষ ঘুরে বেড়াত গাঁ-গেরাম জুড়ে। এখন তেমন ছবি নেই। আছে টুকরো—আছে ভগ্নাংশ। মানুষের আদল পাল্টে গেছে। আয়াত আলী চোখ বুজে দৃষ্টি শান্ত করে। এখন আশ্বিনের আকাশ থমথমে।

কাঁচা সোঁদালো গন্ধ নেই কোথাও। কেবল নেড়ি কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে। মানুষের গলা থেকেও অবিকল তেমন শব্দ বেরুতে চায়। কখনো বেরিয়ে যায়। আয়াত আলী দেখল এই ভরা আশ্বিনের চকচকে বুকের মায়া থেকে ছিটকে পড়ে মানুষগুলো নেড়িকুত্তা হয়ে গেছে। ও ট্যাঁকে হাত দিয়ে বিড়ি খোঁজে।

আঁধারের এখন ফুটিফাটা অবস্থা। ঠিকরে পড়া আলো বিচ্ছুরিত। পাখসাটের শব্দ আসছে। আয়াত আলীর মনের ভেতর আর কোন উত্তেজনা নেই। নিজের ওপর রাগ বাড়তে থাকে। আঁধার ভেঙে বেরিয়ে আশা আলোর মত রাগ। শালা, সবটাই মাটি। ফিরে না এলে অনেকটা চলে যেতো। এখন ঘরে কিছু নেই। শূন্য হাঁড়ি উল্টে আছে। গতকাল নয়নজুলির ওপার পর্যন্ত ঘুরে এসেছে ও। সবকিছু বেপৈট, বিরাণ হয়েছে। শণফুল কেমন হলুদ হয়ে গেছে। আহরিৎ ধানের ক্ষেত উবে সাফ। শাকোশেওলার অবাধ রাজত্ব। কেবল নয়নজুলির ক্ষীণ জলের শরীরে ব্যাঙের ছানা ফুটকি দিয়ে ওঠে। আয়াত আলীর বুকের ভেতর বেতিশটা। তবুও দাঁড়িয়ে ব্যাঙের খেলা দেখেছিল। ওকড়া লুঙ্গি টেনে ধরছিল বারবার।

বিশাল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আয়াত আলী কোন পিছুটান অনুভব করেনি। কেবলই মনে হয়েছিল বড় সড়ক ধরে সোজা চলে গেলে ও শহরে পৌঁছবে। মরিবাঁচি করে মানুষগুলো এখন ব্যাঙের মত ফুটকি তুলছে। আবার ডুবে যাচ্ছে। হঠাৎ করে অপরিসর জলনালিটা আয়াত আলীর কাছে অন্তহীন সাগর হয়ে যায়। মানুষগুলো কেবল ডোবে আর ওঠে। ব্যাঙের মত ফুটকি কাটে।

ঝিঁকরা গাছের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়। পাঁদাড়ের কটুগন্ধে ভরপুর সে বাতাস। আয়াত আলী কাপড়ের পোঁটলাটা ঘরের ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে উঠোনে নেমে আসে। খর খরে স্বভাবের জন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে খুব একটা ভাব নেই। কেবল ছফদর ওকে ছাড়ে না। অকারণে মান্যি করতে আসে। সেটাও আয়াত আলীর পছন্দ নয়। মনে হয় ওকে মান্যি করার মত কোন গুণ নেই ওর। তাই শুধু শুধু কেউ কিছু দিতে এলে রাগ হয়। গাঁয়ের লোকে বলে, ব্যাটা বড় চোখল। তাতে কিছু যায় আসে না আয়াত আলীর। স্বভাব দিয়ে করবে কি ও? চোখল বা হাঁদা দু'টোই ওর কাছে

সমান। বিশেষ মুহূর্তে প্রতিটি মানুষই দার্শনিক হয়। এ ব্যাপারটা ওর কাছে বড় বেশি আরামদায়ক। আয়াত আলী নষ্ট বাতাস গায়ে নিযে আড়িমুড়ি ভাঙে। নির্ঘুম এবং উৎকন্ঠায় ভরা গত রাতটা এখন প্রতিশোধ নিচ্ছে। চোখ জ্বালা করে। মাথাটা কেমন ভার হয়ে আছে। আয়াত আলী পুকুরের দিকে হাঁটে। হয়তো গোসল করলে ভাল লাগবে।

তোবারকের শিউলি গাছের নিচে এসে থমকে দাঁড়ায় ও। আমিনা শিউলি বড় ভালবাসত। এখন আমিনা পরের বৌ। বুশাবুশা শিউলির মত এখন সে স্মৃতি পানসে। আযাত আলী ইচ্ছে করলেই তো আমিনাকে পেতো। সে ইচ্ছে ওর কোনদিন হযনি। আমিনার জল-টলটল চোখের দিকে তাকিয়েও আয়াত আলীর নাড়িতে কোন টান পাক দিয়ে ওঠেনি। বরং মনে হয়েছিল আমিনার ভালবাসা ওর জীবনে তেমন জরুরী নয়। এ ভালবাসা না পেলেও আযাত আলীব খুপছায়া জীবন নদীব ঘূর্ণির মত অনবরত চক্রাকারে ঘুরবে।

আমিনা কেঁদেছিল অনেক। পবে অভিশাপেব মত কবে বলেছিল, ভালোবাসা বিনে ব্যাইচা থাকার কুনো স্বাদ নাই আয়াত ভাই? নিরুত্তর আযাত আলী মনে মনে হেসেছিল। উপদেশ মানে ও বোঝে জাল ফেলে মাছ ধরা। আমিনা তেমন একটা জাল ফেলেছে। তারপর সেটা আস্তে আস্তে গুটিয়ে ওঠাবে। জালের কথা মনে করে ও হেসেছিল। ত্রিকোণাকার বোয়াল জাল ওর খুব পছন্দ।

—তুমি আমার কতার জব দিবে না আয়াত ভাই?

চড়চড়িযে উঠেছিল আয়াত আলীর মোষেল রাগ।

—তুর শরম ভরম কি গাঙের পানিত ধুয়্যা ফেলিচু আমেনা?

—শরম? তোমার কাচে আবার কিসের শরম? যাক্ মন চায় তার কাচে কিসের শরম?

আমিনার মুখ দিয়ে কথাগুলো ক্ষোভের সঙ্গে বেরুচ্ছিল। আয়াত আলী নির্বিকার অন্য দিকে তাকিয়েছিল।

—জানি কুনো জব দিবে না।

আমিনা আঁচলে চোখ মুছে চলে গিয়েছিল। এখন ও দিব্যি আরেক-জনের সংসার করছে। আয়াত আলী পানিতে নামতে নামতে ভাবল, আসলে বেঁচে থাকার জন্য সব মানুষকেই জাল নিয়ে ঘুরতে হয়। সুযোগমত খাপ

মারতে না পারলে বাঁচার উৎসাহ অনেক থিতিয়ে আসে। যারা নিপুণ মাস্নুড়ে তারা অনবরত ঘাট থেকে ঘাটে ফিরতে পারে। জালে বেঁধে যত আবর্জনাই উঠুক তারা অনায়াসে তা ঝেড়ে ফেলে। ঐ ঝেড়ে ফেলার ক্ষমতাটাই বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

গোসল করে ঘরে ফিরতেই দেখল ছফদর বসে আছে পিঁড়ার ওপর। ওকে দেখে ভঙ্গীটা বিনীত করল। ঐ ভঙ্গীব কোন দরকার ছিল না। আয়াত আলী ভাবল। তবু মুখে কিছু বলল না। গামছা নিংড়ে রোদে দিতে থাকল। একটু বেশি সময় নিল আয়াত আলী। ছফদরকে উপেক্ষা করার জন্যে অকারণে ঘরে গেলো। বাইরে এলো। শূন্য হাঁড়ি উল্টেপাল্টে রাখলো। তবু ওর সঙ্গে কথা বলল না।

আয়াত আলী জানে ছফদর কি বলবে। আড়চোখে ওকে দেখল। ছফদরের মুখের ভঙ্গী ঠিক আগের মত। একটুও বদলায়নি। আয়াত আলী গলা কেশে জিজ্ঞেস করলো, তুর মা কেমুন আছে ছফদর?

—ভাল নাই।

—কিছু যোগাড় করতি পারচু?

—না।

—ও।

—আমি আপনের সাতে যাব ভাইজান।

—শালা।

আয়াত আলীর মুখে খিস্তি খেউড় ছোটে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকে পিঁড়া থেকে নামিয়ে দেয়।

—শালা দ্যাখ মায়ের জন্যি কিছু প্যাইস নাকি।

—তাঁই বুড়া মানুষ তার আর ব্যাইচা কি লাব?

ছফদর গজ্ গজ্ করতে করতে চলে যায়। ওর লকতিবকতি আয়াত আলীর মনে দাগ কাটে না। ওর মন এখন সগানগায় ভরা। আয়াত আলী জানে ছফদর চেষ্টা করলেও কিছু করতে পারবে না। উপোস করতে করতে ঐ বুড়ি মরবে। ছফদর এখন বুড়ি-মাকে ফেলে পালাতে চায়। উপোস করতে করতে ও নিজেই কাহিল হয়ে গেছে। ওর মনে এখন দয়ামায়া ফুটকি কাটে। ছফদর নদীর মত নির্বিকার।

সারাদিন আয়াত আলী শুয়ে শুয়ে ভাথুয়া সময় কাটাল। কিছুই ভাল

লাগে না। জীবনটা এখন ভাঙালিতে নৌকো রাখার মত বিপদ্‌জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন মুহূর্তে ঢেউ এসে পাড় ভেঙে দিতে পারে। তলিয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। এলোমেলো চিন্তার মাঝ দিয়েই ও মনস্থির করে ফেলে। কাল ভোরেই রওনা দেবে। বেলাবেলি শহরে পেঁৗছে যাবে। আর শহরে পেঁৗছতে পারলে এ যাত্রা বেঁচে যাবে ও। এখন সারা গ্রাম জুড়ে অদীপ সন্ধ্যা। কোথাও কোন আলো নেই।

সন্ধ্যার পর পর ছফদর এসে ওকে ডাকাডাকি করল।

—ভাইজান মা য্যান কেমুন করিচেচ?

আয়াত আলী হুড়মুড়িয়ে উঠতে গিয়েও পারল না। হাত পা কেমন সিঁটিয়ে যেতে চায়। মৃত্যু দেখতে পারে না ও। কৈশোরে বাবা মা দু'জনে একদিনে কলেরায় মারা যাবার পর থেকে ও কখনো কোন মৃত্যুর ছায়া মাড়ায় নি। পারতপক্ষে এড়িয়ে যায়। খবর দিয়েই ছফদর দৌড়ে চলে গেছে। আয়াত আলীর হাঁটু কাঁপে। তবু ও আস্তে আস্তে পিঁড়া থেকে নামে। ছফদরের ঘরের কাছে আসতেই শুনল ওর কান্না। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। আয়াত আলী আবার নিজ আঙ্গিনায় ফিরে আসে। মনে মনে ছফদরের জন্যে খুশি হয়। ও বন্ধন থেকে বাঁচল। শুধু তাই নয়। নিজের অক্ষমতার গ্লানি থেকেও বাঁচল। এ ধরনের ভাউকড়া চিন্তা ওকে আনন্দ দেয়। ওর নিজের জীবনেও কোন পিছুটান নেই। তবুও বাপের এই ভিটেটা এখন ওকে টানে। টানার জিনিসের অভাব নেই। মনের মধ্যে গেঁথে রাখলে অনবরত টানে। উঠোনে দাঁড়িয়ে ও দেখল আজ কোজাগর পূর্ণিমা। আশ্বিনের আকাশ ভরা নদীর মত আলোয় টইটুম্বুর। বাবা বেঁচে থাকতে এই আশ্বিন ছিল ওর জীবনে উৎসব। এ রাতে বাবা ওকে নিয়ে কত কি যে করত। নক্ষত্র দেখায় মেতে উঠত। মা রাত জেগে পিঠে বানাত। আজকের এই মুহূর্তে কোজাগর পূর্ণিমা মানে ছফদরের মা-র নিরূপায় মৃত্যু। জীবনের এই অনাবৃত দিকটারও একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। মনে সে ধরনের পূর্ণতা আনে যা বেদনার তীব্রতাকে প্রগাঢ় করে। তারপর আস্তে আস্তে শাদা ফকফকে তলানীটুকু ছেঁকে তোলে। আয়াত আলী মাঝ রাত পর্যন্ত উঠোনে পায়চারী করে। অনেকদূরে ভালুকা বাঁশের ঝাড়ের মাথায় রূপসী রাত যেন হোলি খেলে। আয়াত আলীর স্নায়ুতে কিসের যেন শব্দ বাজে। টুংটাং। টুংটাং। এক সময় ও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ভোর রাতের আঁধার মাথায় নিয়ে আয়াত আলী বেরিয়ে পড়ে। পিঠের

ওপর কাপড়ের পোটলা। মনে কোন দ্বিধা নেই। বেদনাও নেই। শুধু বিড়ি শেষ। যাত্রার মুখে বিড়ি নেই দেখে আযাত আলীর মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে। আঁধারে একটু ভয় লাগে। গা ছমছম করা ভয়। আড়চোখে ছফদরের ঘরের দিকে তাকাল। ঝাঁপ ফেলা। সারারাত জেগে মা-র দাফন করেছে। হয়তো কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে আছে এখন। ও একটু তাড়াতাড়ি পা চালায়। রোদ ওঠার আগে বড় রাস্তায় উঠতে হবে। নইলে বড় কষ্ট।

পরিচিত রাস্তা। তবু দুবার হোঁচট খায় আয়াত আলী। মনের মধ্যে শরপবন নেই। সরু রাস্তা। দু'ধারে কাঁটা বেতের ঝোপ। বার বার বেতসলতা গায়ে এসে পড়ে। পায়ের নিচে সামরা ঘাস। দূরে দূরে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুলা। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা ব্যথা ব্যথা করছে। একটু-ক্ষণ থেমে শিয়ালকাঁটা গাছের পাতা ঘঁসে দেয় আঙ্গুলের মাথায়। কি একটা পাখি যেন কট্‌কা শব্দে ডাকে। ও নামটা মনে করতে পারে না। মুহূর্তে আয়াত আলীর মনটা বিধুর হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গাল দেয়। শুস শালা আবার সেই পিছুটান। মনটা শক্ত করে দ্রুত হাঁটে। জাগতিক দুঃখবোধগুলো সব ভসকা লাগে। আয়াত আলী মেঠো পথে নামে। আঁধার তেমন সান্দ্র নয়। দূরের মাঠ কুয়াশার মত দেখা যায়। সব পানি নামেনি। জায়গায় জায়গায় গোলাকার বৃত্তের মত পানি জমে আছে। শাদা বকের ঝাঁক সে পানিতে গলা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আয়াত আলীর মনে হয় এখন আর ওর তেমন খারাপ লাগছে না। চলে যাওয়াটাই একমাত্র সত্য।

বড় সড়কে ওঠার মুখেই ছফদর দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ওর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। উত্তেজনায় হাঁপায়। ঠিকমত কথা বলতে পারে না।

—আমি আপনের সাতে যাব ভাইজান।

আয়াত আলী কথা বলেনা। পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। পারে না। ছফদর কাঁকড়ার মত ধরে আছে। ওর মনে হয় যে অজুহাতে ও ছফদরকে এড়িয়ে যাচ্ছিল সে অজুহাত এখন আর খাটবে না। মায়ের অভাবে ছফদরের বুকটা এখন লনঠনাঠন। ও কয়েকদিনের উপবাসী। দৌড়ে আসার দরুন স্বাভাবিক শ্বাস নিতে পারছে না। অথচ স্বাভাবিক শ্বাস ফেলাটা ওর জন্য এখন ভয়ানক জরুরী। ওর বয়স কম। জীবনের দেখা এখনো ঠিকমত শুরু হয়নি। এই বয়সে ও মরবে কেন? বয়সটা ওর টগবগে ঘোড়ার মত ছুটছে। আয়াত আলী ওর মাথার ওপর হাত রাখে।

বলতে চায়, চল ছফদর আমি তোকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিলাম। কিন্তু মুখ খুলতে পারে না। কেবল বলে, উটেক চল।

দু'জনে হাঁটিতে থাকে। বড় সড়কে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দিনের প্রথম রোদ ওদের পিঠ স্পর্শ করে। হাঁটিতে ছফদরের কষ্ট হয়। পা ভেঙে আসে। পেটে চিনচিনে ব্যথা। আয়াত আলী লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটে। এমনি-তেই ওর হাঁটার গতি বেশি। ছফদব হাঁপিয়ে ওঠে। কখনো বসে পড়ে। আয়াত আলী ওব জন্যে থামে। মাথাব ভেতরে মাগরা চিন্তা দাপাদাপি করে। নিজেকে বোঝায়, আসলে ও কাজ খুঁজতে যাচ্ছে। কাজ করে ভাত যোগাড় করবে। হাত পেতে নয়। ওর শরীরে এখনো অনেক শক্তি। তবুও একগুঁয়ে চিন্তাটা বেযাড়া হয়ে ওকে বিষণ্ন করে রাখে।

বিকেল নাগাদ ওরা শহরের কাছাকাছি পেঁৗছে যায়। আরো মাইল পাঁচেক বাকী। ছফদর আর পারে না। পাশ দিয়ে ট্রাক চলে যায় হুস করে। গাড়ি থেকে ড্রাইভার আধ-খাওয়া বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে রাস্তার ওপব। আয়াত আলী কুড়িয়ে নিয়ে জোরসে টানে। ছফদব রাস্তার পাশে পড়ে থাকা আধা শুক্‌নো এক টুকরো আখ নিয়ে চিবোয়। বেলা পড়ে আসছে। কেউ কারো মুখের দিকে চাইতে পারে না। কোথায় যেন মস্ত একটা অপরাধ হয়েছে। একসময় আয়াত আলীর বিড়ি ফুরিয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে মনে হোত শহরে পেঁৗছলেই বেঁচে যাবে। এখন মনে হচ্ছে একদম উল্টো। সেই অচেনা পরিবেশটা শুশুকের মত কালো পিঠ দেখিযে ভেসে রয়েছে। ওখানেও আয়াত আলীর জন্য কোন আশ্বাস নেই। ও অনুভব করে ছফদরের অতৃপ্ত জিভটা আখের গা থেকে রস খুঁজে পাচ্ছে না। ওর চোখে মুখে ভীষণ জেদ। পরক্ষণে ঐ টুকরোটা ছুঁড়ে মারে।

—ভাইজান একুন কি কোরবেন?

—তুই বুলেক।

—চলেন সাঁজের আগেই ঐ বাজারেত যাই। আত্তিরে কুনো দোকানের বারান্দাত শুয়্যা থাকপো। বিয়ানে উট্যা রনা করলে বেলা দুপুর নাগাদ পৈঁহচা যাব।

—চল।

দু'জনে আবার চলতে আরম্ভ করে। হাঁটিতে হাঁটিতে ছফদর পিছিয়ে পড়ে। দু'জনের সম্বিত চেতনায় কোন শব্দ নেই। আয়াত আলীব বুকের

ভেতর আফ্‌শা আকাশ। শুধু আবিলবিল যন্ত্রণা। কোথা থেকে যেন অগুমারি পিঁপড়ের ঝাঁক এসে স্নায়ু কামড়ে ধরে রেখেছে। আড়েপাথালে এগুবার উপায় নেই। পা যেন আর চলতে চায় না। মুহূর্তে আয়াত আলী দার্শনিক হয়ে যায়। ও কেন এভাবে বেঁচে থাকার জন্যে ছুটে যাচ্ছে? হাত পেতে বেঁচে থেকে কি লাভ? সন্ধ্যা থেকেই ও বাজারের এক দোকানের কোণায় চুপচাপ বসে থাকে।" ছফদর এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। আধ-খানেক পচা কলা নিয়ে আসে ওর জন্যে। আয়াত আলী খেতে পারে না। একবার এনে দেয় সিগারেটের টুকরো। বসে বসে তাই টানে। ওর হাঁটু কাঁপে ঠক্‌ঠক্ করে। বুকের ভেতর ভয় নেই। আশঙ্কা নেই। কিছু নেই। তবু হাঁটু কাঁপে। আয়াত আলীর কিছু ভাল লাগে না। ছফদর আবার বাজারের মধ্যে চলে গেচে। ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহের চেষ্টা করছে। লোকের কাছে হাত পাতচে। আয়াত আলীর পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। কিন্তু কিছুই খেতে পারছে না। পেটের নীচ থেকে বুকের দিকে ঘূর্ণির মত কি যেন পাক দিয়ে উঠে যায়। আবার নামে। আবার উঠে। ওর অস্বস্তি লাগে। দেয়ালের গায়ে মাথা হেলিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। একটুপর ছফদর আসে। হাতে শুকনো রুটি। রাত বেশ হয়েছে। বাজারের লোকজন কমতে শুরু করেছে।

—ভাইজান খাবেন?

ছফদর হাতের রুটিটা এগিয়ে দেয়।

—না খ্যাতে ভাল লাগছে না।

—আপনার খিদ্যা লাগচে ভাইজান?

ছফদর জোর দিয়ে বলে।

—না খাবো না।

—ক্যান খাবেন না? খাবার দুক্কেই তো আমরা বাড়ি ঘর ছ্যাড়া পলায়্যা আনু। ছফদরের নিষ্ঠুর সত্য কথায় আয়াত আলীর বুকটা ধক্ করে ওঠে। কথা বলতে পারে না। মনে হয় এজন্যেই ওর হাঁটু কাঁপছিল। আসলে ও একটা সত্য কথা লুকতে চাইছে। বাড়ি থেকে আসার সময় যে কথাটা খুব সহজ মনে হয়েছিল এখন মনে প্রাণে সে কথাটা অস্বীকার করতে চাইছে ও। কিছুতেই বিশ্বেস করতে ইচ্ছে হয় না যে শুধু খাওয়ার জন্যে ও গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আয়াত আলীর সামনে সুমসাম

অন্ধকার। বাজারে দু'একজন লোক ইতস্ততঃ ঘুরছে। ওর মনে হয় একটা লঞ্চ ভেঁপু দিতে দিতে জোয়ারের উল্টো দিকে যাচ্ছে। ও কিশোর বয়সের মত লঞ্চটা দেখার জন্যে প্রাণপণ দৌড়ুচ্ছে। সে দৌড়ে কেউ পারে না ওর সঙ্গে।

—আপনি না খ্যালে আমি খানু কিস্তক?

—খা।

ছফদর দু'তিন কামুড়ে রুটিটা শেষ করে ছেঁড়া কাঁথা টেনে নিয়ে গুটিশুটি ওর পাশে শুয়ে পড়ে। আয়াত আলী ভাবে ছফদরই ভাল। ওর সামনে একটাই সত্য। খেয়ে বাঁচতে হবে। কিন্তু এই খেয়ে বাঁচার সঙ্গে আয়াত আলীর মনে অনেক জিজ্ঞাসা। আসলে খাওয়াটা ওজন মাফিক হওয়া চাই। নিজের শক্তির কাছে নতজানু হয়ে খাওয়াটাই তো সত্যিকারের খাওয়া। হাত পেতে খাওয়াটা আয়াত আলীর পেটের মধ্যে বান্‌চিকি হয়ে লাফায়। ওতে স্বস্তির বদলে অস্বস্তি বাড়ে। কমজোরী দুর্বল মানুষের মত মাথাটা হাঁটুর দিকে নামতে থাকে। আয়াত আলী এ বোধের সঙ্গে কিছুতেই আপোষ করতে পারে না। ওর মতে সম্মান জিনিসটা আর যাই হোক পা'চাটা কুকুর নয়। যেখানে সেখানে লুটিয়ে পড়তে পারে না।

শহরে সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যায় দু'জনে। আয়াত আলী স্টেশনে একজনের মাল নামিয়ে দুটো টাকা পেয়েছে। তাই দিয়ে ভাত খেয়েছে দু'জনে। পেট ভরেনি কারো। ছফদর খুঁত খুঁত করেছে। উপরন্তু মোটা চাল দেখে হিয়ামুবা হয়েছে ওর মুখের পেশী।

—মুইরলা ধানের ভাত না আয়াত ভাই?

—'হু।

—ইস্ যদি বৌ সোহাগীর ভাত প্যাতাম? তাইলে গব্‌গব্ কর্‌যা খ্যায়া নিতাম।

আয়াত আলী মুখে কিছু বলে না। ছফদরের আশা দেখে মনে মনে হাসে। হিফ্‌রা বয় মনের কোণে। অজানা ভয় লাগে। সারাদিন যেখানে যা পেয়েছে তাই খেয়েছে ছফদর। কোনকিছু বাদ দেয়নি। আয়াত আলীর মানা শোনেনি। বরং কেমন রাক্ষুসে দৃষ্টি নিয়ে মেজাজ করেছে ওর সঙ্গে। ছফদরের হিমটাইলা ভাব আয়াত আলীকে ব্যথিত করেছে। রাতে স্টেশনে ঘুমোতে এসে নেতিয়ে পড়ে ছফদর। পেট চেপে চুপচাপ

শুয়ে থাকে। দু'একবার বমি করে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্বপ্ন দেখে আয়াত আলী। স্বপ্ন দেখে ফুলে ফেঁপে গর্জে ওঠা বর্ষার নদী ও অনায়াসে সাঁতরে পার হয়ে যাচ্ছে।

মাঝরাতে কঁকিয়ে ওঠে ছফঁদর। আর চুপচাপ থাকতে পারে না। অসহ্য ব্যথায় চীৎকার করে। আয়াত আলী কি করবে বুঝতে পাবে না। উজ্জ্বল স্বপ্ন থেকে ছিটকে পড়ে ও বিমূঢ় হয়ে যায়। এই অচেনা অজানা জায়গা বুকের মধ্যে ভয় হয়ে সেঁধিয়ে থাকে। লিঅরে-ডোবা রাত পার হয়ে যায়। তখনো ভোর হয়নি। আশেপাশের লোকগুলো হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। কেউ ছফদরেব চীৎকারে বিরক্তি প্রকাশ করে। কেউ পাশ ফিরে শোয়। আয়াত আলী মনে প্রাণে প্রার্থনা করে।

ছফদরেব কপালে হাত রেখে বসে থাকা নিষ্পলক আয়াত আলী নৌকোর ছেঁড়া পালের মত একগাদা অকেজো অনুভূতির মালিক হয়ে যায়। সে কপাল ক্রমাগত শীতল হয়। চোখের পাতা বুঁজে আসে।

তখন আয়াত আলী আর কোন ছফদরের শরীর দেখতে পায় না। দেখতে পায় এক ডোঙ্গা মধুমাধব ধান। ছোটবলায় মা যেমন ডোঙ্গায় করে ধান সেদ্ধ করত ও আজ তেমন এক ডোঙ্গা ধানের তলে আগুন দিয়েছে ধান সেদ্ধ হলে চমৎকার কড়কড়ে চাল হবে ছফদর।

আলো হাওয়ার রাজ্যে

সুব্রত বড়ুয়া

এই রকম একা দাঁড়িয়ে থাকতে তার খুব খারাপ লাগে।

সে দাঁড়িয়েছিলো একা। কাছে-পিঠে আরো কিছু মানুষ আছে। মানুষ-মানুষী। তারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, যেন অফুরন্ত কথা আছে তাদের মনের গোপন মণিকোঠায়। তাদের অনুচ্চ কন্ঠ, হাসি, অস্পষ্ট অনুভূতি-ব্যঞ্জক শব্দ তার সারা অবয়বে এসে আঘাত করে। সে একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। একবার পা বদলে নেয়। মাথার ওপরকার ঈষৎ নীলাভ আকাশ দেখে সে, পড়ন্ত বিকেলের বৃক্ষ ও হাওয়া তাকে স্পর্শ করে, একবার সে হাই তোলে, একবার ভাবে একটা সিগারেট ধরাবে, তারপর আবার কি মনে করে চুপসে যায়। একবার চিন্তা করে যে কোন একটা ভাবনায় নিজেকে সমর্পণ করার কথা, তারপর আবার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। মনে পড়ে, একা বাসায় ছুটির দিনের সারা দুপুর কেটেছে তার এক রকম উৎকন্ঠা ও যন্ত্রণায়, অকারণ। সকালে চা-নাস্তা সেরে খুব ভালো করে শেভ করেছে, সারা বিকেল থেকে লণ্ড্রীর আঁশটে গন্ধ লাগা জামা-কাপড় বের করে রেখেছে বেরুবে বলে। এই রকম বিকেলে ভাঁজ-ভাঙ্গা জামাকাপড় পরে প্রায় নির্জন রাস্তায় হাঁটতে তার খুব ভালো লাগে। মনে পড়ে, ছাত্রা-বস্থায় দুটো শখ ছিল তার—দামী বিদেশী সিগারেট খাওয়া, আর দামী টিকেটের সিটে বসে সিনেমা দেখা। হাস্যকর ব্যাপার আর কি!

দুপুরে ঘুমোয়নি। অফিসের ক্লাব থেকে ধারে আনা মনোমুগ্ধকর উপন্যাসখানা নিয়ে বিছানায় শুয়েছিলো। কদ্দূর এগোতেই খুব ক্লান্তি আসতেই বইটা অই শুয়ে থাকা অবস্থায়ই ছুঁড়ে দিয়েছিলো কোণার টেবিলে। পড়া যায় না। এক সময়, কিশোর ও তরুণ বয়সে, এমনই উপন্যাস গোগ্রাসে গিলতে পারতো সে, অনায়াসে। তারপর বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিলো সে। ঘুম আসেনি। সিগারেট ধরিয়েছিলো।

এখন আবার একটা সিগারেট ধরালো সে। প্যাকেটটা বের করে খুব ঠাসা তামাকভরা একটা সিগারেট বেছে নিয়েছিলো সে। দেশলাই জ্বালানোর আগে আর একবার দেখে নিয়েছিলো আশেপাশে পরিচিত কাউকে দেখা যায় কিনা। না, নেই। তারপর কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখেছিলো— আরো প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট বাকী, নির্ধারিত সময়ের। খোলা চত্বরটায় লোকের ভিড় বেড়েছে আরো, অথচ এমন দুর্ভাগ্য তার নিজের কোন চেনা লোক নেই।

তার চারপাশে মানুষ। তরুণ-তরুণীই বেশী। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও যৌবনের দীপ্তিতে ঝলমলে সব মানুষ। ঠিক এই রকম জীবন দেখতে তার ভালো লাগে। উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত জীবন আর কি। তার নিজের যৌবন এখনো অপগত হয়নি। যদিও পাঁচ বছর আগে তিরিশের কোঠা অতিক্রমের পূর্বেই সে নিজে এই রকম ধীর স্থির ও ঠাণ্ডা মানুষ হয়ে পড়েছিলো। ঠাণ্ডা মানুষ। -কথাটা ভাবতেই তার নিজের মনে একটু হাসি আসে বৈকি। নিজের অফিসে এই রকম ঠাণ্ডা শান্ত মেজাজের মানুষ হিসেবে তার বিশেষ রকম একটা খ্যাতি আছে বৈকি। আসলে সে জানে সব রকম ঝামেলা এড়িয়ে চলতেই ভালোবাসে সে—শান্ত নিরুপদ্রব জীবন চায় সে। এ কারণেই তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা সীমিত, কিংবা, বলা যায়, বন্ধু-বান্ধবের তথাকথিত উষ্ণ সাহচর্য সম্পর্কে তার নিজের তেমন কোন বিশেষ আগ্রহ নেই।

একবার প্রেমে পড়েছিলো সে, শুধু একবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-পাঠিনী ছিল মেয়েটি—ভীষণ রকম শান্ত এবং অনাকর্ষণীয়। তবু সে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছিলো মেয়েটিকে, যদিও কোনদিন কোনভাবেই নিজের মনের এই কথাটি মেয়েটির কাছে উচ্চারণ করতে পারেনি। অতএব তার সমাপ্তি হয়েছিলো এভাবেই সে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের পর এই তেরো বছরে দ্বিতীয়বার আর তার সাথে দেখা হয়নি। হ্যাঁ, এই হচ্ছে মানুষের জীবন। অথচ যদি অন্য রকম হতো, তাহলে কি তার নিজের জীবনের সবকিছু বদলে যেতো অন্য কোনো পরিসরে? হয়তো হতো, হয়তো বা হতোই না। কি আর আসে যায় আজ এসব কথা ভেবে। তবু কি মনের মধ্যে কখনো ভেসে ওঠে না সূক্ষ্ম কোন ব্যথার ঝলক?

কোণার দিকে একটু স্বতন্ত্রভাবে একা দাঁড়িয়েছিলো সে। তার চারপাশে জীবন ও যৌবনের উজ্জ্বল সমারোহ দেখছিলো সে। লোকের ভিড় বাড়ছে।

খোলা চত্বরে মঞ্চের সামনে বসে যাচ্ছে লোকজন। বাড়ছে গুঞ্জনধ্বনি। উদ্যোক্তাদের ব্যস্তসমস্ত ছোটাছুটি ভাব, সুবিধে মতো জায়গা খোঁজার জন্যে লোকজনের উৎকন্ঠাময় পদচারণা—এসব দেখতে ভালোই লাগছে তার এখন। সারা চত্বরে জ্বলে উঠেছে জোড়ালো বাতি। এতক্ষণে খেয়াল হলো তার বাইরে সন্ধ্যা নামছে। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা থামের কাছে কোণার দিকে একটি নির্ঝন্‌ঝাট জায়গা বেছে নিলো সে। বসে পড়তেই মনে হলো —এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পা দুটো টন টন করছে তার।

এইসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আছে।—যার তেমন একটা ব্যত্যয় ঘটে না এমন কোথাও। তরুণী ও মধ্যবয়স্কা মহিলাদের প্রাধান্যই থাকে মোটামুটি এখানে। তাঁরা অবশ্যই সুন্দরী। অন্ততঃ নিজেদের সযত্ন রচিত সৌন্দর্যের সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণে তাঁদের স্থির ও সাবধানী ভঙ্গী দেখে তাইতো মনে হওয়ার কথা। এসব দেখতে অন্যরকম একটা মজা লাগে তার। বলা যায়, এটা তার এক ধরনের বিকার। বাইরের শান্ত গোবেচারা ঠাণ্ডা নিরীহ মানুষটির মনের মধ্যে যে এই রকম এক তির্যক মনোভঙ্গী লুকিয়ে রয়েছে—এ কথা কি বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে? কথাটা ভাবতেই মনে মনে হাসি পেলো তার।

এই তার এক স্বভাব। নিজের সমস্ত কিছু নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করাই তার এক ধরনের কাজ। সে, তখন, চুপ করে চত্বরের লোকজন, মানুষের আনাগোনা ও শূন্য মঞ্চের নীরব উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলো। অনেক মানুষের মাঝে বসে আছে সে। অথচ একা। মানুষের এই রকম একাকীত্বের কথা ভাবতে গেলে মনে হয় তার—এই-ই হচ্ছে মানুষের আসল পরিচয়। সমস্ত রকম তথাকথিত কম্যুনিকেশন আসলে মানুষের মনের কথা কখনো প্রকাশ করতে পারে না, কখনো না। কম্যুনিকেশন হচ্ছে মানুষের এক ধরনের স্বভাব। এবং অবশ্যই পারফেক্ট নয়। সে, তার নিজের মনের মধ্যে, এইসব মানবিক সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে চিন্তা করে। শুধু চিন্তা। কাউকে বলার বা প্রকাশ করার ভাবনাই তার মনে আসে না কখনো।

হঠাৎ এই সময়ে সে লক্ষ্য করে তার একটু সামনেই একটি মেয়ে—হুবহু যেন তার সেই সহপাঠিনী—গ্রিবার অংশটুকু ঠিক সেই রকম—মেয়েটি পাশের সঙ্গিনীর সাথে কি কথা বলার জন্যে ঘাড় ফেরাতেই সে হতাশ হয়। ঠিক

সেই রকম, কিন্তু সে নয়। আ! তখন তার মনে সেই পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে।

কলেজে পড়তেই কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প লিখে একরকম নাম করেছিলো সে, যদিও পরে তার সেই দুর্বল গল্পটি সম্পর্কে তেমন কোন মোহ আর তেমন অবশিষ্ট ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মাঝে মধ্যে দু'একটা গল্প লিখেছিলো সে। আর তখন প্রায় সবগুলো গল্পেই সে তার নায়িকার রূপ ও গুণের বর্ণনায় তার সেই সহপাঠিনীর যাবতীয় কিছু আরোপ করেছিলো একাগ্রতার সাথে। কেউ কেউ প্রশংসা করেছিলো তার গল্পের। কিন্তু তার ভালো লাগেনি।

আর চাকরি শুরু করার পর, যদিও দু'একবার সে নিজেও তার সেই অভ্যেসটি অব্যাহত রাখার কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু আসলে বাস্তবে কিছুই আর করা হয়নি। এক রকমের নির্লিপ্ততা ক্রমেই তাকে আচ্ছন্ন করে, মানবিক সম্পর্ক ক্রমেই তার কাছে শিথিল থেকে শিথিলতর হয়ে উঠেছে।

ব্যাপারটা তাহলে কি? সে কি নিজে নিজেরই মুদ্রাদোষে আলাদা হয়ে যাচ্ছে আর সবার কাছ থেকে। নিজের সকল বোধ ও আচরণের চুল-চেরা বিচার-বিশ্লেষণ করেছে সে মনে মনে।

তখন এক এক করে চত্বরের বাতি নিভতে থাকে। মঞ্চের রঙিন ও উজ্জ্বল আলো ফুটে ওঠে চোখের সামনে। সে জানে—এখন থেকে এক কি দেড় ঘন্টা শুধু সঙ্গীত, সঙ্গীত আর সঙ্গীত। চত্বরে অপেক্ষমান লোকজনের গুঞ্জনধ্বনি ক্রমশঃ থেমে যায়। এক রকম উষ্ণ মনোযোগ এসে যেন ঘিরে দাঁড়ায় মঞ্চটিকে।

মঞ্চের মানুষজনকে তার চিত্রার্পিত পুতুলের মতো মনে হয়। তাদের বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল ঝলমলে পোশাকে তীক্ষ্ণ উদ্ভাসিত আলো প্রতিফলিত হয়ে ফের ফিরে আসে তার চোখে। তাদের চোখ-মুখ ও সারা অঙ্গে এক ধরনের নিবেদনময়তা খেলা করে বেড়ায় জলজ ছায়ার মতো, চোখের নীচে জ্বলে ওঠে এক রকম আলোর ঔজ্জ্বল্য। তখন ক্রমশঃ মৃদু এক সঙ্গীত জেগে ওঠে পরম নিস্তব্ধতার মধ্যে, বিলম্বিত লয়ের দীর্ঘ তানের শব্দধৃত ধ্বনিপুঞ্জ যেন ধীরে ধীরে পদ্মকোরকের মতো উন্মীলিত হতে থাকে তার

হৃদয়ের দৃষ্টির সামনে। একেকটি মানবী যেন একেকটি কিন্নরী হয়ে যায় তার চোখে। আর তারপর ক্রমশঃ মানবিক ধ্বনি উচ্চারিত হয় কন্ঠে, কন্ঠের অন্তর্গত স্বরলহরী মূর্ছিত হতে থাকে—সারা চত্বরে! সে তখন আবার একা হয়ে যায়। এই সঙ্গীত তাকে আর্ত বিষাদময় করে তোলে। আঃ! সঙ্গীত।

সে,—একজন মানুষ, তার একটি জীবন। বোধোদয় থেকেই সে ক্রমাগত শুনে আসছে শুভবোধের কথা, শুভ চৈতন্যের কথা। অথচ তার চারপাশের মানুষের মাঝে সে একরকম নির্মম আত্মসর্বস্ব স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করে না। আর এভাবে অঙ্কুরিত হতে হতে সে ক্রমশঃ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে তার নিজের মধ্যে। এখন সঙ্গীত তাকে ক্রমশঃ আত্মগত করে তোলে, তার চারপাশের সকল কালিমা ও বিরুদ্ধ চেতনার মধ্যে থেকে যেন হাত ধরে তুলে নিয়ে যায় তাকে। এই মুহূর্তে তার আপন মহানুভবতায় সবাইকে ক্ষমা করতে পারে সে, সব অপরাধ।

তার প্রার্থিত সঙ্গীতের মধ্যে সে এই রকম আনন্দ খুঁজে বেড়ায়। অথচ হায়, তার রেশ অন্তর্হিত হওয়ার পূর্বেই চারপাশের মানুষজন তাদের আপন অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দেয় সুকৌশলে। কোন প্রিয়দর্শিনীর চঞ্চল হাসির শব্দের সাথে খণ্ডিত হয়ে যায় জীবন। তার পেছনে বসে একজন সশব্দে হাই তুলে, ঠাণ্ডা কঠিন মেঝের ওপর জুতোর ঘষা শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। এই হচ্ছে জীবন।

তবু, তার চারপাশের সকল ক্লেদ ও কালিমার কথা ভুলে যায় সে। দুই হাতের আঙুলে সযত্নে তুলে ধরে খণ্ডিত আবেগ. তার দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার খেলা করে তার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয় নির্বোধময়তা, তার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ পৃথক সত্তার বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে যেন একক সত্তায় কেন্দ্রীভূত হয়।

তখন সে, নিজের অজান্তে, প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো তার সিগারেট বের করে দেশলাই-এর কাঠি ঘষে আগুন জ্বালায়। সে বুঝতে পারে তার প্রার্থিত সঙ্গীতের পরম মাধুর্য নেই কোথাও। তার চারপাশের মানুষজনের চাঞ্চল্য তাকে অস্থির করে।

তবু সে বসে থাকে নির্বোধ নিরাসক্ত মানুষের মতো। তার মনে পড়ে— সে ছিলো ভীষণ একা। একাকী সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে—প্রতীক্ষা

করেছে এই মুহূর্তটির। এখন, এই মুহূর্তে ফিরে যেতে পারে না সে। তার সমস্ত দিন, সমস্ত সকাল, সমস্ত বিকেল, সমস্ত দুপুর সে নির্মাণ করেছে একটি আনন্দের জন্যে।

সে বেরিয়েছিলো সেই আনন্দেরই খোঁজে। এখন, এই মুহূর্তে সে তবে কোথায় পালাবে!

আমাদের তাহলে তুমি আরো সুস্থির করো প্রভু! আমাদের চাঞ্চল্যকে দমন করো। আমাদের প্রত্যাশাকে সীমিত করো। তোমার সকল সীমিতির মাঝে আমাদের সমস্ত সীমাহীনতাকে স্তব্ধ করো।

মনে হয় যেন এই প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে থাকে সে তার স্বপ্নময়তার অন্তরালে॥

জনৈক প্রতারকের কাহিনী

শাহরিয়ার কবির

ক.

তিনি ট্রেনের জানালায় চোখ রেখে দেখলেন, শেষ বিকেলের সূর্য অনেক দূরে দিগন্তের প্রান্তসীমার কাছে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আছে। ডিসেম্বরের এই সময়ে সূর্যের তেজ এমনিতেই থাকে না। ন্যাড়া ধানক্ষেতে কুয়াশার চাদর ভাঁজে ভাঁজে জমতে শুরু করেছে। কাপড়ের ঝোলা ব্যাগটার ভেতর থেকে তিনি সাদা খদ্দরের চাদরটা বের করে গায়ে জড়ালেন। কাঁচের জানালা নামানো থাকলেও তাঁর বেশ শীত লাগছিলো।

অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিনি আত্মচিন্তায় মগ্ন ছিলেন। ইদানীং পরিশ্রম তিনি একেবারে সহ্য করতে পারেন না। পাঁচ মাস আগে জেল থেকে বেরিয়েছেন। দেড় বছর পর মুক্ত পৃথিবীতে এসে প্রথমেই উপলব্ধি করেছিলেন তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। অথচ বায়ান্নো বছরে তাঁর এভাবে বুড়িয়ে যাওয়ার কথা ছিলো না। তাঁর চেয়ে বারো বছরের বড়ো কমলদার স্বাস্থ্য দেখে তিনি ঈর্ষাবোধ করেছেন। এখনো কমলদা রীতিমতো আসন করেন। তিরিশের যুগে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে থাকতে সময় এ অভ্যাসটি তিনি রপ্ত করেছিলেন। কমলদা তাঁকে দেখে বলেছিলেন, কি হে একেবারে বুড়োই হয়ে গেলে? জেলে জামাই-আদরে ছিলে না জানি। কিন্তু এ কি হাল হয়েছে তোমার?

দেড় বছর আগে তিনি ক্ষমতাসীন মুজিব সরকারকে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে উৎখাত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর গ্রেফতার দেশের বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। কারণ তিনি তখন একটি গ্রুপের নেতা ছিলেন। 'কমরেড হাসানুজ্জামান কোথায়?' 'মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড হাসানুজ্জামানের মুক্তি চাই'—এ ধরনের কিছু গোপন প্রচারপত্র জেলে থাকতেই তাঁর কাছে এসেছিলো।

ময়মনসিংহ জেলের বুড়ো বিহারী পুলিশটা তাঁকে এসব কাগজপত্র এনে দিতো। কখনো তাঁর চিঠি নিয়ে যেতো বাইরে।

জেলে তাঁকে জামাই-আদরে না রাখলেও অন্যদের মতো শারীরিক বা অন্য কোন ধরনের নির্যাতন তাঁর উপর করা হয়নি। তাঁরা ধারণা ধরা পড়ার পর তিনি স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের ডি.আই.জি'র কাছে যে বাহাত্তর পৃষ্ঠার জবানবন্দী দিয়েছিলেন সেটাই তাঁকে এই ধরনের নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছে। গোঁয়ার্তুমি করে জবানবন্দী দেয়নি বলে হায়দারকে ওরা কি নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, সেই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী তিনি।

তিনি জেল থেকে বেরিয়ে দেখলেন তাঁর এই জবানবন্দী তাঁদের দলের ভেতর প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। দলের নতুন সম্পাদক মইনুদ্দিন তাঁকে সরাসরি এই বলে অভিযুক্ত করে বসলো, তিনি নাকি বহু কর্মীকে ধরিয়ে দিয়েছেন। মইনুদ্দিন তাঁকে কোনদিন এ ধরনের কথা বলতে পারবে এটা তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেননি। তাঁর প্রায় ছেলের বয়সী এই মইনুদ্দীনকে তিনিই পার্টিতে এনেছিলেন। মার্কসবাদের প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও তখন ওর ছিলো না। প্রচণ্ড সাহসী আর লড়াকু ছিলো বলেই ছেলেটাকে তিনি বিশেষ যত্ন নিয়ে গড়েছিলেন। মইনুদ্দিনের এ ধরনের ব্যবহার তাঁকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছে। তিনি উত্তেজিত না হয়ে শান্ত গলায় ওকে তখন বুঝিয়েছিলেন, দেখ কমরেড, তোমরা নিশ্চয়ই সঠিক জানো না আমি জবানবন্দীতে কি বলেছি। কয়েকজনের নাম আমি ঠিকই বলেছি, কিন্তু তারা কারা? তারা কি একটি পার্টি এলিমেন্ট ছিলো না? পার্টির ভেতর চারু মজুমদারপন্থী কয়েকজনের নামই আমি বলেছি। ওদের নাম বলেছি এজন্যে যে তোমাদের নাম আমি বলতে চাইনি। কিছু নামতো আমায় বলতেই হতো। আমি এতো বড়ো একটা দলের নেতা অথচ আমি কারো নাম জানি না একথা বললে এস. বি.র লোকেরা শুনবে কেন? আর এ কৌশলের জন্যেই আমি বেঁচে আছি, তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পেরেছি। বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কোন কথা আমি জবানবন্দীতে বলিনি। যদি কোনদিন তোমরা ক্ষমতায় যাও তখন এস. বি.র ফাইল খুললেই ওটা দেখতে পাবে।

মইনুদ্দিনকে তিনি অনেক বলেও বোঝাতে পারেননি শুধু নীতি দিয়েই বিপ্লব হয় না, বিপ্লবের জন্য কৌশলেরও প্রয়োজন। এরা দ্বন্দ্বটা বোঝে

না বলেই এতো যান্ত্রিক কথা বলে। মইনুদ্দিনের কথাবার্তা তাঁর কাছে অত্যন্ত যান্ত্রিক আর আমলাতান্ত্রিক মনে হয়েছে। মইনুদ্দিন তাঁকে আমলাতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য নিয়ে বলেছে, বিপ্লবের কি ক্ষতি আপনি করেছেন সেটা জেলে বসে উপলব্ধি করা আপনার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আপনার জন্য আমাদের তিনটা জেলায় চরম ক্ষতি হয়েছে। পার্টি যদি করতে চান তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আপনাকে লিখিতভাবে রিপোর্ট করতে হবে, ধরা পড়ার পর থেকে আপনি কি কি করেছেন, আর কিভাবে ছাড়া পেলেন। আপনার সম্পর্কে কেডারদের অনেক প্রশ্ন আছে। এখনো আমাদের হাজার হাজার কর্মী জেলে। ইউসুফ ভাই আর জাবেদ ভাইর মতো নেতারাও জেলে। সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতা না হলে আপনি বেরুতে পারেন না।

তাঁর বিরুদ্ধে এই সমস্ত অর্বাচীন উক্তির জবাব দেয়াটা তিনি বাহুল্য মনে করেছেন। মইনুদ্দিনের চালবাজী ধরতে পারবেন না এমন নাবালক তিনি নন। এখনো এই দলকে সাধারণ মানুষ তাঁর নামেই চেনে। তিনি এলে মইনুদ্দিনের নেতৃত্ব হাত ছাড়া হয়ে যাবে এটা সে বুঝতে পেরেছে বলেই তাঁর বিরুদ্ধে কেডারদের উত্তেজিত করছে। বিশ বছর ধরে তিনি রাজনীতি করছেন। অনেক ঝড়-ঝাপটা তাঁর উপর দিয়ে গেছে। মইনুদ্দিনকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি সরাসরি কমলেন্দু সরকারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

কমলদা সব কথা শুনে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে নাকে এক টিপ নস্যি গুঁজে বাঁ চোখ টিপে মৃদু হেসেছিলেন। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, মইনুদ্দিনকে তুমি এতো গুরুত্ব দিচ্ছো কেন? ও কি আর এমনি তোমাকে এসব কথা বলেছে। ওকে তো নাচাচ্ছে আলমগীর খান। আমাদের পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর তুমি যেই জেলে গেলে তক্ষুণি মইনুদ্দিনের ঘাড়ে চেপে তোমার পার্টিতে দিব্যি জেঁকে বসেছে, আর কিছু বুদ্ধিজীবী জুটিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যা তা লিখে বেড়াচ্ছে। এমনিতে কর্মী বলতে কেউ আছে নাকি ওদের! আমরা যেভাবে এগুচ্ছি, যেভাবে আমাদের সংগঠনের বিকাশ হচ্ছে, দেখ না ক'দিন পরে ওই মইনুদ্দিন আর আলমগীর খান খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে। তুমি কিস্যু ভেবো না। আমরা আগের মতো একসঙ্গে কাজ শুরু করলে কেউ আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

সাত বছর আগে তিনি আর কমলদারা একই দলে ছিলেন। এখন তাঁর কাছে মনে হয় কি তুচ্ছ কারণেই না তিনি ইউসুফের পাল্লায় পড়ে কমলদার বিরোধিতা করে দল ভেঙেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর কঠোর আত্মসমালোচনা রয়েছে। কমলদার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি বুঝতে পেরেছেন বিপ্লবী লাইন সঠিক প্রয়োগের অভাবেই এতদিন দেশে বিপ্লব হয়নি। কমলদা নিজেও ব্যক্তিগতভাবে কিছু ভুলের কথা স্বীকার করেছেন। ভুল-ভ্রান্তি যে স্বীকার করে না সে তো কমিউনিস্টই নয়। কমল-দাদের অভিজ্ঞতার দাম আছে।

একবার পার্টি ভেঙে আরেকবার চারু মজুমদারের লাইন নিয়ে কাজ করে তিনি অনেক ভুল করেছেন। উপযুক্ত নেতৃত্বও তিনি তৈরী করতে পারেননি। অতীতের কথা ভাবতে গেলে ভুলের পাহাড়ের নীচে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তিনি তো বিপ্লব করার জন্যই পার্টিতে এসেছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় তিনি একা কেন এতো ভুলের জন্য দায়ী হবেন? কমলদা ঠিকই বলেন, ভেড়ার পাল নিয়ে বিপ্লব করা যায় না। বিপ্লব করার জন্য পোড় খাওয়া বিপ্লবী কেডারবাহিনী প্রয়োজন। কমলদার মতো ত্যাগী সংগ্রামী নেতা ক'জন আছেন দেশে। বৃটিশ আমলে কমলদা বহু বছর আন্দামানে কাটিয়েছেন। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি। এই কমলদার বিরুদ্ধে পার্টি ভাঙার পর কত কিছুই না বলেছিলেন। সে সব কথা ভাবতে গেলে নিজের উপর আরো ঘেন্না ধরে। অথচ কমলদা কিছুই মনে রাখেননি। কমলদা যদি তাঁদের পার্টিতে তাঁকে যোগ দিতে না বলতেন তাহলে যে তাঁর কি অবস্থা হতো ভাবলেই তিনি শিউরে ওঠেন। মইনুদ্দিনকে চিনতে তাঁর বাকী নেই। চারু মজুমদারের লাইন যখন পার্টিতে ছিলো তখন ভয়ঙ্কর ছেলে ছিলো সে। এক রাতে দশটা শ্রেণী শত্রু খতম করেও ক্লান্ত হতো না। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর জেল থেকে বেরুনোকে মইনুদ্দিন একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁকে খতম করতে সে এতটুকু ইতস্ততঃ করবে না।

মইনুদ্দিনদের রাজনীতিও যে ভুল, এ বিষয়ে তিনি কমলদার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। জাতীয় সংগ্রাম আর গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে গুলিয়ে ফেলে ওরা শ্রেণী সংগ্রামকে প্রাধান্য দিয়েছে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যা হয়। এখন পর্যন্ত চারু মজুমদারের ভূত ওদের ঘাড় থেকে নামেনি। কাগজে

যতোই চারু মজুমদারের বিরুদ্ধে লিখুক, আর রুশ-ভারত বিরোধিতার কথা বলুক আসলে ওরা জাতীয় সংগ্রামের নামে গৃহযুদ্ধ বাঁধাতে চাইছে। দেশের এই পরিস্থিতিতে যখন জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সবচেয়ে বেশী জরুরী তখন ওরা কৃষক আর মজুরদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইছে। আলমগীর খান এক পয়লা নম্বরের সি আই এ'র এজেন্ট—সেই এখন ওদের তাত্ত্বিক হয়েছে। গতকাল সিরাজগঞ্জে মজুরদের এক সভায় তিনি খোলাখুলিই ওদের এক্সপোজ করেছেন।

সিরাজগঞ্জে মইনুদ্দিনদের কিছু কাজ আছে একথা আসার আগে কমলদা বলে দিয়েছিলেন। তিনিও তৈরী হয়ে এসেছিলেন। ঘরোয়া মিটিং হলেও শ পাঁচেকের মতো মজুর এসেছিলো। মজুরদের মধ্যে এখনো তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মিটিং-এ মজুরদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। সরকারের মৃদু সমালোচনাও করেছিলেন। জাতীয় কনভেনশন আর কোয়ালিশন গভর্মেন্ট সম্পর্কে কমলদার লেখা একটা আর্টিকেল তিনি জেলে থাকতে পড়েছিলেন। লেখাটা তাঁর খুব ভালো লেগেছিলো। মইনুদ্দিনকে ওটার কথা বলতেই ও যান্ত্রিকভাবে শ্রেণী সহযোগিতার লাইন বলে সমালোচনা করেছে। ওর তত্ত্বগত মান যে এতটা কমে গেছে এটা তিনি ধারণা করতে পারেননি। যুক্তফ্রন্ট ছাড়া বিপ্লবে কিভাবে জয়লাভ করা সম্ভব এটা তাঁরা বোধগম্য হয়নি। মইনুদ্দিনকে তিনি শুধু চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

গতকাল সিরাজগঞ্জের মিটিং-এ মইনুদ্দিনদের কিছু লোক গণ্ডগোল করার চেষ্টা করেছিলো। তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার পর পরই একটা বেয়াদপ ছোকরা দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলো, সবইতো বুঝলাম। কিন্তুক আমাদের মজুরীর কি হবি ভাই ? আপনি দি মজুরীর কথা কিছু কলেন না। ইদিকে যে আমাগের দ্যালে পিট ঠেকিছে। প্যাটে পাথর বেইন্ধে ক্যামনে রুশ-ভারতরে ঠ্যাকাপো !

তিনি মৃদু হেসে শান্তভাবে বুঝিয়েছেন এক একটা দাবী উত্থাপনের এক একটা সময় আছে। সব সময় প্রধান দাবীটা আগে তুলতে হয় ; নইলে ওটা পাওয়া যায় না। মজুরীর দাবীটা খুবই ন্যায্য তবে ওটা এখন প্রধান দাবী নয়। দেশ ও জাতি যে কি গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত অনেক ঘটনার উদাহরণ দিয়ে তিনি ওদের বুঝিয়েছেন। সবশেষে এটাও বলেছেন, সরকার একটা

ওয়েজ বোর্ড করেছে। দেখা যাক না ওরা কি বলে। ওয়েজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে নিশ্চয়ই মজুরী বৃদ্ধির দাবী জানাতে হবে। মিটিং-এ তিনি কখনো ধৈর্য হারান না। তিনি জানেন দেশের মজুরদের শতকরা এক ভাগেরও অক্ষরজ্ঞান নেই। সস্তা ট্রেড ইউনিয়ন মার্কা শ্লোগান দিয়ে ওদের উত্তেজিত করা খুব সহজ। মইনুদ্দিনরা তাই করছে। মজুরদের তারা সর্বহারা শ্রেণীর রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে সস্তা শ্লোগানে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। গতকাল মজুরদের দুটো মিটিং-এ সব কথা বোঝাতে গিয়ে তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। ট্রেনের কামরায় বসে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে তিনি খুব ক্লান্ত বোধ করছিলেন।

খ.

অনেকক্ষণ সায়াহ্নের ম্লান সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকার পর নিজের জীবনের সঙ্গে তিনি সূর্যের একটা উপমা খুঁজে পেলেন। অনেক আগে কলেজে থাকতে তাঁর কবিতা লেখার অভ্যাস ছিলো। জেলে বসেও কিছু কবিতা লিখেছিলেন। কবিতা লিখতে গিয়ে যখন ভাবেন লেনিন, স্টালিন মাও, হো চিমিন সবাই কবিতা লিখেছেন, তখন রীতিমতো রোমাঞ্চিত হন। এডওয়ার্ড কলেজে পড়ার সময় শাহানাকে নিয়ে অনেকগুলো কবিতা লিখে-ছিলেন তিনি। কিছু কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিলো। বাকীগুলো চামড়া-বাঁধানো ডাইরীতে লেখা ছিলো। একাত্তরে পাঞ্জাবীরা সব লুট করে নিয়ে গেছে।

ছাত্রজীবনে এবং পার্টি জীবনের প্রথম দিকের অনেক স্মৃতির শাহানা এখন উল্লাপাড়ার এক গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। গত দশ বৎসর শাহানার সঙ্গে তাঁর দেখা নেই। মাঝে-মধ্যে চিঠি লিখেছেন। জেলে যাওয়ার কয়েক মাস আগেও দলের এক মহিলা কর্মীকে চিঠি দিয়ে শাহানা রহমানের কাছে পাঠিয়েছিলেন। চিঠির ভাষা অনেকটা এরকম ছিলো—কমরেড শানু, বিপ্লবী অভিনন্দন জেনো। আমাদের একজন মহিলা কমরেডের চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতে হবে তোমাকে। আশা করি ওকে ফিরিয়ে দেবে না।—ইত্যাদি। শাহানাকে তিনি এখনো শানু বলে সম্বোধন করার সময় কলেজের সেই উদ্দাম দিনগুলোতে ফিরে যান। বায়ান্নো সালের ভাষা আন্দোলনের দিনগুলোকে তখন মনে হয় অল্প কিছুদিন আগের কথা।

শাহানা তাঁর কোন অনুরোধ কখনো প্রত্যাখ্যান করেনি। তাঁর বিশ্বাস এবারও শাহানা তাকে ফিরিয়ে দেবে না। এক সময় কি ছেলেমানুষীই না তিনি করেছিলেন শাহানার সঙ্গে। সেই বাষট্টি সালের কথা। তিনি তখন পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক। শাহানাকে তিনি বিয়ে করবেন এ নিয়ে সেই সময় পার্টিতে অনেক আলোচনা হয়েছে। কমলদা যখন তাঁকে একদিন প্রশ্ন করলেন, তুমি কি শাহানাকে বিয়ে করবে? তখন তিনি মাথা নেড়ে অস্বীকার করেছিলেন। শান্ত স্বাভাবিক গলায় বলেছিলেন, না কমলদা, আমাদের বিয়ে হতে পারে না। শাহানাকে আমি বলেছি আমার স্ত্রী হতে হলে তাকে ঘরবাড়ী ছাড়তে হবে, আমার মতো আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকতে হবে, অনেক কষ্ট করতে হবে। শাহানা রাজী হয়নি। এখনো ওর ক্যারিয়ারের প্রতি ঝোঁক রয়ে গেছে। আমি একজন খাঁটি কমিউনিস্টকেই বিয়ে করতে চাই কমলদা।

তাঁর এই বিপ্লবী চেতনাকে কমলদা পার্টির সবার কাছে ত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। কিছুদিন আগে তাঁর সমসাময়িক কমরেড কেন্দ্রীয় কমিটির ইউসুফ আলীর বিয়ে নিয়ে পার্টিতে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে গিয়েছিলো। ইউসুফ পার্টির অমতে এমন এক মেয়েকে বিয়ে করেছে যে মোটেই রাজনীতিসচেতন নয়। শাহানা পার্টির একজন সক্রিয় সমর্থক। দু' একটা ফাণ্ড তোলা, শেল্টার দেয়া এসব কাজ সে তখনই করতো। তাছাড়া মহিলা সমিতিও করতো। অন্য সবার মতো শাহানারও ধারণা ছিলো কমরেড হাসানুজ্জামানই তার জীবনসঙ্গী হতে যাচ্ছেন। তাঁর প্রত্যাখ্যান শাহানাকে কতোখানি আশাহত করেছিলো সে খবর তিনি পাননি। তবে ছ' মাস পরে তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়েছিলো।

অনেকদিন পরে তিনি যখন পুরোপুরি আণ্ডার গ্রাউণ্ড—একবার শাহানার খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, সে পাবনার এক গার্লস স্কুলে মাস্টারি করছে এবং তখনও বিয়ে করেনি। শাহানার অনেকগুলো ছোট ভাই-বোন ছিলো। তিনি ভেবেছিলেন ওদের লেখাপড়ায় বাধা পড়বে বলে সে বিয়ে করেনি। তবু শাহানার জন্য তাঁর মনে একটি নরোম কোণ ছিলো। বছরে এক আধবার তিনি ঠিকই—কমরেড শানু সম্বোধন করে ওকে চিঠি লিখেছেন।

তাঁর ক্লান্ত দৃষ্টির সামনে বিষণ্ন সূর্যটা ধীরে ধীরে ডুবে গেলো। ইদানীং তিনি বড়ো বেশী অতীতমুখী হয়ে পড়েছেন। একা হলেই অতীতের

হাজার স্মৃতি মিছিলের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বয়স হলে কি সব মানুষের এমন হয়? কমলদাকে দেখে কখনো মনে হয় না তাঁর অতীত বলে কিছু আছে। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে কমলদার জটিলতা কম নয়। তাঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে পার্টির এক দলদাকে বিয়ে করেছেন। সেই ভদ্রলোক কমলদার মেয়েটিকে নিজের কাছেই রেখেছেন। মাঝে মাঝে কমলদা মেয়েকে দেখতে যান। তখন নিশ্চয়ই নিভাদির সঙ্গে তাঁর কথা হয়। কি কথা হয়? কমলদাকে দেখে কখনো বোঝা যায়নি নিভাদির অবস্থান তাঁর জীবনে কতখানি।

সবার জীবন নিশ্চয় ট্রেনের গতির মতো সহজ ও বাধাহীন হতে পারে না। ইদানীং তিনি অনুভব করছেন তাঁর জীবন আগের মতো মসৃণ গতিতে চলছে না। সাত বছর ধরে একরকম নিজের হাতে গড়া পার্টি থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কমলদার পার্টিতে তাঁর সমসাময়িক কমরেড খুব কমই আছেন। যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে নিজের সমস্যা সেভাবে মেলে ধরা যায় না। সেখানে নিজেকে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ আগন্তুক ছাড়া কিছু ভাবতে পারছেন না। কেডাররা তার কথা শোনে, কিছু করতে বললে করে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করে না। অথচ নিজের দলে কতো তুচ্ছ ঘটনার সঙ্গেই না তিনি জড়িত ছিলেন। এখনো তিনি ছেড়ে আসা দলকে নিজের দল ভাবেন। এসব কথা ভাবতে গেলে নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হয়। তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন এই জীবন। নইলে শানুকে বিয়ে করে দু'তিনটি ছেলেমেয়ের বাবা হয়ে তিনি এখনো মসৃণ জীবন যাপন করতে পারতেন। এই বয়সের নিঃসঙ্গতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কাউকে কিছু বলা যায় না। বিশেষ করে তাঁর অবস্থান থেকে এসব কথা ভাবাও উচিত নয়। তবু অতীত বার বার স্মৃতির দরোজায় আঘাত করে।

ডিসেম্বরের সন্ধ্যার আলো বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তিনি জানালার বাইরে চোখ রেখে দেখলেন, ফিকে অন্ধকারে ন্যাড়া ধানক্ষেতে ঘন সাদা কুয়াশার নদী বইছে। দূরের গাছপালা কালো ছায়ার মতো ছোট ছোট জনপদ—সবকিছু জমাটবাঁধা কুয়াশার নীচে ডুবে গেছে। তিনি এতো গভীরভাবে চিন্তামগ্ন ছিলেন—যে কারণে ট্রেনের শব্দ, কামরার ভেতর যাত্রীদের মৃদু কথোপকথন, সবকিছু বিলুপ্ত হয়ে তাঁর চেতনায় কুয়াশার নদীতে শব্দহীন উদ্দাম গতিতে ছুটে চলার এক বিচিত্র অনুভূতি ভেসে বেড়াচ্ছিলো।

রাতের কালো ছায়া ধীরে ধীরে তাঁর চোখের সামনে থেকে ভাসমান সকল দৃশ্যাবলী গ্রাস করে নিলো। সবকিছু ঘন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেলো। তিনি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে উষ্ণ স্মৃতিময় যৌবনের কথা ভাবলেন।

শাহানাকে কদিন আগে একটা চিঠি লিখেছেন—কমরেড শানু, জেল থেকে বেরিয়ে তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। এখনো উত্তর পাইনি। আমি তো এখন আগের মতো আণ্ডারগ্রাউণ্ড নই। সাপ্তাহিক গণমুক্তির অফিসে চিঠি লিখলেই আমি পেতাম। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পাবনা যাবো। সেখান থেকে সিরাজগঞ্জে। সপ্তাহ খানেক ব্যস্ত থাকবো। তারপর তোমার কাছে যেতে চাই। কতদিন আমাদের দেখা হয়নি বলতো! প্রায় বারো বছর তো হলো! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া খুবই দরকার। অনেক কথা আছে। ইতি--হাসান।

কমলদা যখন তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন তিনি কোন এলাকায় কিভাবে কাজ করবেন, তাঁর পুরোনো এলাকায় না কমলদাদের নতুন এলাকায় ; তখন তিনি বলেছিলেন, পুরোনো এলাকাতেই তো কাজ করা উচিত। মইনুদ্দিনদের কয়েকজনকে বাদ দিলে অনেক বিপ্লবী কেডার রয়েছে সেখানে। ওদের প্রতি নিশ্চয়ই আমার একটা কর্তব্য রয়েছে। খবর পেয়েছি, আমি মইনুদ্দিনের সঙ্গে নেই বলে বিভিন্ন জেলায় এরই মধ্যে পার্টি ভাঙ্গতে শুরু করেছে।

কমলদা অবশ্য শুধু পুরোনো পার্টির উপর ভরসা করে তাঁকে ছেড়ে দেননি। বলেছেন, ঠিক আছে, আগের কর্মীদের যদি গোছাতে পারো তাহলে তো খুবই ভালো হয়। তবে সে সব এলাকায় আমাদের কিছু কন্ট্রাক্ট তোমাকে দিচ্ছি। অসুবিধে হলে সেখানে যোগাযোগ করতে পারো।

পাবনা তাঁর অনেক দিনের পুরানো কাজের এলাকা। সেখানে সবাই তাঁকে এক ডাকে চেনে। চারু মজুমদারের লাইন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অবশ্য সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, নইলে সেখানকার কৃষক সমিতি, শ্রমিক ফেডারেশন সবইতো তাঁর নিজের হাতে গড়া। প্রচণ্ড আশা নিয়েই তিনি নতুন করে কাজ শুরু করার জন্য পাবনা এসেছিলেন।

পাবনা এসে তিনি মইনুদ্দিনের একটা কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারলেন। প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটে গেছে এই জেলার উপর। পুরোনো যতো কমরেডের খোঁজ তিনি নিয়েছেন তারা সবাই মৃত। একাত্তরের যুদ্ধের পর

তিনি প্রথম পাবনাতে এসেছেন। ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, পথ-ঘাট সবকিছু আগের মতোই আছে, কিন্তু মানুষগুলো নেই। তিনি যে বাড়ীতে যান সেখানেই কান্নার রোল ওঠে। তিনি হতভম্বের মতো বসে থাকেন। এই সেই পাবনা যেখানে তাঁক ডাকে এক সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হয়েছে ; এ কি ভয়ঙ্কর অবস্থা তার। এমনও গ্রাম তিনি দেখলেন যেখানে একজন যুবকও বেঁচে নেই। তাঁকে দেখলেই গ্রামের মানুষরা অতীতে ফিরে যায়। কথা বলতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে, কি দেখতি আইছ বাপ, কিছুই আর নাই। আমরা শ্যাষ অইয়া গেছি। দুধের ছাওয়ালও রেহাই পায় নাই। দুর্ভিক্ষের পরও যারা বাঁইচে ছিলো তারা রক্ষীবাহিনীর হাতে মারা পড়িছে। আমাগের আর কিছুই নাই বাপ।

তিনি শূন্য দৃষ্টিতে ওদের মুখরে দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলেছেন, তোমরা তো জানো ওরা আমার ঘর-বাড়ী সব পুড়িয়ে ফেলেছে। ভাই, বোন এমনকি বুড়ো বাপটাকেও গাছে ঝুলিয়ে নীচে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে।

পাবনায় আসার পর থেকে ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক তাঁকে সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরেছে। যেখানে পুরোনো পার্টির কিছু অবস্থান আছে, হাল আমলে যারা পার্টিতে যোগ দিয়েছে তারা সবাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি নাকি পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সরকারের কাছে জবানবন্দী দিয়েছেন। কেউ কেউ তাঁকে শ্রেণী আপোষকারী কমলেন্দু সরকারের দলে যোগ দেয়ার জন্যেও অভিযুক্ত করলো। তিনি পরিষ্কার বুঝলেন, তাঁর বিরুদ্ধে মইনুদ্দিনরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে! তিনি কর্মীদের কখনো বলেছেন, আর কিছুদিন তোমরা অপেক্ষা করো, তাহলেই ভালো মতো বুঝতে পারবে কাদের পাল্লায় পড়েছো। আবার কখনো বলেছেন, আলমগীর খান যে সি আই এ'র এজেন্ট এটা কি তোমরা বুঝতে পারছো না ? কেন তার লেখা মান্থলি রিভিউতে ছাপা হয় তোমরা জানো ? নতুন কেডারদের বিনয় বা সৌজন্য বোধ বলে কিছুই নেই। তাদের কেউ কেউ তাঁকে মুখের উপরই বলেছে, কারা সি আই এ'র এজেন্ট সেটা তো রাজনৈতিক লাইন দেখলেই বোঝা যায়। আপনাদের কমলেন্দু সরকার তো দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমেরিকাকে মিত্র বানিয়ে তাদের এজেন্টদের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমরা আপনাদের সব

কাগজপত্রই পড়ি। কমলেন্দু বাবুরা ওঁদের কেডারদের যত খুশী ভেড়ার পাল ভাবুন তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমরা ওসব নেতা-ফেতা বুঝি না। যে সঠিক লাইন দেবে তাকেই নেতা মানবো। কেউ আরো একধাপ এগিয়ে বলেছে, এসব বুড়ো শকুনদের গুলী করে মারা উচিত। হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মীকে তো খেয়েছে ; আর কেন!

তিনি তাঁর চব্বিশ বছরের রাজনীতিব জীবনে কখনো এতোখানি অপমানিত বা বিড়ম্বিত হননি। এমন কি গ্রেফতারের পর এস. বি.-র জেরার সামনেও নয়। বিপ্লবের প্রয়োজনে তিনি নিজের জীবনের সবচেয়ে সেরা সময়গুলো ব্যয় করেছেন। কোন বুর্জোয়া পার্টি করলে নিশ্চয়ই তিনি মন্ত্রী হতে পারতেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ কিম্বা পার্টির কর্মীরা কেউ তাঁকে বুঝতে চাইলো না—এই যন্ত্রণা তাঁকে প্রতি মুহূর্তে ক্ষত বিক্ষত করছিলো। সিরাজগঞ্জে অবশ্য কমলদাদের কিছু কর্মী তিনি পেয়েছিলেন। তারা মজুরদের মিটিং-এ 'সংগ্রামী জননেতা কমরেড হাসানুজ্জামান জিন্দাবাদ' বলে শ্লোগান দিয়েছে। ট্রেনে ওঠার সময় ষ্টেশনে মৃদু গুঞ্জন তিনি লক্ষ্য করেছেন। সেখানে চাপা গলায় কেউ কেউ আঙ্গুল তুলে বলছিলো, দেখ দেখ কমরেড হাসানুজ্জামান যাচ্ছেন। তিনি এতে খুব বেশী উৎফুল্ল হতে পারেননি। নিজের দলের লোকেরা তাঁর সঙ্গে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলো—এই অনুভূতি তাঁর বুকে সারাক্ষণ কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে। নিজেকে এতো অসহায় আগে কখনো মনে হয়নি।

শাহানার স্মৃতিকে অবলম্বন করে তিনি এই যন্ত্রণা, বিড়ম্বনা, অসহায়তা আর নিঃসঙ্গতার মুহূর্তগুলিকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিলেন। তাঁর মনে আছে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাওয়ার আগে শেষবার যখন শাহানার সঙ্গে দেখা হলো, তখন সে বলেছিলো, একদিন আমার কাছে তোমাকে ফিরে আসতে হবে। আমি অপেক্ষা করবো। নিজের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।

শাহানার এ ধরনের কথাকে তখন তিনি মোটেই গুরুত্ব দেননি। এক মুহূর্ত আগের ফেলে আসা সময়কে ভবিষ্যতের লক্ষ কোটি মুহূর্তের বিনিময়ে ফেরত পাওয়া যায় না। তিনি বারো বছর পর সহসা উপলব্ধি করলেন শাহানার সঙ্গে তিনি প্রতারণা করেছেন। শাহানাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার কারণে। প্রতিষ্ঠাও তিনি পেয়েছিলেন। অনেক বিলম্বে তিনি বুঝতে পেরেছেন, এই প্রতিষ্ঠা যেমন স্থায়ী হতে পারে না, তেমনি

শাহানার বিকল্পও হতে পাবে না। গত দশ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি প্রতিষ্ঠার যে মিনার রচনা করেছিলেন জেল থেকে বেরিয়ে দেখলেন সেটা ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। গত কয়েক মাসের বিড়ম্বনা ও নিঃসঙ্গতা তাঁকে শাহানার প্রতি আরো নমিত করেছে। পৃথিবীতে যদি এতটুকু সান্ত্বনা তাঁর জন্য এখনো অবশিষ্ট থাকে সেটা শাহানা ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না —তাঁর এই বিশ্বাস ক্রমশঃ প্রগাঢ় হচ্ছিলো। তিনি ঠিক করেছেন শাহানাদের গ্রাম থেকেই আবার কাজ শুরু করবেন। এই কাজের ব্যাপারে আগেও একবার শাহানাকে লিখেছিলেন। শাহানা প্রত্যাখ্যান করেনি, আবার আমন্ত্রণও করেনি। শাহানা কখনোই তাঁকে আমন্ত্রণ করার সুযোগ পায়নি। বিশ বছর আগের কিছু স্মৃতিকে পরম যত্নে আঁকড়ে ধরে তিনি শাহানার কাছে যাচ্ছিলেন। জীবন আবার আগের মতো একই ধারায় বইবে না এটা হয়তো ঠিক তবু অতীতে যে ভুল করেছিলেন সেটা তিনি শাহানার কাছে স্বীকার করতে চান, সংশোধন করে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চান।

ট্রেনের জানালার গায়ে মাথা রেখে তিনি গভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন।

গ.

তিনি যখন উল্লাপাড়া স্টেশনে নামলেন, তখন রাত বেশী হয়নি, তবু শীতের কারণে অনেক গভীর মনে হচ্ছিলো। কাপড়ের ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি স্টেশন থেকে বেরিয়ে কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। শাহানার বাড়ীতে আগে কখনো না গেলেও এ অঞ্চল তাঁর অচেনা নয়। স্টেশন থেকে আধ ঘন্টার পথ হাঁটলেই শাহানাদের বাড়ীতে পৌঁছানো যায়।

গন্তব্য স্থান নিকটতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তাঁর আরো বেশী ক্লান্ত বোধ হচ্ছিলো। দীর্ঘ এক যুগ ধরে অবিরাম পথ চলার ক্লান্তি তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। আগে মনে হতো শাহানার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়েছে এইতো কদিন আগে! এখন মনে হচ্ছে বহু যুগ ধরে তিনি শাহানাকে দেখেননি যে কিনা তাঁর চিরজীবনের সঙ্গী হতে পারতো।

পথের পাশে কোথায় যেন কামিনী ফুল ফুটেছে। কুয়াশা ভেজা বাতাসে কামিনী ফুলের মদির গন্ধ ঘন হয়ে জমে আছে। সুগন্ধে তাঁর বুকটা ভরে গেলো। নিঃশ্বাস নেয়ার সময় হঠাৎ তাঁর কাশি উঠলো। ইদানীং এই

এক বাজে উপসর্গ জুটেছে। তিনি অনেকক্ষণ কাশলেন। কিছুদিন বিশ্রাম নেয়া তাঁর খুবই দরকার।

শানু, আমি আর পারছি না, আমাকে একটু আশ্রয় দাও, ভুলে যাও বারো বছরের এই ব্যবধানকে, আমরাতো আগের মতোই আছি, এখনো হয়তো জীবনের অনেকটা যন্ত্রণাময় সময় সামনে পড়ে আছে, শানু তোমার সকল যন্ত্রণার সঙ্গী করে নাও আমাকে। শাহানাকে বলার জন্যে অনেক আবেগ-তাড়িত কথা তাঁব বুকের ভেতর গুমরে মরছিলো। জীবন মানে ষড়যন্ত্র আর কুটিলতা নয়, জীবন মানে আশ্রয়হীন বিড়ম্বিতের মতো বেঁচে থাকাও নয়, জীবনের পরিধি অনেক বড়ো, জীবনের লক্ষ্য অনেক মহান।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ অনেক উপরে উঠে গেছে। কুয়াশাময় জ্যোৎস্নার প্লাবনে গাছপালা ঘরবাড়ী সব ধুয়ে যাচ্ছে। কামিনী ফুলের সুবাস মাখা তরল জ্যোৎস্নার নদীতে অবগাহন করতে গিয়ে তিনি তিরিশ বছর আগের কলেজ জীবনে ফিরে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে পরম শত্রুটিকে সামনে পেলেও তিনি ক্ষমা করে দিতে পারতেন। গভীর ক্লান্তির পাশাপাশি এক বিচিত্র সুখের অনুভূতিতে তিনি তখন আচ্ছন্ন ছিলেন।

আনন্দ-কল্পনাতাড়িত এক তরুণ প্রেমিকের মতো তিনি হেড মিস্ট্রেস শাহানা রহমানের দরোজাব কড়া নাড়লেন। কিছুক্ষণ পর শাহানা এসে দরোজা খুলে দিলো। তার এক হাতে হারিকেন ধরা ছিলো। তিনি হারিকেনের মৃদু আলোয় দেখলেন, এতটুকু বদলায়নি শাহানা। ঠিক আগের মতোই আছে। পরণে কালো পাড়ের একটি ধবধবে সাদা শাড়ী। শীতের জন্য আঁচলটা ভালোভাবে গায়ে জড়ানো। শাহানাকে কখনো তিনি কোন অলঙ্কার পরতে দেখেননি। ওর বাঁ হাতে শুধু ছোট্ট একটা ঘড়ি রয়েছে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, কেমন আছো শানু?

তাঁর হাসির জবাবে ঈষৎ ম্লান হাসলো শাহানা। বললো, ভালো। এসো, ভেতরে এসো।

তিনি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আমার চিঠি পেয়েছিলে?

কোন কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে সায় জানালো শাহানা।

বাইরের একটা ঘর পেরিয়ে তিনি শাহানাকে অনুসরণ করে ওর শোবার ঘরে এলেন। দেখলেন, অত্যন্ত নিরাভরণ ঘর। ঘরের একপাশে তক্ত-পোষের উপর পাতলা তোষক অথবা কাঁথার উপর চাদর বিছানো। পাশে

ছোট একটা লেখার টেবিল। দেয়ালে কাচের পাল্লা বসানো আলমারীতে কাপড়-চোপড় আর খুচরো কিছু জিনিসপত্র রাখা। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিলো এখনই গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে। শাহানা হ্যারিকেনটি তাকের উপরে তুলে রেখে লেখার টেবিলের চেয়ারটা তাঁর দিকে বাগিয়ে দিয়ে বললো, বসো। তিনি কাপড়ের ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে চেয়ারটা টেনে বসলেন। শাহানা দেয়াল আলমারীর ভেতর থেকে গ্লাস আর প্লেট বের করতে করতে বললো, তুমি কি খেয়ে এসেছো?

তিনি মৃদু হেসে বললেন, এত বছর পর তোমার বাড়ীতে খেয়ে আসবো এটা কেন ভাবছো!

জবাবে শাহানা হাসলো কিনা বোঝা গেলো না। বললো, তুমি যে আজই আসবে তাতো বলোনি। কাজের মেয়েটাও চলে গেছে।

তিনি একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, তুমি কি আমার সঙ্গে লৌকিকতা করবে নাকি শানু? চারটি ভাত থাকলে নুন মরিচ দিয়ে আমি তাই খেতে পারবো। শাহানা কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। এতোক্ষণে তিনি শাহানার ভেতর একটা পরিবর্তন আবিষ্কার করলেন। ওর চেহারায় আর কথাবার্তায় একটা বয়সোচিত গাম্ভীর্য এসেছে যা তাকে আরও বেশী ব্যক্তিত্বময় করেছে। তিনি ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে আকর্ষণীয় কিছুই দেখতে পেলেন না। দেয়ালের আলমারীতে অবশ্য তাক বোঝাই বই রয়েছে। দিনের আলোয় দেখতে হবে। সব সময় প্রচণ্ড কাজের ভেতর থাকায় বই পড়ার সুযোগ তাঁর কখনোই খুব বেশী হয়ে ওঠেনি। বিশ বছরের পার্টি জীবনে শুধু জেলে থাকার দেড় বছর সময় তিনি অবসর পেয়েছিলেন। অবশ্য জেলে থাকতে তাঁর বই পড়ার কোন উৎসাহ ছিলো না। দেশে এই ভাবে সরকার পরিবর্তন হবে, আর এইভাবে জেল থেকে তিনি বেরিয়ে আসবেন এটা ভেতরে থাকতে কখনো মনে হয়নি।

শাহানা বাইরের রান্নাঘরে আগুন জ্বেলেছে। আম কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ আর কড়াইয়ে কিছু ভাজার শব্দ পাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর খুব একটা খিদে নেই। আজকাল খুব হিসেব করে তিনি খাওয়া দাওয়া করেন। হজমের গণ্ডগোলটা আবার বেড়েছে। শরীরেরও তো সহ্য করার একটা সীমা আছে। জেলে প্রথম দিকে কি জঘন্য সব খেতে দিতো। পরে অবশ্য জেলারকে ডেকে ধমক দিয়ে তিনি স্পেশাল ডায়েটের ব্যবস্থা

করেছিলেন। ইউসুফ আবার এসব ব্যাপারে খুব অনুভূতিপ্রবণ। তিনি তাঁর পার্টি জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহকর্মীটিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন জেলারকে বলে ডায়েটের ব্যবস্থা করতে। বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর চেয়ে ইউসুফ অনেক বেশী পরিচিত। ওর স্পেশাল ডায়েট পাওয়ার অধিকার আছে। ইউসুফ তাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছেন। বলেছেন, আমার হাজার হাজার ছেলে যখন এই খেয়ে আছে তখন আমিও এই খাবো। জবানবন্দীর ব্যাপারে ইউসুফকে বলতে গিয়েও তিনি অপ্রস্তুত হয়েছেন। সেই ঘ্যানঘেনে সেন্টিমেন্ট—আমার হাজার হাজার ছেলে যেভাবে বেরুবে আমিও সেভাবে বেরুবো। তিনি বিরক্ত হয়ে বলছেন, তোমার হাজার হাজার ছেলে নিয়ে জেলে বসেই পঁচে মরোগে, বিপ্লব করতে হবে না। তিনি ভেবে বিস্মিত হয়েছেন এত কম যোগ্যতা নিয়ে ইউসুফ কি করে নেতৃত্বের কথা ভাবতে পারে।

শাহানা এসে বললো, বারান্দায় বালতিতে পানি আছে। মুখ ধুয়ে নাও। তিনি একবার শাহানার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর ব্যাগের ভেতর থেকে গামছাটা বের করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে কোন রকমে মুখ ধুয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। শাহানা ঘরের ভেতর মাদুর বিছিয়ে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। ভাতের সঙ্গে ডিম ভাজি, আলু ভর্তা আর ডাল রয়েছে। তিনি শাহানাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি খাচ্ছো না? শাহানা মৃদু গলায় জবাব দিলো, আমি আগে খেয়ে নিয়েছি।

কথা না বাড়িয়ে তিনি খেতে বসলেন। শাহানা ভাতও গরম করেছে। পরিতৃপ্তির সঙ্গে তিনি গরম ভাত খেলেন। খেতে খেতে লক্ষ্য করলেন, শাহানা ছোট-খাট কাজগুলো সেরে রাখছে।

খেয়ে উঠে তিনি চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। শাহানা বাসন পেয়ালা গুছিয়ে রেখে অনেকক্ষণ পর এসে বিছানার উপর বসলো। তিনি কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, অসময়ে এসে তোমাকে ঝামেলায় ফেলে দিলাম।

শাহানা তার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, তোমার এভাবে আসা উচিত হয়নি।

তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন, কেন বলতো?

শাহানা আগের মতো গম্ভীর হয়ে বললো, জানাজানি হবে।

আমিতো এখন আণ্ডারগ্রাউণ্ড নেই?

শাহানার ঠোঁটের ফাঁকে মুহূর্তের জন্য এক টুকরো বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো। বললো, আণ্ডারগ্রাউণ্ডই যদি থাকতে তাহলে এই এলাকায় অন্তত তোমার শেল্টারের অভাব হতো না।

শাহানার কথাগুলো তাঁর কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য মনে হলো। স্খলিত কন্ঠে তিনি বললেন, শাহানা তুমি কি বলছো আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না?

শাহানা গম্ভীর হয়ে বললো, তুমি যে এখন পার্টিতে নেই এই এলাকার সবাই তা জানে। তুমি জেলে গিয়ে পার্টির বহু কর্মীকে ধরিয়ে দিয়েছো; জেল থেকে বণ্ড দিয়ে বেরিয়ে সরকারের সঙ্গে আপোষ করেছো, এসবই এখানকার কৃষক কর্মীরা জানে।

তিনি আবারও বললেন, শাহানা তুমি এসব কি বলছো? আমি পার্টিতে নেই কে বললো! আমি কমলদাদের সঙ্গে কাজ করছি, গণমুক্তিতে সে খবরতো অনেক আগেই বেরিয়েছে। আর পার্টিই যদি বলো সেটাইতো আমাদের মূল পার্টি। সাত বছর আগে আমি আর ইউসুফ চক্রান্ত করে বেরিয়ে এসে নতুন পার্টি করেছিলাম শুধু নেতৃত্বের লোভে। এখন আর সেই লোভ আমার নেই। আমি মইনুদ্দিকেও বলেছি কমলদা'দের পার্টিতে যোগ দিতে। এখন কি আর আমাদের সেই পার্টির কোন অস্তিত্ব আছে নাকি। শাহানা অত্যন্ত শান্ত অথচ কঠিন গলায় বললো, দেখ হাসান তুমি নিজেকে যতো খুশী প্রতারণা করতে চাও করো, কিন্তু পার্টি নেই, কমলদা'দের পার্টিই মূল পার্টি আর মাতৃপার্টি এসব কথা শুনে কমলদার মতো বাতিল হয়ে যাওয়া নেতা খুশী হতে পারেন কিন্তু একজন সাধারণ কৃষক কর্মীকে তুমি কথাটা বোঝাতে পারবে না। তুমি কি কল্পনাও করতে পারছো না হাসান, তুমি তোমার নিজের হাতে গড়া পার্টির সঙ্গে, এদেশের কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনগণের সঙ্গে কতো বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা করেছো? তোমাদের ভুল লাইনের জন্য হাজার হাজার ছেলে এই পার্টিতে এসে জীবন দিয়েছে, জেলের ভেতর ধুঁকে ধুঁকে মরছে, আর তুমি সবাইকে শত্রুর কামানের সামনে রেখে সরে দাঁড়ালে? বলতে পারো আমাকে দিয়ে আর বিপ্লবের কোন কাজ হবে না, আমি ফুরিয়ে গেছি, তাহলে কিছু লোকের অন্তত সহানুভূতি পেতে পারতে, কিন্তু তুমি নির্লজ্জের মতো জঘন্য এক প্রতারণাকে সমর্থন করছো।

চরম আশাভঙ্গের বেদনা আর ক্রোধে তিনি মুহূর্তের জন্য আত্মহারা হয়ে গেলেন। চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, চুপ করবে তুমি? তারপর ক্রোধ সংবরণ করে চাপা গলায় বললেন তুমি রাজনীতির কি বোঝ শাহানা? কদিন ধরে তুমি পলিটিক্স করছো? আমি যা করেছি, আমার বিশ বছরের পার্টি জীবনের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে থেকে করেছি। এই অবস্থানকে তুমি অস্বীকার করতে পারো না। জীবনে অনেক ভুল করেছি। এই প্রথম-বারের মতো আমি সঠিক লাইন নিয়ে কাজ শুরু করেছি। তুমি যদি দশ বছর আগেও পার্টিতে আসতে শাহানা, তাহলে বুঝতে, বিপ্লব মানে চোখে রঙিন চশমা এঁটে আকাশ থেকে পৃথিবী দেখা নয়।

শাহানা শান্ত গলায় বললো, তুমি উত্তেজিত হচ্ছো কেন? পার্টিতে আমি যোগ দিয়েছি মাত্র দু'বছর হলো। ভেবেছিলাম সক্রিয়ভাবে কখনো পার্টি করবো না, সমর্থক হিসেবে মহিলা সমিতি, কৃষক সমিতি এসবই শুধু করবো। তুমি যখন জেলে গেলে, যখন খবর পেলাম অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে তারাকে ওরা হত্যা করেছে, যখন শত শত কর্মী গ্রেফতার হতে লাগলো তখনই আমি পার্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভেবেছিলাম যখন ফিরে আসবে তখন তোমাকে অবাক করে দেবো, বলবো এসো হাসান, বারো বছরের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেছি; কিন্তু তুমি তা হতে দাওনি। তবে তুমি যেভাবে পার্টি আর জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো, তার বিপরীতে আমাকে পার্টি আর জনগণের সঙ্গে আরও বেশী একাত্ম হয়ে তাদের স্বার্থকে একমাত্র জেনে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। নইলে কৃষক আর মজুরদের কাছে কমিউনিস্ট বিপ্লবী আর তাদের পার্টি সংশোধনবাদী বেইমানদের পার্টি হিসেবে পরিচিত হবে। দেশে কমিউনিস্ট পার্টি আছে, থাকবে; এদেশে বিপ্লব হবেই। তোমার মতো বহু পেটি বুর্জোয়া সুবিধাবাদী লোক পার্টিতে আসবে, আবার সুযোগ বুঝে বেরিয়েও যাবে। তাতে ব্যক্তিবিশেষের হয়তো ব্যক্তি-গত ক্ষতি কিছুটা হবে কিন্তু বিপ্লব কি থেমে থাকবে? তাহলে যে বিপ্লবের সাধারণ দর্শনকেই অস্বীকার করা হয়।

তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে শাহানা বললো, আমাকে বলতে দাও হাসান। আমি জানি তুমি কি বলবে। তুমি তোমার কমলদার মতো মইনুদ্দিন আর আলমগীর ভাইকে পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী বলবে, সাম্রাজ্য-বাদের এজেন্ট বলবে। আমি এতে অবাক হবো না। কারণ তিন বছর

আগে তুমি নিজেই কমলদাকে সাম্রাজ্যবাদের পা চাটা কুকুর বলেছো। না, তোমার বিরুদ্ধে ওরা সেরকম কথা বলেনি। বলেনি কারণ তুমি এই পার্টির বিকাশের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখো না। কিন্তু ওরা না বললেও তুমি একবার নিজেকে প্রশ্ন করো। আয়নায় ভালোভাবে নিজের মুখখানা দেখো। একবার স্বাভাবিক মস্তিষ্কে ভাবার চেষ্টা করো, তুমি কাদের সঙ্গে আপোষ করেছো আর কাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছো। তুমি কি জানো—এখন যে এলাকায় আছো, যেখানে একদিন তোমার ডাকে লক্ষ কৃষক জড়ো হয়েছে, সেখানে এখন তোমাকে গুলি করে পথের উপর লাস ফেলে রাখলেও কেউ ফিরে তাকাবে না।

তিনি অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, তুমি আমাকে আসার জন্য বারণ করলেই পারতে শানু। আমি কি করবো সে পরামর্শ নেয়ার জন্য তোমার কাছে আসাটা খুব জরুরী ছিলো না। আমি শুধু বলতে চাই এখনো তুমি অন্ধের মতো পথ চলছো।

তিক্ত হেসে শাহানা বললো, প্রিয় হাসান, আমার কোন অতীত নেই, সকল সম্পর্ক মিটে গেছে। বোন দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে। ভাই দুটোকে রক্ষীবাহিনী মেরেছে। মা হার্টফেল করে মরেছেন। বাকি ছিলে তুমি। যেদিন তুমি তোমার কমরেডদের ধরিয়ে দিলে নিজে বাঁচার জন্য, সেদিন থেকে তুমিও আমার কাছে মৃত। তুমি রাতের অন্ধকারে এসেছো। রাত থাকতেই তোমাকে চলে যেতে হবে। এই এলাকার পার্টির দায়িত্ব আমার উপর। আমি চাই না সাধারণ কর্মীরা কেউ দেখুক, তাদের কোন কমরেড একজন শ্রেণী আপোষকারী বেইমানকে আপ্যায়ন করেছে। কতখানি তিক্ততার সৃষ্টি হলে আমি এভাবে কথা বলতে পারি, তোমার বোঝা উচিত। হাসান কিছুক্ষণ যদি বিশ্রাম নিতে চাও, পাশের ঘরে যাও। বিছানা পাতা আছে। আমি এখন ঘুমোবো। সকালেই আমাকে বেরুতে হবে।

কিছুক্ষণ তিনি বজ্রাহতের মতো বসে রইলেন। তারপর কোন কথা না বলে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পায়ে পায়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বাইরের দরজাটা তিনি ঘরে ঢোকার সময় খোলা রেখে এসেছিলেন। হু হু করে হিমেল বাতাস ঢুকছিলো সেই খোলা দরজা দিয়ে। জানালার কাছে বিছানার উপর এক টুকরো চাঁদের আলো পড়ে আছে। পেছনে তাকিয়ে দেখলেন শাহানা হারিকেন নিভিয়ে দিয়েছে।

বুকের ভেতর প্রচণ্ড ক্রোধ হতাশা আর যন্ত্রণা নিয়ে স্থানুর মতো তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন অন্ধকার ঘরের ভেতর।

পূর্ণিমার চাঁদ যখন পশ্চিমের ঘন গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেলো তখন তিনি অন্ধকার পথে নেমে পড়লেন। অন্ধকার থাকতেই তিনি এই লোকালয় ছেড়ে চলে যেতে চান। সূর্য ওঠার এখনো কিছু দেরী আছে।

অনির্বাণ গাথা

আজহার ইসলাম

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। অকস্মাৎ সক্রান্ত বাতাসের রুদ্ধ গর্জন। আম নারকেল কৃষ্ণচূড়া গাছের সবুজ পাতার অজস্র আন্দোলনে ঝড়ের পূর্বাভাস। সুতীক্ষ্ণ আলোর ছটা সেদিন বৈশাখের মধ্যাহ্নে কোনো অশুভ চক্রান্তের ইঙ্গিত বয়ে আনেনি। মানুষের কোলাহল, পাখ-পাখালীর কাকলি কিংবা নদীর কলতান মুহূর্তের তরেও শয়তানের অট্টহাসিকে উদ্দাম করে তোলেনি। আহার সন্ধানে নিরত মানুষগুলো যে যার কাজে ব্যস্ত। অথচ বিকেল বেলা দ্রুত পরিবর্তন, ঝড়ের সংকেতধ্বনি।

বছরের প্রথম ইরি ধান উঠেছে। মাঠ থেকে কেটে এনে জমির মালিকের ভিটায় ধানের আঁটিগুলো স্তূপাকারে সাজানো হচ্ছে। মালিকের নির্দেশানু-সারে সেখান থেকে ভাগ করে আঁটিগুলো নিয়ে যে যার ইচ্ছেমতো জায়গায় বসে আঁটি থেকে ধান সংগ্রহ করছে। বিনা পারিশ্রমিকে অবশ্য কেউ তা করছে না। ধান সংগ্রহ শেষ হলে মালিক পাবেন ধান, আর সংগ্রহ-কারী ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই পাবেন আঁটি। আঁটিতে অবশ্য লাভ কম নয়, কেননা তাতে জ্বালানীর কাজ চলে, আবার গাইগরুর খাদ্যবস্তু হিসেবেও ব্যবহার করা যায় কিংবা বিক্রি করলে কিছু পয়সাও মিলতে পারে।

একটি কালো রংয়ের মেয়ে হঠাৎ তার মাকে বললো, তুফান আইব মা, ঝটপট সাইরা নে।

কিন্তু কাজ তখনো অনেক বাকি।

কতা না বারাইয়া আত চালাইয়া নে। তুফান আওনের আগে আগেই আমরা বাড়ী যামু।

সবিতুনের মা সবিতুনকে আশ্বাস দিলেও সবিতুন তাতে আশ্বস্ত হলো না। কেননা তুফানের আগমন যেমন অতর্কিত, ধ্বংসের লীলাও তার অভাবনীয়। ঈশানের পুঞ্জীভূত মেঘ, হিংস্রতায় ভয়াবহ, সবিতুন তা জানে

এবং জানে বলেই তার ভীত-চকিত দৃষ্টিতে বৎসরের প্রথম এই সম্ভাব্য ঝড়ের আগমন একটা অশুভ আতঙ্কের ছায়াপাত ঘটিয়েছে।

কাজ চালাবার উৎসাহ তার রইলো না। কারুণ্যের একটা বিগ্রহ যেন সে, পলকহীন দৃষ্টিতে কর্মরত মায়ের পানে তাকিয়ে থাকে। চোখ দুটি ছলছল হয়ে উঠে, ঝড়ের যে প্রচণ্ড ছাপটি তার কোমল হৃদয়ে আঁকা হয়ে গেছে, মা কি তার খবর কোনো দিন রেখেছে? অথবা মাতৃহৃদয়ের খবর সে নিজে কি কোনোদিন জানতে চেয়েছে? এদিকে কোলাহল আর হৈ চৈ আরো প্রবলবেগে শুরু হয়ে গেছে। কেননা ঝড় আসবার বার্তা সবগুলো কর্তব্যরত মানুষের কানে পৌঁছে গেছে।

আলো চালাইয়া কর। আইয়া পড়লো।

মাগী যিমুন রসুলপুরের গাবিন গাই।

দ্যাহেন ত নছু চাচা। মাগী আতও চালাইব না, আবার কিছু কইলে ছ্যান কইরা উঠব।

কাইজ্যা কইরা কতা বারাইছ না। তুফান আইলে আর সামলাইতে পারবি না। বালবালাই কামগুলি সারা অইলেই বাচি।

ইত্যাকার শাব্য অশ্রাব্য বিবিধ কলগুঞ্জনে পরিবেশটা অধিকতর সরগরম হয়ে উঠলো। কাজ শেষ করবার তাগাদা সবাইকে বেশ উতলা করে তুলেছে। এদিকে মালিক এক নজরে শ্যানদৃষ্টি বর্ষণ করে ধানের স্তূপের দিকে লক্ষ্য করে গেলেন।

সবিতুন কিন্তু নিশ্চল পাথর। মা তাকে তাগাদা দিচ্ছে, ওলো সবিতুন তুফানডা যিমুন জবর জোরে আওন লাগছে। খারইয়া না থাইক্যা এডডু আত চালা দিকি মা।

সবিতুনের অন্তর্নিঃসরিত দীর্ঘশ্বাস, আমি পারমু না মা। ঐ দ্যাখ আশমানডা কালা অইয়া গ্যাছে। একটা কালা হাড় যিমুন গুঁতা মাইরা আইতাছে। আর চাইয়া দ্যাখ আমার শরীলটা কাঁপন লাগছে। তুই আমারে ছাইড়া দে, আমি এই গেলাম। সবিতুনের মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। মেয়ে তার ঐরকম। কখনো ভোরের রোদের মতো কোমল আর স্বচ্ছ, কখনো মেঘের মতো ছায়াচ্ছন্ন। আপন মনে ভাবনার তার শেষ নেই। সবিতুন মমতা আর ভালোবাসার একটি নরম মূর্তি। গাঁয়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সে প্রিয়পাত্র। অথচ তার এই মনবিকলনের ইতিহাস কারো জানা নেই।

কোনো এক নিষ্ঠুরতার অসহায় শিকার সে। কেউ তা জানে না, অথচ দারুণ মানসিক যাতনায় সে যে দিনে দিনে নিঃশেষিত হতে চলেছে একথা সবাই অনুভব করে।

থাউক, মাইযারে ছাইড়া দে। আপন মনে এডড্ ঘরন্ত দে। মনডা হালকা হউক। নেছার মা কথাগুলো বললো। বয়স্ক প্রবীণ নেছার মা, সমবেদনায় বেদনাতুর নেছার মা সবিতুনের মানসিক যাতনার কথা জানে। সহানুভূতির উত্তাপে বিগলিত হয়ে সবিতুনের মার অবোধ চোখ দুটি ছলছল হয়ে উঠে। নিয়তির কোন নিষ্ঠুর অভিশাপে তার একমাত্র সন্তান, একমাত্র কন্যা সবিতুনের এই অবস্থা? আল্লাহর কাছে তার ফরিয়াদের অন্ত নেই, সেই সঙ্গে ভক্তি আর ভালোবাসা। অথচ সে কি না শান্তির মগ্নচেতনা থেকে বঞ্চিত।

তার মেয়ে সবিতুন। বছরখানেক আগেও যে ছিলো হরিণীর মতো নৃত্যচঞ্চল। অবোধ শিশু যেমন করে মায়ের কোলে শান্তির আশ্রয় খোজে, কিশোরী সবিতুন সেই শিশুর মতোই কখনো ছিলো শান্তির নীড় সন্ধানী, কখনো উচ্ছল লীলাময়ী। আজ তার এই পরিণতি। কেউ বলে অভিশপ্ত প্রেতাত্মা তার উপর ভর করেছে। আবার কোনো প্রবীণ মুরুব্বি মাথা দোলিয়ে হযতো বা বলে বসলেন, আসলে মাইয়্যার উপর জ্বীনের আসর অইছে। হাইনজা বেলা উদাম গায়ে ঐ তলদা একলা গ্যাছে আইছে সন্দ অয়। কবিমুনের মা সেকথা বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পাশের গাঁয়ের হাছন ওঝাকে ডেকে মেয়ের উপর ঝাড়ফুঁকও করিয়েছে। অনেক কষ্টে জমানো সবিতুনের মার অর্থাৎ হামুর বৌয়ের কয়েকখানি কড়কড়ে নোট হাছন ওঝার পকেটে গেলেও সবিতুনের মানসিক অবস্থার তাতে বিন্দু-মাত্র পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না। মেয়ের সুস্থ সুন্দর মনটি দেখে বাপ-মা একদা যেমন আনন্দে আত্মহারা হতো, সেই অবস্থা কি তারা আর কোনো দিন ফিরে পাবে।

ঐটুকু সবিতুন কতই বা বয়স। পঞ্চদশী কিশোরী, স্বাস্থ্যবতী সুন্দর সুঠাম দেহখানি আসন্ন যৌবনের নীরব ইংগিত। গেলো বছরের কথা। সবিতুন হঠাৎ একদিন অনুভব করে বমিজুদ্দি মুনশীর 'যোয়ান পোলাডা' তার দিকে ড্যাব্ ড্যাব্-করে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয় হারামজাদার মনে কোনো কুমতলব আছে। হামুর মেয়ে হামুর মতোই স্বাস্থ্য আর শক্তির অধিকারী।

তার চাংগা মন চনচনিয়ে উঠলো। ঠাস করে একটা চড়ই ছোঁড়ার মুখে গিয়ে বসতো যদি না শেষে ছোঁড়া তার কাছে মন্ত্রপড়া সাপের মতো আত্মসমর্পণ করতো।

সবিতুন আমার দিকে বালা কইবা চাইয়া দ্যাখ, কোনো খারাপ মতলবে আমি তর কাছে আয়ি নাই। জমিরদ্দি অসহায় দৃষ্টিতে সবিতুনের সহানুভূতি প্রার্থনা করে। অনুরাগ বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায়নি, তবে রাগটা কিছু কমেছে। সতেজ সপ্রতিভ সবিতুন বললো, আমার কাছে আওনের কাম নাই। তর গরে মা বইন আছে হ্যাগ কাছে যা।

বইন আছে, তয় বৌ নাই।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

অরে ড্যাকড়া, বৌ করনার সখ?

কৃষ্ণকায় গোখরা ফণা বিস্তার কবে জমিরদ্দিব উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জমিরদ্দির সবল বাহু দু'টি সবিতুনের কোমল দেহ বুকের মধ্যে চেপে ধরে। সবিতুন অনুভব করে জমিবের বাহুদ্বয় অসম্ভব শক্তিশালী। সেখান থেকে মুক্তির আশা নিরর্থক, অথচ এই অশোভনীয় অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকাও নিরাপদ নয়। সন্ধ্যার আবছা আঁধারে আম জাম জারুলের নীচে সবিতুন-জমিরের হৃদয় এক নতুন অনুভূতিব স্পর্শে রোমাঞ্চিত হযে উঠে সেদিন।

সবিতুন আমি তরে ছাড়মু না, বুকের মধ্যে ঝাপটে ধরে জমির সবিতুনের কুঞ্চিত কেশে মুখ ডুবিয়ে দেয, তাকে নিজের দেহে লীন কবে নিতে চায়। অনাহত সবিতুন স্বপ্নের দেশে পুলক নিঃশ্বাসে ঘন আব নিবিড় হয়ে ওঠে। সহস্র অশ্বশক্তিব প্রবল আকর্ষণে তার মথিত নারীহৃদয় পুলকে আবেশে বিহ্বল হয়। সবিতুন অনুভব কবে জমিরেব পৌরষদীপ্ত বাহু ও সবল বুকের নিষ্পেষণ যতই প্রবল হোক তাতে এক ধবনের মাদকতা আছে। সুতরাং নারীর সলজ্জ অনুভূতি সে হারিয়ে ফেলে। শিথিল দেহে শিথিল বসনা সবিতুন নিজের দুটি কোমল বাহু বেষ্টনে জমিরকে আকর্ষণ করে, তারপর সচেতন হয়ে অতর্কিত আঘাতে জমিরেব বাহুবন্ধন ছিন্ন করে উন্মত্ত গতিতে পালিযে আসে নিজেদের ক্ষুদ্র কুটিরে।

মা অবাক হয়ে সবিতুনেব বিস্রস্ত অবস্থা নিরীক্ষণ করে। সবিতুন তর অইছে কি? ইমন কইরা কাঁপতাচ ক্যান?

সবিতুন কেঁদে ফেলে। মায়ের বুকে মুখ রেখে ফুফিয়ে কেঁদে ওঠে।

ঝড়ের পরে এ যেন এক পশলা বৃষ্টি। এবং এই বৃষ্টিতে সে শীতল হলো, মরম্ বুকে জলের প্রলেপ, ঝিরঝিরে বাতাসের কোমল স্পর্শ।

তারপর কিছুদিন যায়। শীতলক্ষার কূলে সবুজ ঘাসের উপর হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে একদিন একালের কালা কানু বাঁশের বাঁশীতে সুর তুলেছে। জমিরদ্দি 'কালা' বটে, তবে কানুর মতো সৌভাগ্য কি তার হবে? সবিতুনকে কি সে কোনোদিন তার ঘরে তুলতে পারবে? অথচ সবিতুন ছাড়া সংসার-জীবন তার কাছে অভাবনীয়। সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে পশ্চিমের আকাশটা তখন রক্তিম হয়ে উঠেছে। কারবালার বিষাদময় প্রান্তরে কাসেম-সখিনার শহীদী রক্ত ইতিহাসের সেই মহাযুগ থেকে আকাশের প্রান্তে প্রলিপ্ত হয়ে আছে, তারই আভাস যেন সেই গোধূলি লগ্নের কৃষ্ণচূড়া আকাশটা। গাঁয়ের প্রবীণ মুরুব্বী-দের কাছে শোনা এই কাহিনী জমিরদ্দির হৃদয়টা আজ বড়ই উতলা করছে। সে নিজেকে হোসেনতনয় কাসেমের সমধর্মী মনে করছে, মনে মনে সবিতুনকে হাসানতনয় সখিনা বিবির আকৃতিতে দাঁড় করিয়ে নিজেকে কাসেমরূপে কল্পনা করে ভাবাবেগে আত্মহারা হয়ে পড়ছে সে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে জমির এই নির্জন নদীতটে স্বগতোক্তি করে, সবিতুন, তুই কি আমার ঘরের বাত্তি জ্বালাইবি না? নিদয়া সবিতুন জমিরের ঘরের বাতি জ্বালবে কিনা বলা যায় না, তবে তার হৃদয়ে যে তুষের আগুন জ্বেলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমির খাঁর কবরের পাশে ঠায় দণ্ডায়মান ঝাঁকড়া মাথা আমগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সবিতুন সেদিন গ্রামের দক্ষিণ সীমা খানিকটা বাঁক নিয়ে যেখানে উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত নরসিংদী বাস-রোডের সংগে মিশেছে সেইদিকে তাকিয়ে আছে। তার বাপ হামিরদ্দী নরসিংদীর বাস ধরবার জন্য মাঠের উপর দিয়ে প্রবল বেগে দৌড়াচ্ছে। বৈষয়িক কারণে হামু নরসিংদীর হাটে যাচ্ছে। ফসলের মাঠ ধূ ধূ করছে। পৌষের শেষ, শীতের তীব্রতা, পাখির কিচির মিচির এবং সবিতুনের নীরব চাহনি। সবটা মিলে বিধাতার আনন্দের ধারাটি যেন প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। সকাল সন্ধ্যা আমার নায়ে কেমনে আইসে যায়, গগনবিদারী চীৎকারে গানের সুর তুলে পরিবেশটিকে সরগরম করে একদল গ্রাম্য যুবক খানিকটা দূরে গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে মিল কারখানায় কাজে যাচ্ছে। দলের অন্যতম ব্যক্তি জমিরদ্দী। সবিতুন স্নিগ্ধ নির্নিমেষ চোখে জমিরের দিকে তাকায়। জমিরের সতেজ কন্ঠ দুর্বল হয়ে আসে। দল থেকে সে বেরিয়ে আসে, ছিটকে পড়ে সবিতুনের পাষাণ মূর্তির পাশে।

কাজে যাওয়ার প্রবৃত্তি তার থাকে না। সবিতুনের নীরব চোখের পানে চেয়ে সে দ্বিধাজড়িত কন্ঠে বলে, 'আমি ত তর কোনো ক্ষেতি করি নাই সবিতুন। তুই আমারে দেখলে ইমন কইরা চাইয়া থাকস্ ক্যান।

সবিতুন নির্বাক।

আমারে তর মনে না ধরে, আমার গরে না আয়িস, কিন্তুক আমার লগে তুই কতাডাও যে বন্ধ কইরা দিচস।

অসহ্য যন্ত্রণায় জমিরের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, জমির মনে প্রাণে তাকে কামনা করে, হরিণীর মতো স্বভাবভীরু কিশোরী সবিতুনের শংকিত হৃদয়ে তার আবেদন কতটুকু প্রবেশ করছে নির্বোধ গ্রাম্য যুবক জমির তা জানে না।

সকাল বেলার নরম রোদ সরে যাচ্ছে, পাখির কাকলি, ফুলের সুরভি বাতাসের স্নেহস্পর্শ আর নেই। মধ্যাহ্নের খরতপ্ত পৃথিবীটা জণ্ডিস রোগীর মতো ধুকে ধুকে মরছে। সবিতুন কখন যে চলে গেলো জমির তা জানে না। সময়ের হিসেবে সে অনেকক্ষণ একই জায়গায় বসে আছে।

কেডারে, জমির নাহি। উত্তর পাড়ার বাতাসীর দাদী নিবু নিবু চোখ দিয়ে জমিরকে নিরীক্ষণ করে। পৌষের পত্রবিহীন শীর্ণ গাছের ন্যায় বাতাসীর দাদীর অবয়ব। কিন্তু তাতে দরদ আছে, কখনো কখনো রস-রসিকতার স্পর্শমণ্ডিত।

দাদী, আমি।

হাইনজাবেলা ইমন উদাস অইয়া বইয়া আচ ক্যান।

মনডা বালা নাই দাদী।

মনের মানুষ পামু কই, মনডা আমার খারাপ সই, আমি পাত্তাল খুঁইড়া ঘুইরা মরি, মনের মানুষ পামু কই। দাদী তার বক্র হাত দুটি আকাশের দিকে উঁচিয়ে মাজাখানা ডানে বায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে জমিরকে এমন একটা অঙ্গভঙ্গি উপহার দিলো যে জমির তাতে না হেসে পারলো না।

বাঁশবনের নীচ দিয়ে চলতে গিয়ে তার মনে হয় এই পথে সবিতুনের সঙ্গে কতদিন সে চলেছে। শৈশবের সবিতুন হাস্যে লাস্যে সতেজ প্রফুল্ল। আমবাগানে হলুদ ফুলেব অজস্রতা, মধু মক্ষিকার আনাগোনা এবং এসবের সঙ্গে সবিতুনের হাসির শব্দটি ভারী মানানসই। বাঁশবাগানে মাথার উপর চাঁদ উঠেছে। চাঁদের হাসিটি বাঁশবাগান আলোকিত করেছে। জমির হাঁটছে। বাঁশবন ছাড়িয়ে আমবন, আমবন ছাড়িয়ে বেতস কেয়াব ঝোপ, কামিনী

ফুলের গাছ, ফুলের গন্ধ, এবং সামনে উদার উন্মুক্ত ফসলের মাঠ, চাঁদের হাল্কা আলোকে কুমারী মেয়ের যৌবনের রূপটি তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে। আরো খানিকটা সময় অতিবাহিত হলে সারা মাঠ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরে গেলো। শীতের চাঁদ বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং সেই চাঁদ থেকে অসংখ্য মণিমাণিক্য মাঠের বুকে ঝরে পড়ছে। সোনার মাঠ জমিরকে আকর্ষণ করে। তার মনের ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। কখনো দূর কখনো নিকট, কখনো চেনা, কখনো অচেনা, নতুন উপলব্ধির জগতটাকে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

পৌষ মাস শেষ, আসে মাঘ। শীতের তীব্রতা দারুণভাবে অনুভূত হয়। কন্‌কনে শীতের রাত। তার উপর গুঁড়ি গুঁড়ি বিষ্টি। ডবল কাঁথায় মানে না। পল্লীগাঁ নিঝঝুম। নারকেলের ছোবায় 'বসি' জ্বালিয়ে কোনো কোনো কুটিরের উষ্ণতা বজায় রাখার চেষ্টা চলছে। উষ্ণ বিছানায় কাঁথা মুড়ে শুয়ে পড়লে শত প্রলোভনেও বাইরে আসার ইচ্ছে জাগে না। ভোর-রাতে গাঙ্গের ঘাটে মানুষের কোলাহলে সবিতুনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। মায়ের সঙ্গে সে একই বিছানায় শায়িত, মাকে জিজ্ঞেস করে, গাঙ্গে আওয়াজ কিয়ের।

মণ্ডল গ ঝোপে মাছ ধরছে।

বাজানরে দেহি না।

তর বাজানও মাছ ধরতে গ্যাছে।

ইমন ঠাণ্ডার মধ্যে বাজানের অসুখ করব না? তুই কোন আক্কেলে বাজনরে ছাড়লি। তর মায়াদয়া নাই মা।

সবিতুনের মা চুপ করে থাকে। সবিতুনও কথা বাড়ায় না। সকাল বেলা হামু একটা মাঝারি আকারের মিরগেল মাছ, গোটা তিনেক কাতলের বাচ্চা এবং দুখানা গলদা চিংড়ি নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে। সবিতুনের মা সপ্রশংস দৃষ্টিতে মাছগুলির দিকে তাকায়। মেয়ে তাকায় বাপের দিকে। বাপের শীতকম্পন দেহখানার প্রতি তাকিয়ে ওর অপরিসীম মমতা জাগে। যদি অসুখ টসুখ হয়। হামুর স্বাস্থ্য ভালো, তবে বয়স তো মোটামুটি হয়েছে। তাছাড়া অসুখবিসুখ তো স্বাস্থ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে আসে না।

যা কাটাল! তব যে মাছ কয়ডা পাইলাম। অর্থাৎ স্রোতের গতি প্রবল। কিন্তু শীতের নদী, স্রোতের প্রাবল্য অধিক হওয়ার কথা নয়। তবে

ঠাণ্ডা পানির নির্মমতা হামুর প্রৌঢ় দেহে ভীষণ লেগেছে। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সে। সামনে বৌয়ের জ্বলন্ত উনুনের পানে যেতে যেতে বলে, ইছা দুইডা বেশ ডাঙ্গর। জমিরদ্দী দিল, না করতে পারলাম না।

জমিরদ্দী কিমন মাছ পাইল। রহিমুন বিবি অর্থাৎ হামুর বৌ সবিতুনের মা স্বামীর দিকে দরদভরা ভালোবাসায় তাকিয়ে বলে।

বালই পাইছে। যোয়ান বেডা, পাইব না? হিমনই আবার কইলজার জোর। কিমন ডাংগর দুইডা ইছা মাছ দিয়া দিল। সবিতুন চুপ করে থাকে। পিতামাতার কথাবার্তায় মনোযোগ দিতে পারছিলো না সে, তবে জমিরদ্দীর প্রশংসাবার্তায় মনে এক ভিন্ন ধরনের স্বাদ পায়। তার কল্পনায় ভেসে উঠে একটি সবলকায় যুবকের প্রতিচ্ছবি। গ্রামের সকল যুবকের প্রতিনিধি সে। হাটে-ঘাটে-মাঠে-বাটে সর্বত্র তার সুনাম। দুর্বল অসহায় নিপীড়িতের বন্ধু, উৎপীড়িতের যম সেই যুবক। খেলার মাঠে সে অসম্ভব শক্তিমান পুরুষ। গ্রামের সর্দার মোত্তালিব মিঞার বাড়ীতে টেলিভিশনের পর্দায় সবিতুন মোহাম্মদ আলী ক্লের মুষ্টিযুদ্ধ দেখেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকাল গ্রামের লোকও যন্ত্রসুখ থেকে বঞ্চিত নয়। আলীর দেহের তরঙ্গায়িত ভংগিগুলি আশ্চর্যভাবে জমিরদ্দীর মাংসপেশীসমূহে ফুটে ওঠে। ঝড়-ঝন্ঝা উপেক্ষা করে সে শীতলক্ষার উত্তাল তরঙ্গে পাড়ি জমায়, অমাবস্যার অন্ধকার রজনীতে শ্মশানঘাটে একা ঘুরে বেড়ায়। এই নির্ভীক নির্লোভ যুবকটির একটিমাত্র বাসনার কথা ভেবে সবিতুনের মনে হয় সকাল বেলা রোদের মতো কোমল রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী সে। সবিতুন স্বভাবতঃই নিরাসক্ত, কিন্তু তার নির্লিপ্ত হৃদয়ের মাঝে কেমন করে যেন জমিরদ্দীর অন্তঃকরণটি প্রভাত পাখীর কাকলির ন্যায় মুগ্ধতার স্পর্শ দিয়ে অতি সহজেই নিজের স্থান প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

ভুঁইয়াবাড়ীর পুকুরপাড়ে খেজুর গাছের সারি, আশেপাশে ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। ঝোপের মধ্যে কয়েকটি বন ফুল-ফলের গাছও আছে। গুড় বড়ই, করমজা, ডেউয়া, ড্যাফল, বৈঁচি, কেঁউ, তিতজাম, গোলাপজাম ইত্যাদি ফল বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা বনে বাদাড়ে ঘুরে এসব বনফল সংগ্রহ করে। কখনো কখনো ফুল সংগ্রহ করে মেয়েরা ফুলের গহনায় সেজেগুজে নিজেদের দেহ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। গ্রাম্য যুবতীর নিরাভরণ দেহে বিভিন্ন ফুলের সম্ভারে ঐশ্বর্যময়

নিটোল স্বাস্থ্যের মনোরম কান্তি যুবকের মন ভুলায়। সলাজ যুবতী যুবকের তৃষিত চাহনির অন্তরালে পালিয়ে বাঁচে। বাংলার প্রকৃতির এই চিরন্তন সৌন্দর্যের রাশি গ্রাম্য যুবক-যুবতীর মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অভাব অনটন, দারিদ্র্যের নির্মম চাপের কাছে নিত্যকালের এ সত্য কখনো নতি স্বীকার করে না। কিশোর-কিশোরীর গোপন অনুরাগ স্বভাবের নির্লিপ্ততায় হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে অসংকোচে ভেসে বেড়ায়। অবন্তি ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সবিতুন সেদিন প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের জগতে ছুটে আসে। পত্রহীন গাছের ডালে অজস্র সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। গাছের নীচেও ফুলের সজ্জা, শুভ্র সুন্দর ফুলের বিছানায় সবিতুন গা এলিয়ে দেয়। পুষ্পিত ডালের ফাঁকে আকাশের নীলাভা দেখা যায়। অদূরে দুটি ছাগশিশু নেচে কুঁদে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পরস্পরের কাছে শক্তিসামর্থ্য প্রকাশ করতে ব্যস্ত। সবিতুন মুগ্ধ-চোখে তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য লক্ষ্য করছে।

এমন সময় পূব দিক থেকে দেখা গেলো কালো মতো কী একটা বস্তু তীরবেগে ছুটে আসছে। আরো খানিকটা এগিয়ে এলে সবিতুন দাঁড়িয়ে উঠে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো একটি কৃষ্ণকায় ষাঁড় রুদ্রমূর্তিতে এগিয়ে আসছে এবং তার পিছনে দড়িধরা অবস্থায় একটি লোক আছাড়ি বিছাড়ি খাচ্ছে। উন্মত্ত বৃষরাজের ক্রুদ্ধ পদচতুষ্টয় মাঠের বুকে ধূলিঝড় তুলেছে। বৃষ্টির ধোঁয়াটে ছাঁচে যেন সারা মাঠ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। অকস্মাৎ ষাঁড়টি দড়ির প্রচণ্ড টানে ভূপাতিত হয়। দুই বাহুর প্রবল শক্তিতে লোকটি তাকে মাটিতে চেপে ধরে। কৌশলে শক্ত দড়িতে শৃঙ্খলিত করে নিকটবর্তী একটি শেওড়া-গাছে ষাঁড়টিকে বেঁধে পরিশ্রান্ত লোকটি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শীতল জলে দেহের ক্ষতবিক্ষত অংশগুলি ধুয়ে মুছে যখন সে পাড়ে উঠে আসে, সবিতুন অবাক হয়ে তার দর্পিত দেহখানির পানে তাকিয়ে থাকে। ' দেহের ক্ষতবিক্ষত জায়গাগুলি থেকে রক্তের দাগ মুছে গেছে, তবে জখমের চিহ্ন মুছেনি।

জমির! বিস্মিত সবিতুন জমিরের কাছে ছুটে যায়। জমির হাসে। খানিকটা লজ্জিত হয়ে বলে, বলদডা ক্ষেইপা গেছিলো। তবে কায়দা কইরা ফালাইছি।

কিন্তুক তোমার শরীলডা ত জখম অইছে। সবিতুনের সেবানিপুণ হাত দুখানি চঞ্চল হয়ে ওঠে। কচি দূর্বা তুলে সে চিবাতে থাকে। চিবানো

শেষ হলে পরম যত্নে জমিরের দেহের ক্ষতস্থানগুলিতে লাগিয়ে দেয়। জমির আবেশে চোখ বুজে। তার মনে হয় এতদিন পর তার হৃদয়ের ক্ষতস্থানে অনুরাগের মৃদু প্রলেপ পড়লো। সে সব ভুলে যায়। এমন কি সবিতুনকে কিছু একটা বলার শক্তিও তার থাকে না। চারদিকে অন্ধকার, তার মধ্যে একটি আলোর শুভ্র বলয়, সব অন্ধকার মিলিয়ে যায়, সাদা ধবধবে আলো, আলোকধারায় অবগাহন করে খানিকটা লজ্জা খানিকটা দ্বিধাজড়িত কন্ঠে জমির বলে, আমার পরাণডা যদি উইড়া পলায়।

আমি তোমার পরানডা ছাড়লে ত।

হঠাৎ এক ঝলক লজ্জা এসে সবিতুনের নিটোল গাল দু'টি রাঙ্গিয়ে দেয়।

আমি যাই। পাখির মত সবিতুন উড়ে যায়। জমিরের মনে হয় তার প্রাণটাই বুঝি উড়ে গেলো। কিন্তু এমন একটা কিছু সে রেখে গেলো, জীবনধারণের জন্য, জীবনকে নতুন করে ভালোবাসার জন্য যার চেয়ে বড়ো আর তার জীবনে কিছুই নেই।

অনেকদিন পরে জমিরের মনের দ্বিধা শঙ্কিত ভাবটি দূর হয়। তাহলে সবিতুন তার ঘরের মানুষ হওয়ার জন্য প্রস্তুত। আল্লাহতায়ালার প্রতি গভীর বিশ্বাসে সে শোকরানা জানায়।

আল্লাহ তুই আমার ইচ্ছা পূরণ কবিস। আত্মবিশ্বাসে উৎফুল্ল জমির আকাশের দিকে তাকায়, যেখানে শুভ্র স্বচ্ছ নীল মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, আল্লাহ্‌র আরশ যেখান থেকে আরো দূরে, অসংখ্য মণিমাণিক্য হীরাজহরতে সুশোভিত সিংহাসনে বসে বিধাতা-পুরুষ যেখান থেকে মানুষের পাপপুণ্যের হিসাব নিকাশ করছেন। জমিরদ্দীর নির্মল আকাঙ্ক্ষার বাণীও হয়তো সেদিন পরম পুরুষের হিসাবের খাতায় একটা দাগ কাটলো।

চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিন অসহ্য গরমের পর সন্ধ্যা বেলা হঠাৎ আকাশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা গেলো। মেঘখণ্ডের ক্রম-সঞ্চারমান গতিতে ধীরে ধীরে আকাশের চেহারা পাল্টে যায়। শুভ্র আকাশ ঘন কালো মেঘের অতর্কিত ছোবলে কৃষ্ণকায় হতে থাকে। পাখির কাকলি থেমে যায়। কিছুক্ষণ আগেও হালকা বাতাসের তাড়নায় গাছ গাছালির পাতা মৃদ আন্দোলিত হচ্ছিলো, হঠাৎ বাতাস থেমে যাওয়ায় পরিবেশটা গুমট হয়ে ওঠে। মাঠের বুকে লেজ উঁচিয়ে গরুর পাল ঘরের দিকে ছুটতে থাকে। পেছনে রাখাল ছেলের দল সরবে দৌড়ায়। কেউ কেউ চীৎকার করে

ডাকাডাকি করতে থাকে, অই বাজান ও। তুফান আইত্তাছে। কেননা অবরুদ্ধ বাতাস সহসা শোঁ শোঁ গর্জনে উন্মত্ত গতিতে ধেয়ে আসতে থাকে। প্রবহমান বায়ুর সরোষ দাপটে ক্ষুদ্র গ্রামখানি আসন্ন ধ্বংসের লীলা প্রত্যক্ষ করবে বলে যেন নীরবে প্রতীক্ষা করতে থাকে।

নদীর ধারে বাঁশের ঝাড় অসহ্য যন্ত্রণায় কড় কড় করতে থাকে। বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে সবিতুনদের ক্ষুদ্র কুটিরখানি সহসা কোন দানবীয় শক্তির তাণ্ডব নৃত্যে থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে। শুরু হয় ঝড়ের প্রচণ্ড ধ্বংস-যজ্ঞ। ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষরাজির ডালপালা অনায়াসে ভেঙ্গে পড়ছে। আমবন, জামবন, বেণুবনের শীর্ষে শোঁ শোঁ শব্দের উল্লাস। পার্শ্ববর্তী জুমাঘর থেকে ভীত-বিহ্বল মোয়াজ্জিনের কন্ঠ থেকে আজানের করুণ ধ্বনি মুহুর্মুহু ভেসে আসছে। নদীর বুকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের অভিযান।

মাগো। মা আ আ। সবিতুন ছোট ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার করছে। তার বাপ কাজ থেকে ফিরেনি, মা দক্ষিণপাড়ার কাজীবাড়ী গিয়ে ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। একলা ঘরে ঝড়ের তাণ্ডব দেখতে দেখতে সে হতচেতন হয়ে পড়েছে, কেবল মাঝে মাঝে অবচেতন মনে মাকে স্মরণ করছে। ঘরের কোণে তার প্রিয় ছাগলটি ছাড়া দ্বিতীয় জনপ্রাণী নেই। বাতাসের তাড়নায় ক্ষুদ্র দীপশিখা দপ্ দপ্ করতে করতে এক সময় নিবে যায়। ঝড়ের গতি আরো বাড়ে। গাছপালা ঘরবাড়ী দুমড়ে মুচড়ে ছিন্নমূল হতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য। গাঁয়ের আর পাঁচটা ডেরাঘরের ন্যায় সবিতুনদের ঘরখানাও ঝড়ের প্রবল নির্যাতনের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসের শব্দের সঙ্গে মানুষের হাহাকার ধ্বনি মিশে গিয়ে কেয়ামতের আগমন সম্ভাবিত করছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকায়, পরক্ষণেই বাজ পড়ার বিরাট বিস্ফোরণ। ঝড়ের বেগ খানিকটা কমে, কিন্তু বৃষ্টির বেগ তীব্রতর হয়, সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টি।

বাইরে থেকে একটা লোক চীৎকার করছে, ঘরের ঝাপ ধরে টানাটানি করে।

কেডায় আছ, ঝাঁপটা খুইল্যা দ্যাও। সবিতুন ঝাপ খুলে জিজ্ঞেস করে, তুমি কেডা।

আমি। ঝাপ খোলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তড়িতবেগে ঘরে ঢুকে পড়ে। হয়তো বা একটু আশ্রয়, ঝড়ের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য একটুখানি

নিরাপদ স্থান। লোকটা ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। কেননা বৃষ্টির ছাঁচে ঘরের আসবাব ভিজে যাচ্ছে। আসবাব বলতে ঐ একটা নড়বড়ে তক্তোপোষ, একটা ময়লা বিছানা ও ততোধিক ময়লা গোটা দুই তেলচিটুচিটে বালিশ। সবিতুন এতক্ষণ ঘরের মধ্যে একলা বসে ঝড়ের আতঙ্কে শিহরিত হচ্ছিলো। মানুষের আগমন তাকে খানিকটা আশ্বস্ত করলা। এই ভীষণ রাতের অন্ধকারে সে অন্ততঃ একটি লোকের সাহচর্য লাভ করেছে।

জীবনকে ভালোবাসার একটি কারণ সে আবিষ্কার করলো। ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। ঝড় তাকে বিভীষিকার রাজ্যে উপনীত করে, বৃষ্টিতে সে শীতল হয়, বিদ্যুৎ অপরূপ সুন্দরের বার্তা বহন করে আনে। কিন্তু সব সুন্দরের অন্তরালে অসুন্দরের অধিবাস, মর্মান্তিক মৃত্যুর গ্রাস থেকে কারো মুক্তি নেই। পনেরো বছরের যুবতীর কাছে এই তত্ত্ব অচিন্ত্যনীয়। দেহমনের নতুন উপলব্ধিসমূহ যখন তাকে বিমূঢ় বিস্ময়ের রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছিলো, সবিতুন তখন পৃথিবীর কোনো কিছুকেই অসুন্দর ভাবতে পারেনি। ঝড় যখন তাকে মৃত্যুর কিনারায় নিয়ে যায় তখনো সে জীবনের রঙ্গীন স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত হয়নি, কিন্তু সেই অভিশপ্ত রাতে নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক বিপর্যয় যখন তার সবকিছু ছিনিয়ে নেয়, নতুন উপলব্ধির জগতটাকে তখন নিশ্চয় তার চরম বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হলো। ঝড় বৃষ্টির অন্ধকারের সুযোগে লোকটা যখন তার দেহেব উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিমূঢ় সবিতুন সময়ের নির্মম শিকার হয়ে এই হৃদয়হীন নিষ্ঠু-রতাকে তখন কেমন করে মেনে নেবে! কিন্তু তার নিরুপায় অন্তরাত্মা প্রতি-বাদের ভাষা খুঁজে পেলো না সেদিন। বন্য পশুর ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য একটি হরিণশাবকের আত্মাহুতি পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো নতুন ঘটনা নয়।

জীবনে এই প্রথম সে একটি অবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পবিচিতি লাভ করে। জীবন যে কখনো কখনো এমন কুৎসিত হয়, সবিতুন এই প্রথম তা উপলব্ধি করলো। তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনের নগ্ন বিষক্রিয়া তীব্রতর হতে থাকে। নীল, বিবশ হতচেতন সবিতুন অন্ধকারের নির্মম অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। বাইরে ঝড় বৃষ্টির ধ্বংস-যজ্ঞ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। এক মুহূর্তেরও অপচয় না করে লোকটা তার ক্ষুধার পাত্রখানি নিঃশেষিত করে এক সময় ক্লান্তির সমুদ্রে অবগাহন করলো। প্রকৃতি তখনও উন্মত্ত প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জন করছে। লোকটা ঝাপ খুলে প্রস্থানোদ্যত হয়। সেই মুহূর্তে

বিদ্যুৎ চমকায়। বিদ্যুতের আলোকে সবিতুনের চোখ ঝলসে যায়। আলো আঁধারের চকিত মুহূর্তে তাঁর পাণ্ডুর চোখের দৃষ্টিতে একটি পরিচিত মানুষের ছবি ভেসে ওঠে। তার অন্তরঙ্গ পল্লীর নিভৃত ছায়ায় লালিত জমিরের মুখ খানি খুব করে মনে পড়ে। প্রকৃতির রাজ্যে অফুরন্ত সৌন্দর্যের মাঝে জমির একক অনন্য, শিশুর নির্লিপ্ত হাসির মাধুর্য যার হৃদয়কে করেছে কস্তুরী সৌরভে আমোদিত। সাহসের দম্ভে এবং শক্তির অসামান্যতায় যার প্রভাব পল্লীর যুবকদের অনুপ্রেরণার উৎস। সবিতুন পরম মমতায় জমিরের এই শাশ্বত রূপের ছবি হৃদয়ের অন্তহীন সমুদ্রে সংগোপনে লালন করে এসেছে। জমির কি তাকে ক্ষমা করবে? যে লোকটি এই বীভৎস রজনীতে তার নারীদেহের রমণীয়তাকে লুণ্ঠিত করে নিয়েছে কে সে? হঠাৎ তার আত্মার কন্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

আমি কইতে পারমু না। কেননা সে লোকটি তার চেনা, সে চিনেছে তাকে। তার নিভৃত হৃদয়ের পরম পুরুষের জনক সে।

আমি চিনছি, চিনছি।

আকাশ বাতাস সমুদ্রের গর্জন তার মনের রুদ্ধ চেতনাকে জাগিয়ে দেয়। সবিতুন প্রকৃতির উন্মত্ততায় মিশে যায়। ঝড়-ঝন্ঝা অশনিপাতের অন্তরালে সে ছুটে চলে। কোথায়? কে জানে কোথায়।

জমির তোমার বাপ আমার সর্বনাশ করছে।

রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে তার চীৎকার জমিরের মনের অভ্যন্তরে পৌঁছায় না। ঝড়ের নির্যাতন উপেক্ষা করে সে দৌড়াতে থাকে। কেন দৌড়াচেছ তা সে জানে না। হয়তো বা জীবনকে ভালোবাসার অনিবার্যতা থেকে মুক্তি পেতে চায়। কেননা জীবন তার কাছে বিভীষিকা, ঘাতকের শাণিত অস্ত্রে আলোর শুভ্রতার অপমৃত্যু। জীবনের ছলনায় নির্বাণ অন্বেষী সে পরপারের যাত্রী।

তার এলোচুলে রাতের অন্ধকারে জমাট হচ্ছে, সারাদেহে বৃষ্টির সজল প্রবাহ ঝর্ণার ধারা সৃষ্টি করছে। সবিতুন ছুটে চলেছে। দুর্যোগের রাত, কাঁটাবন, পিচ্ছিল পথ, ভাঙা ডালপালার বাধা উপেক্ষা করে তার দেহমন মহাপ্রলয়ের দিকে ছুটে চলেছে। কুশাঙ্কুরবিদ্ধ পায়ের যাতনা তাকে বিরত করতে পারছে না।

জমির। আশ্চর্য, জমিরকে সে ভুলতে চায়, জীবনকে অস্বীকার করতে

চায়। ক্যান, ক্যান, জমির আমার মনের মধ্যে বইয়া আছে ক্যান ? জমির সত্যিই কি তাঁর হৃদয়মনে আসন গেড়ে বসেছে ? হয়তো বা তাই। কিন্তু সে যে তাকে শুভ্র শুচিতায় বরণ করতে পারছে না। তার অবচেতন মন নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করতে এমন ভীত শঙ্কিত কেন ?

বাতাসের মন্তপ্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদীতীরের সবুজ মখমলে কে যেন তাকে পরম স্নেহভরে শুইয়ে দেয়। তার মনে হয় একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ আকাশ থেকে অবতরণ করলেন। সোহাগভরা কন্ঠে জমির তাকে ডাকছে, সবিতুন সবি আমার সবিতা। পুকুর পাড়ে খেজুর গাছের সারির ফাঁকে ফুলের গাছ। কামিনী, কেতকী, গন্ধরাজ, শেফালী, অবন্তি ফুলের গাছগুলি প্রভাতরবির আলোকধারায় অবগাহন করছে। সাদা ফুল নির্মল আনন্দে হাসছে। দোয়েল পাখীর আশ্চর্য মিষ্টি গান। নদীর মৃদু কলতান। সবিতুন, সবি, আমার সবিতা।